চাঁদমামা
বেতাল কথা সমগ্র

বেতাল কথা সমগ্র ১

চাঁদেমামো

বেতাল কথা সমগ্র

১

সম্পাদনা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Chandmama Betal Katha Samagra vol 1

প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট ২০২১

সম্পাদক : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ : কামিল দাস

ফ্যালকন-গ্রুপ এর পক্ষে সঞ্জয় কুমার সিং ও সঞ্জীব কুমার সিং কর্তৃক ৮১/বি, ব্লক সি, নজফগড় রোড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নয়াদিল্লী, ১১০০১৫ থেকে প্রকাশিত
মুদ্রক : ফ্যালকন ডিজিটাল, নয়াদিল্লী, ১১০০১৮

ফ্যালকন-গ্রুপ এর আসন্ন পত্রিকা ও বইতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য
যোগাযোগ করতে ই-মেইল করুন : mail.freedom.group@gmail.com
যে কোনো অভিযোগ জানাতে, জিজ্ঞাসা করতে, সত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে, রয়ালিটি বিষয়ক প্রশ্ন করতে ইমেইল করুন : book.falcong@gmail.com
লেখা পাঠানোর জন্য ই-মেইল করুন : mail.editor.falcong@gmail.com

সূচিপত্র

গোড়ার কথা

আজ থেকে অনেক বছর আগেকার কথা। তখন উজ্জয়িনী নামে এক নগর ছিল। নগরটি দেখতে যেমন সুন্দর ছিল তেমনি সেখানে বাস করত সব পণ্ডিত আর গুণী লোকেরা। সেখানকার রাজার নাম ছিল গন্ধর্বসেন। তিনিও খুব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

মহারাজ গন্ধর্বসেনের চার রানি ও ছয় পুত্র ছিল। রাজকুমাররা গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করে পণ্ডিত ও বিচক্ষণ হয়ে ওঠেন। কিন্তু রাজা গন্ধর্বসেন হঠাৎ মারা যান। তখন নিয়ম ছিল বড়ো পুত্র সিংহাসনে বসবে। গন্ধর্বসেনের বড়ো পুত্র শঙ্কু মহাসমারোহে সিংহাসনে বসেন।

ছয় রাজকুমারের মধ্যে বিক্রমাদিত্য ছিলেন সবচেয়ে ছোটো— তাঁর খুব সিংহাসনে বসার লোভ। তাই তিনি চুপিচুপি শঙ্কুকে হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসলেন।

অবশ্য অন্যায় পথে সিংহাসনে বসলেও রাজা হিসাবে বিক্রমাদিত্য উপযুক্ত ছিলেন। প্রথমেই তিনি রাজ্যের সীমা অনেক বাড়িয়ে নিলেন। বিক্রমাদিত্যের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন— আমি সকল প্রজার রাজা। প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখার ভার আমার। অথচ আমি রাজপ্রাসাদে বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছি। আমার লোকেরা প্রজাদের সাথে কেমন ব্যবহার করে তা একবার দেখা উচিত।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তিনি রাজ্যের ভার তাঁর ভাই ভতৃহরির হাতে দিয়ে ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বের হলেন। বিক্রমাদিত্য বহু দেশ ঘুরলেন, প্রজাদের সাথে আলাপ করলেন, তাদের অসুবিধার কথা শুনলেন।

একদিন তিনি খবর পেলেন যে ভতৃহরি, যার হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে এসেছিলেন, তিনি নাকি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে রাজপাট ফেলে বনে গিয়ে যোগসাধনা করছেন। এ খবর পাওয়ামাত্র বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে হয়েছে কী, দেবরাজ যখন দেখলেন যে উজ্জয়িনীতে কোনো রাজা নেই, চারদিকে বিশৃঙ্খলা শুরু

হয়েছে তখন তিনি এক যক্ষকে নগরের পাহারাদার হিসাবে পাঠালেন।

এই যক্ষ বিক্রমাদিত্যকে চিনত না। সে দেখে গভীর রাতে একটা লোক নগরে ঢুকছে। যক্ষ সাথে সাথে তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, অ্যাই, আমায় না বলে কোথায় যাচ্ছিস? তোর নাম কী?

বিক্রমাদিত্য খুব সাহসী ছিলেন। তিনি একদম ভয় না পেয়ে বললেন, আমি এই নগরের রাজা— নাম বিক্রমাদিত্য। কিন্তু তুই জিজ্ঞাসা করার কে?

যক্ষ বলল, দেবরাজ ইন্দ্র আমায় এই নগরের পাহারার ভার দিয়েছেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া তো তোকে এখন ঢুকতে দেব না, আর তুই যদি সত্যিই বিক্রমাদিত্য হোস তবে আমার সাথে যুদ্ধ কর, যদি জিতিস তবে নগরে ঢুকতে পারবি।

দু-জনেই প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সাথে কি যক্ষ যুদ্ধ করে পারে নাকি! কিছুক্ষণ পরেই বিক্রমাদিত্য যক্ষকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসলেন।

যক্ষ হার স্বীকার করে নিয়ে বলল, মহারাজ, আপনার পরাক্রম দেখে বুঝলাম যে, আপনি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। দয়া করে আমাকে যদি এখন ছেড়ে দেন তবে তার বিনিময়ে আমি আপনার প্রাণ বাঁচাব।

এ-কথা শুনে রাজা খুব হাসলেন। তারপর বললেন, তোর প্রাণ এখন আমার হাতের মধ্যে আর তুই কিনা আমার প্রাণ বাঁচাবি?

যক্ষ বলল, মহারাজ, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি যেমন বলব সেই মতো যদি কাজ করেন তবে দীর্ঘদিন সুখে রাজত্ব করতে পারবেন।

রাজা খুব অবাক হলেন। তিনি যক্ষের বুক থেকে উঠে পড়ে বললেন, বল, তোর কী বলার আছে।

যক্ষ তার কথা বলতে শুরু করল—

ভোগবতী নামে এক নগর ছিল। সেখানকার রাজার নাম চন্দ্রভানু। চন্দ্রভানুর খুব শিকারের শখ ছিল, মাঝে মাঝেই তিনি দলবল নিয়ে শিকারে বেরোতেন। এমনি একদিন শিকার করতে করতে এক বনে গিয়ে দেখলেন, এক সাধু মাথা নীচের দিকে আর পা উপর দিকে করে গাছের ডালে ঝুলে আছেন। আশেপাশের গ্রামের লোকেদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, সাধু কারও সাথে কোনো কথা বলেন না এবং বহুকাল ধরে এমনভাবে তপস্যা করছেন।

বাড়ি ফিরে এসে চন্দ্রভানু মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সত্যি কি কঠোর পরিশ্রম করছেন ওই সাধু! ওঁর তপস্যা যদি কোনোভাবে ভাঙা যায় তবে বেশ হয়।

পরদিন তিনি সারা রাজ্যে ঢ্যারা পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন, যে ওই সাধুকে রাজসভায় নিয়ে আসতে পারবেন তাকে এক লক্ষ মুদ্রা পুরষ্কার দেওয়া হবে।

ওই নগরে একটি মেয়ে থাকত, সে খুবই গরিব। কোনোরকমে দু-বেলা খেতে পায়। সে ভাবল, যদি কোনোরকমে সাধুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে নিয়ে আসা যায় তাহলে আর আমার কোনো অভাব থাকে না।

সে রাজার কাছে গিয়ে বলল, মহারাজ, আমি ওই সাধুকে বিয়ে করে ছেলেসুদ্ধ এখানে নিয়ে আসব। আমায় তবে পুরো এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দেবেন তো?

মহারাজের সম্মতি পেয়ে মেয়েটি তখনি বনের দিকে যাত্রা করল। গিয়ে দেখল সাধু সেই একইভাবে পা উপর দিকে, মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে আছেন। সাধুর রোগাপটকা চেহারা দেখে সে ভাবল, এখন একে না জাগানোই ঠিক হবে। সেখানে একটা কুটির তৈরি করে সে থাকতে লাগল। রোজ সে মোহনভোগ রান্না করত আর একটু একটু করে সাধুর মুখে দিত। বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগায় সাধুও তা খেয়ে ফেলতেন।

এইভাবে কিছুদিন মোহনভোগ খেতে খেতে সাধু গায়ে জোর পেলেন, চোখ মেলে তাকালেন। তারপর গাছ থেকে নেমে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? একা একা এই বনে কী করছ?

সে উত্তরে বলল, আমি দেবকন্যা, তীর্থ করতে বেরিয়েছি। আপনার কঠোর তপস্যা দেখে ভাবলাম, কিছুদিন এখানে থেকে আপনার সেবা করি।

সাধু খুব খুশি হয়ে বললেন, তোমার ব্যবহারে আমি খুশি হয়েছি। তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমি তোমার আশ্রম দেখতে চাই।

মেয়েটি সাধুকে তার কুটিরে নিয়ে গেল, আর খুব সেবাযত্ন করতে লাগল। সাধু তার মিথ্যা ছলনায় ভুলে তাকে বিয়ে করলেন এবং সেই কুটিরেই রয়ে গেলেন। এক বছর পর তাদের খুব সুন্দর একটি ছেলে হল। মেয়েটি তখন সাধুকে বলল, বহুদিন হল আমরা এখানে আছি, আমার মনে হয় এবার আমাদের তীর্থে বেরোনো উচিত।

সাধু রাজি হলেন। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তারা রওনা হল। মেয়েটি সাধুকে নিয়ে সোজা রাজসভায় এসে উপস্থিত হল।

তাদের দেখে রাজা তাঁর সভাসদদের বললেন, দেখ মেয়েটি তার কথা রেখেছে। সাধুকে বিয়ে করে ছেলেসুদ্ধ নিয়ে এসেছে। কথামতো ওকে এক লক্ষ মুদ্রা দেওয়া হোক।

এ-কথা সাধুর কানে যেতে তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। ছেলেকে সেখানেই ফেলে রেখে তিনি বনের দিকে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যে করেই হোক এই রাজার উপর প্রতিশোধ নেবই।

আরও কঠোর তপস্যা করে সাধু আরও ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তারপর রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করলেন।

এখানেই গল্প শেষ করে যক্ষ বলল, মহারাজ, আপনি, চন্দ্রভানু আর ওই যোগী, তিন জনে একই নগরে, একই লগ্নে, একই নক্ষত্রে জন্মেছিলেন। আপনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা হয়েছেন। চন্দ্রভানু তেলির ঘরে জন্মগ্রহণ করেও ভোগবতী নগরের রাজা হয়েছিলেন। আর ওই যোগী কুমোরের ঘরে জন্মেছিলেন, কিন্তু যোগসাধনা করে সে অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। চন্দ্রভানুকে হত্যা করে সে তাঁকে বেতাল করে শ্মশানের একটা শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। এখন আপনাকে হত্যা করার চেষ্টায় আছে। আপনি যদি তার হাত থেকে রেহাই পান, তবে বহুদিন রাজত্ব করতে পারবেন।

এই বলে যক্ষ চলে গেল। বিক্রমাদিত্য এসব কথা চিন্তা করতে করতে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলেন। প্রজারা এতদিন পর তাদের রাজাকে পেয়ে তো মহা খুশি। গোটা রাজ্যে খুশির জোয়ার ছড়িয়ে পড়ল। রাজাও প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

রাজসভায় একদিন শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী এলেন। তিনি রাজার সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তারপর রাজার হাতে একটা ফল দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন। রাজা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, যক্ষ যে যোগীর কথা বলেছিল এ সে নয়তো? না জেনে ফলটা খাওয়া ঠিক হবে না।

তিনি যত্ন করে ফলটা রাজকোষে রেখে দিলেন। এরপর থেকে সন্ন্যাসী রোজ আসতে লাগলেন আর যাবার সময় একটি করে ফল দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। রাজাও সব ফল রাজকোষে রেখে দিতেন।

একদিন বিক্রমাদিত্য সভাসদদের সাথে ঘোড়াশালা দেখতে গেছেন, সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত হয়ে রোজকার মতো তাঁকে ফলটি দিলেন। কিন্তু হঠাৎ ফলটা রাজার হাত থেকে পড়ে গেল এবং তার মধ্যে থেকে এক অপূর্ব রত্ন বের হল। রাজা অবাক হয়ে সাধুকে বললেন, আপনি কীজন্য আমায় এই দামি রত্নযুক্ত ফল দিলেন?

সাধু বললেন, মহারাজ, শাস্ত্রে আছে— রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ এবং চিকিৎসকের কাছে খালি হতে যেতে নেই, তাই আমি এই ফলটি নিয়ে আসি। আর শুধু এই ফলটির মধ্যেই যে রত্ন আছে তা নয়, আমি প্রতিদিন আপনাকে যে ফলগুলো দিয়েছি, তার প্রত্যেকটার মধ্যে একই রত্ন আছে।

রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে দিয়ে সেই ফলগুলি আনিয়ে ভেঙে দেখলেন প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি করে রত্ন আছে। তারপর রাজা এক জহুরিকে দিয়ে সেই রত্নগুলি পরীক্ষা করালেন। জহুরি বলল, মহারাজ,

রত্নগুলির মূল্য কয়েক কোটি মুদ্রারও বেশি। এককথায় বলতে গেলে এগুলি অমূল্য রত্ন।

শুনে রাজা খুব আনন্দিত হলেন, তারপর সন্ন্যাসীর হাত ধরে বললেন, প্রভু, আমার সাম্রাজ্যও আপনার এই রত্নগুলির সমান দাম হবে না, আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এই সব অমূল্য রত্ন কোথায় পেলেন আর কেনই বা এসব আমায় দিলেন, তা জানতে ইচ্ছা করছে।

সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ, ঔষধ আর মন্ত্রণা সবার সামনে বলা ঠিক নয়। যদি বলেন তো নির্জনে গিয়ে বলি।

রাজা তখন সন্ন্যাসীকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, প্রভু, আপনি আমায় এত দামি দামি রত্ন দিলেন, অথচ একদিনও আমার বাড়িতে কিছু খেলেন না। আদেশ করুন আপনার জন্য আমি কী করতে পারি, আমি প্রাণ দিয়ে তা পালন করব।

সন্ন্যাসী বললেন, আগামী ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে গোদাবরী নদীর তীরের শ্মশানে আমি মন্ত্রসিদ্ধ করব; তাতে আমার অনেক ক্ষমতা লাভ হবে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি যদি সেদিন রাত্রে আমার আশ্রমে যান আর কথামতো কাজ করেন তাহলেই আমার মন্ত্রসিদ্ধ হবে।

রাজা বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, ঠিক সময়ে আমি আপনার আশ্রমে পৌঁছে যাব।

বিক্রমাদিত্যকে আশীর্বাদ করে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে সেই কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত এল। বিক্রমাদিত্য ঠিক সময়ে হাতে একখানা তলোয়ার নিয়ে সন্ন্যাসীর আশ্রমে এসে হাজির হলেন। দেখলেন, সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে দুই হাতে দুটি কঙ্কালের খুলি নিয়ে বাজাচ্ছেন, আর তার চারদিকে বিকটাকৃতি ভূতপ্রেত, পিশাচ, ডাকিনীরা নাচছে।

এসব ব্যাপার দেখে বিক্রমাদিত্য কিছুমাত্র ভয় পেলেন না। হাত জোড় করে বললেন, প্রভু, আমি হাজির, বলুন কী করতে হবে।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করে হাত দিয়ে সামনে পাতা আসন দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, তোমার ব্যবহারে আমি খুব খুশি হয়েছি। এখান থেকে দুই ক্রোশ দক্ষিণে একটা শ্মশান আছে, সেখানে দেখবে শিরীষ গাছে একটা মড়া ঝুলছে। তুমি সেটা গাছ থেকে নামিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো।

বিক্রমাদিত্য 'যে আজ্ঞা' বলে রওনা হলেন। সন্ন্যাসী আবার যোগাসনে বসলেন।

অমাবস্যার রাত ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাতে আবার মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। চারদিক থেকে ভূতপ্রেতের চেঁচামেচির আওয়াজ কানে আসছে। এমন অবস্থায় কার না একটু ভয় হয়! কিন্তু বিক্রমাদিত্য বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে শ্মশানে গিয়ে পৌঁছলেন।

সেই বীভৎস জায়গার কথা মুখে বলে শেষ করা যায় না। তিনি দেখলেন, চারদিকে ভূতপ্রেত, ডাকিনীরা জ্যান্ত মানুষ ধরে খাচ্ছে। আর সেই শিরীষ গাছের শিকড় থেকে মগডাল পর্যন্ত ধক ধক করে আগুন জ্বলছে।

শিরীষ গাছের আরও কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন গাছের ডালে মাথা নীচের দিকে ও পা দুটি উপর দিকে করে দড়ি বাঁধা একটি মড়া ঝুলছে।

বিক্রমাদিত্যের আর বুঝতে বাকি রইল না যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা বলেছিল এ সেই। দেরি না করে তিনি তরতর করে গাছে উঠে কোমর থেকে তলোয়ার বার করে তাই দিয়ে মড়ার পায়ের দড়ি কেটে দিলেন। মড়াটি নীচে পড়েই চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। রাজা তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কী করে তোমার এমন দশা হল।

এই কথা শুনে মড়াটি খিলখিল করে হাসতে লাগল। এসব দেখে তো রাজা একেবারে হতভম্ব। এই সুযোগে মড়াটি নিজেই সুড়সুড় করে গাছে উঠে আবার আগের মতো ঝুলে রইল। রাজাও ছাড়ার পাত্র নন। তিনিও আবার গাছে উঠে দড়ি কেটে তাকে নীচে ফেললেন।

গাছ থেকে নেমে রাজা তাকে তার এই দুরবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু সে চুপ করে রইল।

বিক্রমাদিত্য ভাবলেন, এ হয়তো সেই রাজা চন্দ্রভানু, সন্ন্যাসী একে এমন করে রেখেছে। তখন তিনি মড়াটিকে নিজের গায়ের চাদর দিয়ে জড়িয়ে কাঁধে তুলে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

এমন সময় বেতাল অর্থাৎ সেই মড়াটি কথা বলে উঠল, ওহে বীরপুরুষ, তুমি কে? আমায় কোথায় এবং কেন নিয়ে যাচ্ছ?

রাজা বললেন, আমার নাম বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামে এক যোগীর আদেশ অনুসারে তোমায় আমি তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

বেতাল বলল, শাস্ত্রে আছে, কেবল মূর্খ, বোকা আর কুঁড়েরা মুখ বুজে পথ চলে। যাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে তারা নানারকম ভালো কাজ করতে করতে এবং ভালো কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হয়। আমিও তোমাকে কয়েকটা গল্প বলব আর প্রত্যেক গল্পের শেষে একটা প্রশ্ন করব। যদি সঠিক উত্তর দাও তাহলে আমি আবার শিরীষ গাছে ফিরে যাব আর যদি ভুল উত্তর দাও তাহলে কিন্তু তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

আর কোনো উপায় না দেখে বিক্রমাদিত্য বললেন, বেশ তাই বল।

তারপর মড়া কাঁধে নিয়ে সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে পা বাড়ালেন। বেতালও তার প্রথম গল্প আরম্ভ করল।

১. হেরফের

বেতাল বলল : কলিঙ্গ দেশে বীণাবন্ত নামে এক বৈদ্য রোগীদের সেবা করত। উনি অনেক অদ্ভুত রকমের চিকিৎসা করে ধন্বন্তরি নামে অভিহিত হয়েছিলেন। উনি পরম শিবভক্ত ছিলেন। উনি প্রায় সবসময় শিবালয়ে থাকতেন। কী রাত্রে কী দিনে যারা ওঁর সাথে দেখা করতে চাইত তারা ওই শিব মন্দিরে গিয়ে ওকে ঠিক পেয়ে যেত।

বীণাবন্তের ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র পরিবার যে ছিল না তা নয়। কিন্তু উনি নিজের বাড়িতে ছ-মাসে ন-মাসে যেত। সংসারের প্রতি তার কোনোদিনই টান ছিল না একবার এক ধনী ব্যক্তিকে চিকিৎসা করে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলল। সেই ধনী ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা বশত তাঁর সাথে নিজের মেয়ে যশোধরার বিয়ে দেয়, ওদের থাকার জন্য একটি বাড়িও তুলে দিয়েছিল।

স্ত্রীর প্রতি বীণাবন্তের টান যে ছিল না তা নয়। তার সন্তানও হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পরও তার চরিত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না। শিবালয়ে পড়ে থাকত রাতদিন। ওখানেই রুগিদের দেখত। অর্থও রোজগার হত। কিন্তু টাকা বাড়িতে আসত না। শিব মন্দিরে গরিব শিবভক্তদের ওই অর্থ দিয়ে দিত। মাঝে মাঝে স্ত্রী খবর পাঠাত : সংসার চালানো যাচ্ছে না টাকার অভাবে। তখন বীণাবন্ত হাতে যে টাকা থাকত তা পাঠিয়ে দিত।

যশোধরা অভিমানী ছিল। মুখে কিছু বলত না। সংসারের সব কাজ নিজের বিচারবিবেচনা করে সামলে নিত। কিন্তু কাহাতক আর একা বেচারা সামাল দিতে পারে। তাই একদিন নিজের বাড়ি যশোবন্ত নামে এক ধনীর কাছে বিক্রি করে দিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল এত বড়ো যে একটা ঘটনা ঘটে গেল তাতে বীণাবন্তের মনে কোনো চাঞ্চল্য ছিল না।

যশোধরার কাছে যে যশোবন্ত বাড়ি কিনেছিল সে ছিল খুব নাস্তিক। কোনো দেবতাকে প্রণাম না করেই সে অনেক টাকা রোজগার করেছিল। চিকিৎসার ক্ষেত্রে বীণাবন্তের হাতযশ যেমন ছিল ব্যাবসার ক্ষেত্রে যশোবন্তেরও তেমনি হাতযশ ছিল।

যশোবন্তের দুই বউ একের-পর-এক মারা গেল। কোনো বউ-এর একটাও বাচ্চা হল না। ওর তৃতীয় বউ গর্ভবতী হল। যশোবন্তের আনন্দের সীমা নেই। ওর বউ বলল, 'ঈশ্বরের অশেষ করুণায় আমি মা হতে চলেছি।' ওর কথা শুনে যশোবন্ত বলল, 'যা ইচ্ছে ভাবতে পার, বলতে পার, আমি কিন্তু ভগবানের করুণা-রুনা বলে মনে করি না।'

যশোবন্তের স্ত্রী নয় মাস পর এক পুত্র সন্তান প্রসব করল। কিন্তু ওই সন্তান নড়ে না চড়ে না। ডাকে না কাঁদে না। যেন মৃত। চামড়া হাড্ডিসার দেহ। কিন্তু ও বুকের উপর কান রেখে ভালো করে শুনলে টিপ টিপ শব্দ শোনা যায়।

'এই বাচ্চাকে একমাত্র বীণাবন্ত ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারে না।' বলল যশোবন্তের বন্ধুরা।

বীণাবন্তের প্রতি যশোবন্তের একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব ছিল লোকটা একটা আকাট। নিজের পরিবার দেখাশোনার যার ক্ষমতা নেই সে আবার কেমনতরো মানুষ।

এই ধরণের মনোভাব থাকা সত্ত্বেও অনেক সাধ্য সাধনার পর যে সন্তান হল তাকে বাঁচানোর আশায় বন্ধুদের কাছে যশোবন্ত বলল, 'তাহলে ওকে এখানে ডেকে পাঠানো হোক।'

ওর বন্ধুরা শিবালয়ে গিয়ে বীণাবন্তকে সব বলে ওদের সাথে আসতে বলল।

'ওই নাস্তিকের কাছে আমি যাব না। ও এই শিবালয়ে এসে শিবলিঙ্গের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে অপরাধ স্বীকার করে নিলে ওর বাচ্চার চিকিৎসা করব। তারপর যা শিবের ইচ্ছা তাই হবে।' বলল বীণাবন্ত।

যশোবন্ত তার বাচ্চাকে নিয়ে শিবালয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে বীণাবন্তের কাছে রেখে, শিবলিঙ্গের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। যশোবন্ত এসব করল নিতান্তই বীণাবন্তকে খুশি করার জন্য। শিবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বা তার প্রতি বিশ্বাস থাকার জন্য নয়।

বীণাবন্ত তার থলে থেকে একটা বড়ি বের করে অল্প ভিজিয়ে বাচ্চার ঠোঁটে ঘষে দিল। তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটা নড়েচড়ে উঠে কাঁদতে শুরু করে দিল। এই ব্যাপার দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে যশোধরা তার কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শিবালয়ে এসে, 'ওগো আমাদের বাচ্চাটাকে বাঁচাও।' বলে কোলের বাচ্চাটাকে স্বামীর সামনে শুইয়ে দিল।

বীণাবন্ত বাচ্চাটার নাড়ি পরীক্ষা করে বাচ্চাটার মুখে একমাত্রা ওষুধ দিল। ওই বাচ্চাটা একবার চোখ খুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে মারা গেল।

বীণাবন্ত সটান শিবলিঙ্গের সামনে সাষ্টাঙ্গে পড়ে প্রণাম করে প্রার্থনা করল বাচ্চাটাকে বাঁচানোর। কিন্তু কোনো ফল হল না।

বীণাবন্ত তার ওষুধের পোঁটলা শিবলিঙ্গের মাথায় ছুড়ে কোথায় চলে গেল। আর কোনোদিন মন্দিরের ত্রিসীমানায় পা রাখেনি। অনেকদিন পর শিবের বাৎসরিক উৎসবের দিনে এসে শিবের উপর দূর থেকে ঢিল ছুড়তে লাগল। সবাই ভাবল বীণাবন্ত পাগল হয়ে গেছে।

বেতাল এই গল্প বলে বলল, 'রাজা, পরমভক্ত বীণাবন্ত বেশ তো ছিল কিন্তু হঠাৎ চরম নাস্তিক হয়ে গেল কেন? আর চরম নাস্তিক যশোবন্ত রাতারাতি পরমভক্ত হয়ে গেল কেন? মানুষ যে ভগবানকে বিশ্বাস করে সেটা কি শুধু নিজের স্বার্থরক্ষার্থেই? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না বল তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

ওই কথা শুনে বিক্রমাদিত্য বলল, মানুষ স্বার্থ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করে না। যশোবন্তের সন্তান বেঁচে গেছে বলেই সে ভগবানের ভক্ত হয়েছে। ঠিক ওই ধরনের স্বার্থের কারণেই বীণাবন্তও ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে ছিল। নিজের ওষুধের উপর তার কোনোদিনই বিশ্বাস ছিল না। উনি বরাবর নিজের নিমিত্ত ভাবতেন। ওঁর ওষুধে কিছু হয় না। যা করেন ভগবান করেন। এত গভীর বিশ্বাসের জন্যই নিজের সন্তান মারা যাওয়াতে অমন চট করে সেই বিশ্বাস উবে গেল। চিকিৎসার ক্রুটির জন্যই যে সন্তান মারা গেছে সে-কথা বীণাবন্ত ভাবতে পারেননি। ভেবেছেন শিব মেরে ফেলেছেন। এইভাবে রুগি এবং ওষুধের মধ্যে শিবকে শিখণ্ডী রাখার ফলেই তার অত বড়ো চিকিৎসা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে পাগল হল।

রাজার মুখ খুলতেই বেতাল শবসহ পালিয়ে গিয়ে উঠে বসল সেই গাছে।

২. অন্যায় শাস্তি

নাছোড়বান্দা রাজা বিক্রমাদিত্য ওই গাছের কাছে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতোই নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটা দিলেন। তখন শব থেকে বেতাল বলল, 'মহারাজ আপনি কোনো অপরাধ না করে এইভাবে কষ্ট করছেন; এই জগতে কোনো আক্রমণ করেনি এমন লোককেও আক্রান্ত হতে হয় এক-এক বার। উদাহরণস্বরূপ আপনাকে যজ্ঞ সুন্দরের কাহিনি বলছি। বিরক্ত না হয়ে শুনুন। বেতাল শুরু করল :

যজ্ঞস্থল নামে এক গ্রামে যজ্ঞ সুন্দর নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ওঁর হরি সুন্দর এবং দেব সুন্দর নামে দুই ছেলে ছিল। ওই ছেলেদের কৈশোর পেরোতে-না-পেরোতেই যজ্ঞ সুন্দরের সমস্ত অর্থ খরচ হয়ে গেল। তারপর তার স্ত্রী মারা গেলেন। এবং পরে তিনিও মারা গেলেন।

এইভাবে যজ্ঞসুন্দরের ছেলেরা অভিশপ্ত জীবন পেল। অনাথ হয়ে গেল। তাদের আত্মীয়স্বজনরা তাদের এড়িয়ে যেতে লাগল। অবশেষে ভিক্ষে করা ছাড়া ওদের সামনে আর অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না।

ওদের মামার বাড়ি অনেক দূরে। তা সত্ত্বেও নিজেদের গ্রামে থাকতে না পেরে ওরা মামার বাড়ির গ্রামের দিকে রওনা দিল। অনেক পথ। পথে ভিক্ষে করতে করতে তারা এগোতে লাগল। ওই গ্রামে পা রেখেই জানতে পারল যে ওদের দাদু-দিদিমা মারা গেছেন। তবু, তাদের মামারা যজ্ঞদেব এবং কৃতদেব তাদের যথেষ্ট আদরযত্নে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে ওদের অবস্থাও পড়ে যেতে লাগল। ওরা ভাগনেদের বলল, 'ওরে ভাগনেরা, গোরু ছাগল চরাতে যে লোক রেখেছিলাম তাদেরও আর পুষতে পারছি না। এক কাজ কর, তোমরাই চরাও।

দুঃখে বাচ্চাদের গলা ধরে এল। অন্য কোনো উপায় না থাকায় তাতেই ওরা রাজি হয়ে গেল। প্রত্যেক দিন গোরু ছাগল চরাতে নিয়ে যেত আর সন্ধের সময় নিয়ে ফিরত। এইভাবে ওদের দিন কাটছিল। একদিন একটা গোরু বাঘে নিয়ে গেল। আর একদিন একটা ছাগল চোরে নিয়ে পালাল। অবস্থা যখন খারাপ তখন গোরু ছাগল হারিয়ে মামারা ভাগনেদের উপর চটেছিল এমন সময় আরও মারাত্মক কাণ্ড ঘটে গেল। মামারা যে গোরু এবং পাঁঠাকে যজ্ঞের কাজের জন্য রেখেছিল, একদিন ওই দুটোই হারিয়ে গেল।

'এটা লক্ষ করে ভাগনেরা আর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ বাকি গোরু ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরে ওদের যথাস্থানে রেখে ওই দুটোকে খুজতে বেরুলো। বনে অনেক দূরে যাওয়ার পর ওদের নজর পড়ল ওই পাঁঠার একটা অংশের উপর। ওই পাঁঠাটার অর্ধেক বাঘে ফেলে গেছে।

'এটা আমাদের মামার যজ্ঞের পাঁঠা। এটাও বাঘের পেটে গেছে জানতে পারলে মামারা তেলেবেগুনে চটে যাবে। এটাকে পুড়িয়ে যতটা পারা যায় খেয়ে বাকিটা নিয়ে কোথাও চলে যাওয়া ভালো। দুই ভাই ওখানেই আগুন ধরিয়ে বাঘের ফেলে যাওয়া পাঁঠাটার অংশকে পোড়াতে লাগল।

ইতিমধ্যে ভরা দুপুরে গোরু ছাগলের ঘরে ফেরা দেখে মামারা ভাগনেদের উপর ভীষণ চটে গেল। ওদের খোঁজে বেরিয়ে বনে এসে দেখে বলল, 'যজ্ঞের জন্য রাখা পাঁঠাটাকে মেরে খাচ্ছিস! তোরা ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে যা!' বলে অভিশাপ দিল মামারা।

মামাদের অতদূর থেকে দেখতে পেয়েই দুই ভাই টেনে ছুটতে লাগল। ওরা ছুটতে ছুটতেই অভিশপ্ত হল। ব্রহ্মরাক্ষসে রূপান্তরিত হল।

ওরা বনে বাদাড়ে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একবার এক যোগীকে ওরা খেতে গেল। সেই যোগীর অভিশাপে ওরা পিশাচ হল।

ওরা পিশাচ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। এমন সময় একদিন ওরা এক ব্রাহ্মণের গোরু পোড়ানোর চেষ্টা করল। তখন ওই ব্রাহ্মণ ওদের চণ্ডাল হওয়ার অভিশাপ দিল। তারপর, ওরা বল্লম আর তির-ধনুক নিয়ে চণ্ডালদের মতো ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে করতে অবশেষে এক ডাকাতদের গ্রামে পৌঁছে গেল। পাহারায় যারা ছিল তারা ওই দুই ভাইকে ধরে মেরে বেঁধে নিয়ে গেল তাদের নেতাদের কাছে।

ডাকাতদের নেতা ওদের কথা শুনে ওদের বাঁধন খোলার হুকুম দিল। ওদের খাইয়ে বলল, 'তোমরাও আমাদের সঙ্গে থাক। তোমাদের কোনো ভয় নেই।' বলে ওদের প্রতি সমবেদনা জানাল।

তারপর থেকে ওই দুই ভাই, হরি সুন্দর এবং দেব সুন্দর ডাকাতদের সাথে থেকে চুরি ডাকাতি করে নিজেদের যোগ্যতাবলে একদিন ডাকাতদের নেতা হয়ে গেল।

বেতাল কাহিনি শুনিয়ে বলল, "মহারাজ, যজ্ঞ সুন্দরের দুই ছেলে কোনো অপরাধ না করে এত বিপদে পড়ার কারণ কী? সারা জগতের লোক ওদের খারাপ চোখে দেখলেও ডাকাতরা ওদের সাদরে বরণ করে নিল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দেন আপনার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

তার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'সামাজিক ধর্মবোধের মধ্যে স্বার্থ আছে। ওই স্বার্থ বুদ্ধিই যেখানে আসন গেড়ে বসে থাকে সেখানে মানুষ স্বার্থ বুদ্ধি দিয়েই সব কিছুর বিচার করে। স্বার্থবাদীরা নিজেদের স্বার্থের কথাই বেশি করে ভাবে। যজ্ঞ সুন্দরের ছেলেদের কপালে যে এত দুঃখকষ্ট জুটল তার মূল কারণও তাই। মামারা যে ভাগনেদের ভালোবাসত না তা নয় কিন্তু তাদের স্বার্থ হানি হওয়ার সাথে সাথে ওরা ভাগনেদের উপর ভয়ংকর হয়ে উঠল। অভিশাপ দিল। দুই ভাই ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে গেল। যোগী ওদের পিশাচ, আর ব্রাহ্মণ ওদের চণ্ডাল হতে যে অভিশাপ দিল তা ওদের শাপে বর হল। ব্রহ্মরাক্ষসের চেয়ে পিশাচ ভালো, পিশাচের চেয়ে চণ্ডাল ভালো। এরপর আসে ডাকাতদের কথা। ওরা একসাথে থাকে। ওদের মধ্যে একজনের স্বার্থের কোনো ব্যাপার নেই। দলের স্বার্থই বড়ো। যজ্ঞ সুন্দরের ছেলেরা চোর ডাকাতদের সাথে চুরি ডাকাতি করে সুখেই ছিল।' বললেন বিক্রমাদিত্য।

রাজা উত্তর দিতেই বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

৩. বন্ধুত্ব

জেদি বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে গেল। গাছে উঠে শব নামিয়ে কাধে ফেলে হাঁটতে লাগল। মুখে কোনো কথা নেই। শব থেকে বেতাল বলল, 'মহারাজ, স্বর্গসুখ পাওয়ার আশাতেই তুমি যদি এত পরিশ্রম করে থাক তাহলে তোমার এই চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। কারণ অত্যন্ত খারাপ লোকও স্বর্গে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমি একটা ছোট্ট কাহিনি বলছি। শুনলে হয়তো হাঁটার পরিশ্রম কমে যাবে।'

বেতাল বলতে শুরু করল : কাশীতে এক গুরুকুল ছিল। সেই গুরুকুল বা আশ্রমে পড়ার জন্য নানান দেশের ব্রহ্মচারী ছাত্র আসত। একবার ওই আশ্রমে পড়তে এল তেজ সিং নামে এক দশ বছরের ছেলে। হুশিয়ার ছেলে। পড়া সেরে প্রত্যেক দিন সে যজ্ঞের কাঠ আনত দূরের জঙ্গল থেকে।

সেই জঙ্গলে অঘোরদাস নামক এক ছেলের সাথে তেজ সিং-এর আলাপ হল। প্রত্যেক দিন অঘোরদাস সেই জঙ্গলের নানান কাহিনি তেজ সিংকে বলত। অঘোরদাসের বাবা সেই জঙ্গলের নেতা। সে ছিল নিপুণ লুণ্ঠনকারী। গোটা নগরে ডাকাত হিসেবেও তার নামডাক ছিল। অঘোরদাসের বাবা লুটপাট করে যা আনত তা সেই জঙ্গলবাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দিত।

অঘোরদাসের বাবা ও তার দলের লোকের কাজকর্ম তেজ সিং-এর ভালো লাগল না। সে তার বন্ধু অঘোরদাসকে বলল, 'বন্ধু, বড়ো হয়ে তুমিও কি তোমার বাবার মতো ডাকাত হবে? সামাজিক জীবন তোমার ভালো লাগে না?'

'কত পুরুষ ধরে আমরা নাকি এই জঙ্গলে ডাকাতি আর লুটপাট করে আসছি। আমি হঠাৎ এসব বদলাতে পারব? তোমার শিক্ষা, তোমার পরিবেশ আলাদা। আমার পরিবেশের কথা তো তোমাকে বললাম। এখন তোমাকে যদি বলি, তুমি আমাদের মতো জীবনযাপন কর, পারবে? আমার বেলাতেও একই অবস্থা।' অঘোরদাস জবাবে বলল।

ওই দুই বন্ধুর মধ্যে আচার-আচরণের অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের বন্ধুত্ব একটুও ক্ষুন্ন হয়নি।

কয়েক বছর পর তেজ সিং লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফেরার আগে অঘোরদাসের সাথে দেখা করল ওই জঙ্গলে। তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

তারপর একদিন কাশীরাজের দরবারে তেজ সিং চাকরি পেল। ওদিকে ওই জঙ্গলের ডাকাত অঘোরদাসের বাবা মারা গেল। জঙ্গলবাসী অঘোরদাসকে তাদের নেতা করল। অঘোরদাস লুটপাট আর ডাকাতিতে অল্পদিনের মধ্যেই বাপকে ছাড়িয়ে গেল।

অঘোরদাসের দুঃসাহসিক ডাকাতি আর লুটপাটের ফলে যেসব ব্যবসায়ীরা কাশী যাতায়াত করত তারা অঘোরদাসের নামে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তাকে ধরার জন্য কাশীরাজ অনেক বার নানান ধরনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। জঙ্গলবাসীরা জানপ্রাণ দিয়ে অঘোরদাসকে বাঁচাত। কাশীরাজের লোক কোনোক্রমেই তাদের কাছে পেরে উঠত না। শেষে কাশীরাজ পুরস্কার ঘোষণা করল : যে অঘোরদাসকে ধরে দেবে তার সাথে রাজকন্যার বিয়ে হবে এবং তাকেই সিংহাসনে বসানো হবে। এই ঘোষণা শুনে বহু যোদ্ধা অঘোরদাসকে ধরতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হল।

বাল্যবন্ধুর লুটপাটের কথা শুনে তেজ সিং ভীষণ দুঃখ পেল। তার মনে হল খুব জোর দিয়ে চেষ্টা করলে সে হয়তো অঘোরদাসকে সামাজিক জীবনে টেনে আনতে পারত। উঠে-পড়ে চেষ্টা করলে হয়তো অঘোরদাস বদলে যেত। এখন অঘোরদাসকে সে বাদে আর কেউ ধরতে পারবে না। ওই জঙ্গলের অনাচেকানাচে তার ঘোরা আছে। তবু বহুকাল তেজ সিং অঘোরদাসকে ধরার কোনো চেষ্টা করল না।

চোখের সামনে তেজ সিং দেখতে পেল রাজধানীর ব্যবসায়ীরা বাইরে যেতে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। বাইরের ব্যাবসাদারও ভয়ে কাশীতে আসতে পারছে না ফলে কাশীবাসীর জীবনে দারুণ অভাব অনটন দেখা দিল।

এই অবস্থায় দেশের মানুষকে দুর্দশার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তেস সিং ঠিক করল, বাল্যবন্ধু অঘোরদাসকে বন্দি করবে। অল্প সংখ্যক সেনাদের নিয়ে তেজ সিং ওই জঙ্গলে ঢুকল। ঠিক সেইসময়ে অঘোরদাস মহাশক্তির পূজা সারতে ব্যস্ত। তাকে বন্দি করে তেজ সিং তাকে কাশীরাজের সামনে হাজির

করল। রাজাও নিজের ঘোষিত কথা অনুসারে তেজ সিং-এর সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল এবং রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করল।

তেজ সিং অঘোরদাসের আজীবন কারাবাসের শাস্তি দিল। অঘোরদাস যাতে ভালো খাবার এবং ভদ্র ব্যবহার পায় তার ব্যবস্থা করল। অঘোরদাসের বন্দি হওয়ার পর ওই অঞ্চলে লুটপাটও বন্ধ হয়ে গেল। বহু বছর পরে বুড়ো হয়ে অঘোরদাস মারা গেল।

তেজ সিং রাজা হিসেবে বেশ নাম করল। প্রজারাও তার শাসনে ভালোই ছিল। তেজ সিং রাজা হিসেবে যতটা পারল প্রজাদের উপকার করল।

কয়েক বছর পরে তেজ সিংও মারা গেল। তেজ সিং মারা গিয়ে স্বর্গে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, স্বর্গে গিয়ে তেজ সিং তার বাল্যবন্ধু অঘোরদাসকে পেয়ে খুব খুশি হল। স্বর্গে ওদের বন্ধুত্ব দিনকে দিন আরও গভীর এবং মধুর হতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ, অঘোরদাস ডাকাত, লুণ্ঠনকারী, পাপী আবার তেজ সিং বাল্যবন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সেও পাপী হয়ে গেল। এহেন দু-জন পাপীর কীভাবে স্বর্গপ্রাপ্তি হল? তেজ সিং-এর শিক্ষা শেষ হবার পর এ বন্ধু দু-জনের পথ আলাদা হয়েছিল, স্বর্গে গিয়ে আবার ওই দু-পথের মিল হল কী করে? ওদের বন্ধুত্ব কেন নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হল? এসব প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি উত্তর না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বলল : তেজ সিং এবং অঘোরদাস আলাদা দুটো পথের পথিক ছিল। ওদের সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবনধারাও ছিল ভিন্ন। নিজের নিজের পথে চলা পাপ নয়। জঙ্গলবাসীর নেতা হিসাবে অঘোরদাস লুটপাট আর ডাকাতি করে নিজের দল বা জাতের লোকের মধ্যে ওই সব লুণ্ঠিত সম্পত্তি ভাগ করে, সেই লোকগুলোকে বাঁচিয়ে, পূণ্য কাজ করেছে। একইভাবে তেজ সিং অঘোরদাসকে বন্দি করে সমাজে লুটপাট এবং ডাকাতি। বন্ধ করে পূণ্য কাজ করেছে। সে রাজকুমারীকে পাওয়ার জন্য অথবা রাজত্ব। পাওয়ার জন্য অঘোরদাসকে বন্দি করেনি। তাই, দু-জনের স্বর্গপ্রাপ্তি হল। বাকি রইল বন্ধুত্বের প্রশ্ন। বন্ধুত্ব ওই দু-জনের নিজেদের ব্যাপার। তার সাথে সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই। নেই বলেই ছাত্রজীবনেই তেজ সিং-এর সাথে অঘোরদাসের বন্ধুত্ব হল। এই লোক ছেড়ে যাওয়ার পর শুধু ব্যক্তিগত প্রশ্নই থাকে। সামাজিক কোনো ব্যাপার থাকে না। সেই কারণেই স্বর্গে ওদের বন্ধুত্ব নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হল। এবং দিনকে দিন তা গভীর হতে লাগল।

রাজার মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে আবার ওই গাছে গিয়ে উঠল।

৪. শাসক

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার সেই শমীবৃক্ষের কাছে গিয়ে, গাছে উঠে, শব নাবিয়ে, শব কাঁধে ফেলে নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। শবে স্থিত বেতাল বলল, 'রাজা তুমি জনতার প্রশংসা পাবার আশায় এই মাঝরাতে এত পরিশ্রম করছ কিন্তু মনে রেখ জনতা অত তাড়াতাড়ি প্রশংসা করে না। বরং অনেক সময় যা-তা মন্তব্য করে, নিন্দেও করে। প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে হিমশেখরের কাহিনি বলছি, শুনলে তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।'

বেতাল বলল : প্রাচীনকালে সুবর্ণদেশে হিমশেখর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। জনতাকে সুখে রাখার জন্য তিনি সদা ব্যস্ত ছিলেন। কোন কাজ করলে যে প্রজাদের সুখ বৃদ্ধি হবে, আনন্দ বাড়বে সেই কাজ করার জন্য তিনি আগ্রহী থাকতেন। দেশের নানান স্থানে তিনি কূপ এবং পুকুর খনন করালেন, রাস্তা বানালেন, রাস্তার ধারে গাছ পোঁতালেন, এ ছাড়া সরাইখানা ও মন্দির নির্মাণ করালেন। বড়ো বড়ো ফুলের বাগানও তৈরি করালেন। এই ধরনের অনেক কাজ করার পরেও তিনি ভাবতেন আর কোন কাজ করা যায়, আর কী করলে দেশবাসীর সুবিধা হবে।

একবার হিমশেখর গুপ্তচরদের মাধ্যমে খবর নেবার চেষ্টা করলেন, দেশের মানুষ তার কাজ সম্পর্কে কী ভাবছে তা জানবার। গুপ্তচররা বলল, 'মহারাজ, জনতা ভাবছে আপনার শাসনে তাদের আর কোনো কিছুর অভাব রইল না। আপনার শাসনে সুবর্ণর্দেশ পৃথিবীর স্বর্গ হয়ে গেছে। তাই, দেশবাসী আপনার শাসনকাল যাতে হাজার বছর স্থায়ী হয় তারজন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।'

রাজা গুপ্তচরদের মুখে শুনে ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। নিজের কানে শুনতে চাইলেন দেশবাসীর কথা। তাদের আর কোনো কিছুর অভাব আছে কি না তা জানার জন্য তার আগ্রহ ছিল প্রবল। তিনি একদিন ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন রাজধানীতে। ঘুরে ঘুরে লোকের কথা তিনি শোনার চেষ্টা করলেন।
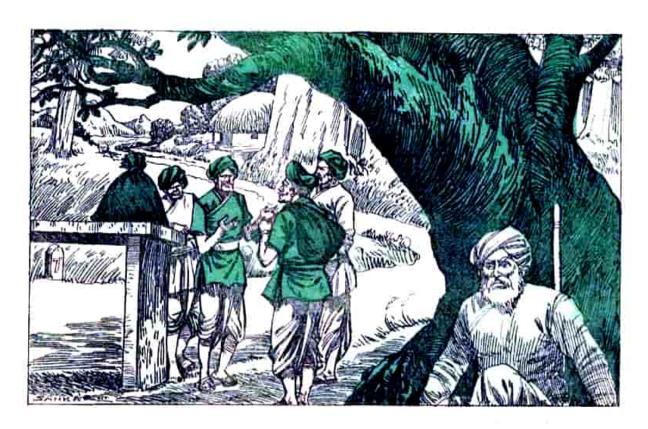
রাজা ঘুরে ঘুরে দেখতে পেলেন লোকে যে-যার কাজে ব্যস্ত। তারা যে কী চায় তার কোনো আলোচনা করছে না। ঘুরে ঘুরে অবশেষে এক জায়গায় দেখতে পেলেন চার পাঁচ জন দেশের কথা আলোচনা করছে। রাজা তাদের কাছে গিয়ে আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করলেন।

তাদের মধ্যে একজন বলল, 'অন্য দেশের লোক আমাদের দেশের সব কিছুর খুব প্রশংসা করছে। ওরা বলছে আমাদের দেশের প্রত্যেকে নাকি এক-একটা রাজা।'

'ওরা আমাদের রাজার রাজপ্রাসাদ একবার দেখে নিলে আর কোনোদিন ওই ধরনের কথা বলবে না। আমাদের রাজার ভোগ বিলাসের কথা আর কী বলব। কেমন ঠাটে থাকেন। দু-চারটে পুকুর খোঁড়ালেই আমরা সবাই রাজা হয়ে যাব নাকি? রাজারা কেন পুকুর খোঁড়ে, সরাইখানা গড়ে তোলে জানেন? শুধু দেশবাসীর প্রশংসা পাবার জন্য।' অন্য জন বলল।

অন্যেরা মাথা নেড়ে বলল, 'তোমাদের কথাই ঠিক!'

এসব কথা শুনে রাজা মাথা নীচু করে সেখান থেকে চলে গেলেন। রাজা মনে মনে বললেন, দেশবাসী আমার কাজের বিচার এভাবে করছে! আমি শুধু নিজের প্রশংসা পাওয়ার আশাতেই এসব করছি! তাহলে আমি যা কিছু করছি, যে পরিশ্রম করছি, সব বৃথা! আমি তো দেশবাসীর মনে সুখ এনে দিতে পারিনি। ওদের আনন্দ দিতে পারিনি। অতএব, দেশবাসীর জন্য আর কোনো কাজ করা উচিত নয়।

কয়েক বছর কেটে গেল। টানা একটি বছর এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। খেতের মাটি শুকিয়ে যেন পাথর হয়ে গেছে। খাদ্যের অভাবে সুবর্ণদেশের মানুষ মরতে বসেছিল। চারদিকে হাহাকার। পথে-ঘাটে মানুষ ধুকছিল।

রাজা দেশবাসীর এই দুরবস্থা আর সহ্য করতে পারলেন না। রাজা ভাণ্ডার উজাড় করে দেশবাসীকে খেতে দিলেন। সমস্ত খাদ্য বণ্টন করলেন। খাজানা থেকে অগাধ ধন খরচ করে দূর থেকে খাদ্য এনে দেশের মানুষকে খাওয়ালেন।

রাজকর্মচারী দেশবাসীর মধ্যে খাদ্য ঠিকমতো বণ্টন করছে কি না তা নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখার জন্য রাজা ছদ্মবেশে নানান জায়গায় ঘুরতে লাগলেন। এবারে রাজা লোকের মুখে যা শুনে ছিলেন তাতে তিনি অবাক হয়েছিলেন। তিনি শুনলেন, 'আমাদের রাজার মতো মানুষ কোটিতে একজনও নেই। ইনি শুধু রাজাই নন, আমাদের ভাগ্যেরও বিধাতা।' এই ধরনের ভালো ভালো কথা রাজা অনেকের মুখে শুনেছিলেন।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, "মহারাজ, হিমশেখর শুরু থেকেই দেশবাসীর সেবা করে আসছিলেন, প্রথমে লোকে কেন তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করল? পরে তাঁকেই আবার লোকে কেন একেবারে আকশে তুলল? আমার এই প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে!'

এ-প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বলল, 'হিমশেখর হয়তো দেশবাসীর উপকার করেছিলেন। কিন্তু সেই উপকার জনতার কাম্য ছিল না। ওই সব কাজ করে রাজা হয়তো তাদের চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করেননি। যার যা প্রয়োজন থাকে না সে তা পেয়ে ঠিক উপকৃত হয় না। সহজে কোনো জিনিস পেয়ে কেউ ততটা আনন্দ পায় না। তার মর্ম বোঝে না। কিন্তু আকালের সময়ে মানুষ খাদ্যের অভাবে হাহাকার করছিল। তাদের সেই অভাব অনটনের দিনে রাজা খাদ্য দ্রব্য বণ্টন করায় দেশবাসী দু-হাত তুলে পঞ্চমুখে রাজার প্রশংসা করল। তাকে আকাশে তুলল। এতে আশ্চর্য হওয়ার তো কিছু নেই।'

রাজার মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে বেতাল শব নিয়ে পালাল। আবার উঠে বসল সেই শমীবৃক্ষে।

৫. চোরের সম্মান

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য ওই গাছে উঠে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে অন্যান্য বারের মতো মৌনভাবে শ্মশানের দিকে হাঁটা দিল। তখন শব থেকে বেতাল বলল, 'রাজা আমার সন্দেহ হচ্ছে একটা ব্যাপারে। আপনি সজ্জনদের জন্য পরিশ্রম করছেন না দুর্জনদের জন্য? চন্দ্রসেন রাজার মতো কয়েক জন রাজা আছেন যাঁরা দুর্জনদের শাস্তি দেবার পরিবর্তে সম্মানিত করেন। উদাহরণস্বরূপ আমি মহারাজা চন্দ্রসেনের কাহিনি বলছি, শুনলে পরিশ্রম কমবে, শুনুন।'

বেতাল বলল : কোনো এক কালে চন্দ্রাবতী নগরে মহারাজ চন্দ্রসেন রাজত্ব করতেন। ওই দেশে বহু কোটিপতি ব্যাবসাদার থাকত কিন্তু দেশ সমৃদ্ধ ছিল না। বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র ছিল। আসলে ওই দেশের সমস্ত সম্পত্তি ব্যাবসাদারদের কবলে ছিল। তাই রাজা ব্যাবসাদারদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের সুখ-সুবিধা দেখাশোনা করাই তার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য ছিল। ধনী আরও ধনী হত, গরিব আরও গরিব।

কিন্তু ওদের সামনে একটা সমস্যা দেখা দিল, একজন ডাকাতের উপদ্রব। আগেভাগে জানিয়ে সে ডাকাতি করত। ওই ডাকাতকে ধরা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার কারণ ও নিজের দলে অন্য কাউকে নেয়নি। তার ডাকাতির সময় তাকে কেউ চিনতে বা চেনাতে পারত না। এ ছাড়া ডাকাতি করার পরক্ষণেই সে যা পেত তাই গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দিত। যাদের সাহায্য করত তারাও টের পেত না কে বা কারা সাহায্য করছে। ব্যাবসাদাররা নিজেদের রক্ষা করতে পারল না। ওই ডাকাতটাকে ধরার সমস্ত চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল তখন তারা রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'রাজা ডাকাতটাকে না ধরে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আপনার পক্ষে ভালো হচ্ছে না। আমাদের রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব।'

'আমি প্রহরী নিযুক্ত করেছি ওই ডাকাতটাকে ধরতে। ডাকাতটা একদিন ধরা পড়বেই।' রাজা বলল।

'আপনার ওই ডাকাত ধরার আগে আমরা সবাই ভিখারি হয়ে যাব। এখন আপনি ঘোষণা করিয়ে দিন : যে ধরবে তাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ওই ডাকাতের সাথী কেউ-না-কেউ ওকে ধরিয়ে দেবে।' ব্যাবসাদাররা বলল।

রাজা ব্যাবসাদারদের কথামতো ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। কেউ ডাকাতটাকে ধরিয়ে দিল না। ডাকাত যথারীতি ডাকাতি করে যেতে লাগল।

ওই ডাকাতের নাম গঙ্গাদাস। সে খুব গরিব লোক। ডাকাতি করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ সে করত না। সে লক্ষ করল যে বিভিন্ন দক্ষ লোক বেকার হয়ে বসে আছে। কাজ পাচ্ছে না। না খেতে পেয়ে মরছে। তাই, সে আর কোনো কাজ না পেয়ে চুরি করার কাজটাকেই বেছে নিল জীবিকা হিসেবে। একদিন গঙ্গাদাস গভীর জঙ্গলের এক পাহাড়ি গ্রাম থেকে ফিরছিল। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সে জোরে পা চালিয়ে হাঁটল। পথে সে ওই ঘন বন থেকে মানুষের গোঙানি শুনতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা লোক পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে।

'কী হয়েছে ভাই, তুমি কে?' গঙ্গাদাস সেই লোকটাকে প্রশ্ন করল। 'আমার নাম রামদত্ত। আমি রাজগিরির নিবাসী। ব্যাবসার কাজে আমি চন্দ্রাবতী নগরে যাচ্ছিলাম। পথে ভালুক আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। আচ্ছা

তুমি কে ভাই?' এত রাত্রে, এখানে?

সেই ব্যাবসাদার জিজ্ঞেস করল।

গঙ্গাদাস নিজের নাম বদলে বলল, 'আমার নাম ধর্মদাস। আমি এক গরিব লোক।'

গঙ্গাদাস রামদত্তকে নিজের বাড়িতে তুলে আনল। তার শরীরে ওষুধ লাগিয়ে সেবা করতে লাগল গঙ্গাদাস।রাত্রে গঙ্গাদাসকে যখন-তখন বেরিয়ে যেতে দেখে রামদত্ত তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রাত্রে কোথায় যাও বল তো?'

জবাবে গঙ্গাদাস অন্য কথা বুঝিয়ে বলে দিল। রামদত্তের ভালো ভাবে সেরে উঠতে অনেক দিন সময় লাগল। ইতিমধ্যে দুজনের মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠল। রামদত্ত একদিন গঙ্গাদাসকে বিশেষ ভাবে প্রশ্ন করল, 'তোমার এমনকী পেশা? কীভাবে তোমার দিন চলে?

রামদত্তের উপর গঙ্গাদাসের বিশ্বাস জন্মে উঠে ছিল। তাই গঙ্গাদাস রামদত্তকে নিজের সত্য কথা জানিয়ে দিল।

রামদত্ত যেদিন জানতে পারল যে গঙ্গাদাসই ডাকাত সেদিন থেকে গঙ্গাদাসের প্রতি তার টান কমে যেতে লাগল। সে জানতে পেরেছিল যে গঙ্গাদাসকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রামদত্তের মনে দশ হাজার। টাকার লোভ পেয়ে বসল। সে মনে মনে ভাবল ওই দশ হাজার টাকা দিয়ে সে লক্ষ লক্ষ টাকা করতে পারবে।

একদিন গঙ্গাদাস পাশের গ্রামে অন্য এক কাজে গেল। রামদত্ত ওই ফাকে রাজার কাছে গিয়ে বলল যে সে গঙ্গাদাসকে ধরিয়ে দেবে তাকে যেন দশ হাজার টাকা পুরষ্কার দেওয়া হয়!

'কোনো এক অজুহাতে ডাকাতকে কাল দুপুরে রাজপ্রাসাদের কাছে নিয়ে এসো। আমার প্রহরী তাকে ধরে ফেলবে।' রাজা বললেন।

রামদত্তের আনন্দ আর ধরে না। সে আবার গঙ্গাদাসের বাড়িতে এল। সে গঙ্গাদাসকে বলল, 'ভাই গঙ্গাদাস, আমি আজ পর্যন্ত কোনোদিন শহর দেখিনি। কালকে তুমি আমাকে সারা শহর দেখাবে?' গঙ্গাদাস রাজি হল। কারণ রামদত্তকে সে সন্দেহ করেনি।

দু-জনে খাবারদাবার বেঁধে পরের দিন সকালে শহর দেখতে চলল। দুপুরের সময় ওরা রাজপ্রাসাদের কাছে গেল। সেখানকার এক পুকুরের পাশে, গাছের নীচে বসে খাবার খেতে লাগল।

ঠিক তখনই কোত্থেকে এক কুকুর তাদের কাছে এল। রামদত্ত সেই কুকুরটাকে তাড়া করল কিন্তু গঙ্গাদাস কুকুরটাকে একটু খাবার খেতে দিল।

খাবার খাওয়ার পর রামদত্ত গঙ্গাদাসকে বলল, 'চল, রাজপ্রাসাদের কাছে আমাকে ঘুরিয়ে আনবে।'

কুকুরটাও গঙ্গাদাসের পিছনে চলল। ওরা দু-জনে রাজপ্রাসাদের সামনে পৌছাল। রামদত্ত প্রাসাদের সামনের প্রহরীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু ওরা গঙ্গাদাসকে ধরার কোনোরকম চেষ্টা করল না।

তখন অগত্যা রামদত্ত চিৎকার করে বলল, 'এখন তুমি আমার কবলে। এখন পালাবে কী করে।'

রামদত্তের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে গঙ্গাদাসের রক্ত মাথায় উঠে গেল। সে তৎক্ষণাৎ রামদত্তকে মারার জন্য কোমর থেকে ছোরা বের করল। কিন্তু আগে থেকেই রামদত্ত প্রস্তুত থাকায় সে-ই আগে ছোরা ছুড়ে মারল। হঠাৎ সেই কুকুর ছোরার সামনে লাফিয়ে পড়ল। ছোরা কুকুরের গায়ে বিদ্ধ হল। কুকুর তক্ষুনি মারা গেল।

পরক্ষণেই গঙ্গাদাস নিজের তরবারি বের করে রামদত্তের মাথায় আঘাত করল। তখন প্রহরীরা এগিয়ে গিয়ে গঙ্গাদাসকে ধরে ফেলল।

গঙ্গাদাস রামদত্তের মৃত দেহের উপর লাথি মেরে বলল, 'পাজি বদমাইস! তোর চেয়ে ওই রাস্তার কুকুরটা ঢের ভালো। প্রহরী গঙ্গাদাসকে রাজার সামনে হাজির করল। রাজা গঙ্গাদাসের সাথে অনেকক্ষণ গোপনে আলোচনা করলেন।
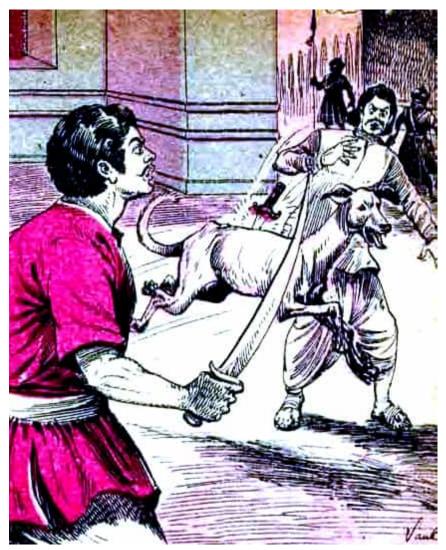
পরের দিন দেশের সমস্ত বড়ো বড়ো নামকরা ব্যাবসাদারদের ডেকে পাঠালেন। সবার সামনে গঙ্গাদাসকে হাজির করে রাজা বললেন, ‘এই গরিব লোকটা আমাদের দেশের বিরাট উপকার করেছেন। এর পর আর কোনো চুরি-ডাকাতি হবে না। প্রত্যেকে দশ দশ হাজার করে এই লোকটাকে দিলেও এর উপকারের ঋণ শোধ হবে না।'

ব্যাবসাদাররা রাজার কথামতো গঙ্গাদাসকে পুরস্কৃত করল। তারপর গঙ্গাদাস রাজার পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, ‘রাজা, মহারাজ চন্দ্রসেনের এই ধরনের ব্যবহারের কারণ কী? তাঁর প্রহরীরা গঙ্গাদাসকে দেখার সাথে সাথে ধরল না কেন? ডাকাতের ধরা পড়ার পর তাকে শাস্তি না দিয়ে ব্যাবসাদারদের দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করালেন কেন? তাকে নিজের পরামর্শদাতা নিযুক্ত করলেন কেন? গঙ্গাদাস কি রাজাকে বলে ছিল যে সেই ডাকাতটাকে মেরে ফেলেছে? তার আগের দিন রাজা রামদত্তকে দেখে ছিলেন না? রাজা কি গঙ্গাদাসকেই রামদত্ত ভেবে ছিলেন ? এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দেন তো মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

তারপর বিক্রমাদিত্য বলল, 'ওই ডাকাতের জন্য রাজার কোনো ক্ষতি হচ্ছিল বলে তো আমার মনে হচ্ছে না। রাজা ছিলেন ব্যাবসাদারদের হাতের পুতুল। ব্যাবসাদারদের ক্ষতির ফলে রাজার কোনো দুঃখ ছিল না।

তাই ডাকাতটাকে ধরার ব্যাপারে রাজা হয়তো তত ব্যস্ত ছিলেন না। উলটে রাজা যখন গরিবদের উপকার করতে পারছিলেন না তখন ওই ডাকাতই উপকার করছিল। এইভাবে হয়তো ডাকাতটা রাজার ইচ্ছাই পূরণ করছিল। ডাকাতটাকে ধরানোর জন্যে যে লোকটা এগিয়ে এল সে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছু নয়। তাই বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি রাজা ডাকাতকে দিয়েই দেওয়ালেন। গঙ্গাদাস রাজাকে হয়তো সমস্ত সত্য কথাই জানিয়েছে। মিথ্যা কথা বলে দশ হাজার টাকা রোজগার করার লোভ গঙ্গাদাসের মনে ছিল না। তাই রাজা তাকে শাস্তি দিলেন না। রাজা জানতেন। যে ব্যাবসাদারদের কাছ থেকে গঙ্গাদাসকে যে পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছেন তা গরিবদের হাতেই পৌঁছে যাবে। তাকে পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত করার পেছনেও কারণ ছিল। রাজা হয়তো তার মাধ্যমে ব্যাবসাদারদের রহস্য জেনে তাদের হাত থেকে নিজেকে ক্রমশ মুক্ত করতে চেয়েছেন।'

রাজার মুখ খোলার সাথে সাথে মৌন ভাব ভঙ্গ হল। তৎক্ষণাৎ বেতাল শব নিয়ে উঠে বসল সেই গাছে।

৬. সাধনা

বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে গেল। শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগল।

শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, কেন যে তুমি এত পরিশ্রম করছ ভেবে পাই না। গুণকীর্তির মতো তুমিও একদিন হাতে পাওয়া জিনিস নিজের হাতেই ধ্বংস করে ফেলবে। গুণকীর্তির কাহিনি শুনলে তুমি তোমার এই পথ চলার পরিশ্রম ভুলে যাবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীনকালে শোণাবতী নদী তীরে সদানন্দ নামে এক বীণাবাদক থাকত। লোকে তাকে নতুন সরস্বতী এবং অভিনব নারদ নাম রেখেছিল। বহু রাজা তাকে নিজের দরবারে নিমন্ত্রণ করত।

কিন্তু সদানন্দের মনে ধন অথবা যশ লাভের কোনো ইচ্ছা ছিল না। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অধিক সংখ্যক শিষ্যকে নিজের বিদ্যা দান করা। তাই হাজার হাজার শিষ্য তার কাছে থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে। ফলে সদানন্দের অযাচিত ভাবেই রাজ আশ্রয় এবং যশ লাভ হল।

ক্রমে ক্রমে সদানন্দের বয়স হতে থাকে, বৃদ্ধ হয়। যারা বৃদ্ধ সদানন্দের কাছে থেকে শিখতে আসত সদানন্দ তাদের পুরোনো শিষ্যদের কাছে পাঠিয়ে দিত। সেইসময় যুবক গুণকীর্তি তার কাছে এল। সদানন্দকে বীণাবাদন শেখাতে বলল।

'বাবা আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার অনেক শিষ্য আছে। তাদের একজনের কাছে শিখে নাও।' সদানন্দ গুণকীর্তিকে বলল।

'আজ্ঞে, আপনার শিষ্যদের মধ্যে একজনও পরিপূর্ণ বিদ্যা অর্জন করতে পারেনি। আমি পূর্ণ বিদ্যা অর্জন করার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে শেখালে আমি বীণা বাজানোর চর্চা করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার যশ অক্ষুন্ন রাখতে পারব।'

'বাবা, তোমার উৎসাহ প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমাকে পূর্ণ শিক্ষা দিয়ে যেতে পারব কি না। যাই হোক তোমার এই গভীর আগ্রহ এবং দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমারও ইচ্ছে করছে তোমাকে শেখানোর।' সদানন্দ গুণকীর্তিকে শিষ্য করে নিল।

গুণকীর্তি গুরুর সেবা করে, যথেষ্ট পরিশ্রম করে, বীণাবাদন শিখতে লাগল।

তা সত্ত্বেও সদানন্দ যা ভেবেছিল তাই হল। গুণকীর্তির শিক্ষালাভ অর্ধেক হতে-না-হতেই সদানন্দ অসুখে পড়ে গেল। একদিন গুণকীর্তিকে কাছে ডেকে সদানন্দ বুঝিয়ে বলল, 'বাবা, আমার অন্তিম সময় এসে গেছে। তোমাকে পরিপূর্ণ রূপে শেখানো আর আমার জীবনে হয়ে উঠল না। আর চার-পাঁচ বছর আগে যদি তুমি আমার কাছে আসতে তাহলে আমার চেয়ে অনেক বড়ো বীণাবাদক তোমাকে করতে পারতাম। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমাদের দু-জনের কারোর ছিল না। আমাদের বংশে চিরকাল একটি বিচিত্র বীণা আছে। তাতে প্রত্যেক স্বর তিনটি স্থানেই ধ্বনিত হয়। যেকোনো বীনাবাদক সেই বীণা বাজালে তার আওয়াজ শুনে শ্রোতা মুগ্ধ হবে। সে বীণা বাজিয়ে তুমি বড়ো বড়ো রাজাদের খুশি করতে পারবে। শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তুমি যশ পাবে।' এই কথা বলে সেই বীণা গুণকীর্তিকে দিয়ে সদানন্দ মারা গেল।

গুণকীর্তি ভক্তি সহকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর্ম করল।

তারপর একদিন সেই বীণা নিয়ে রাজ দরবারে হাজির হয়ে বলল, "মহারাজ আপনি আমাকে আপনার দরবারে বীণাবাদক করে নিন।'

রাজা দরবারে বীণা বাজানোর অনুমতি গুণকীর্তিকে দিলেন। গুণকীর্তি নিজের পূর্ব পরিচিত সংগীত ওই বিচিত্র বীণার মাধ্যমে শোনাল। শুনে দরবারের সবাই মুগ্ধ হল। দরবারের কেউ কোনো দিন এত ভালো বীণাবাদন অতীতে শোনেনি।

রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের দরবারের বীণাবাদক পদে নিযুক্ত করলেন। সম্মানীও ভালোই দিলেন। তার ফলে গুণকীর্তির যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর বহু নাম করা বীণাবাদক গুণকীর্তির বীণাবাদন শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল।

নানান দেশ থেকে যুবকরা এসে গুণকীর্তির শিষ্য হতে চাইল। কিন্তু গুণকীর্তি ভিন্ন ভিন্ন অজুহাতে ওদের কাউকে শিষ্য করল না।

বিশ্বের চোখে গুণকীর্তি মস্তবড়ো প্রতিভাবান যশস্বী বীণাবাদক হলেও মনে মনে তার কিন্তু শান্তি ছিল না।

গুণকীর্তির মনের অবস্থা যখন এতখানি অশান্ত সেইসময় রাজা গুণকীর্তিকে ডেকে বললেন, 'আমার মেয়ে কলাবতীকে বীণাবাদন শেখাতে হবে। আমার মেয়ে তোমাকেই মনে মনে ভাবী স্বামী হিসেবে বরণ করেছে।'

রাজার কথা শুনে গুণকীর্তির মনের অশান্তি যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মানসিক যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল।

শেষে একদিন গভীর রাত্রে গুণকীর্তি সেই বিচিত্র বীণা নিয়ে গোপনে পালিয়ে গেল। এক নদীর তীরে গিয়ে সেই বীণাটিকে পাথর দিয়ে ভেঙে ফেলে। তারপর সোজা গুরুর আশ্রমে গিয়ে নিজের আগেকার বীণা নিয়ে নতুন করে সাধনা শুরু করল। বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর একদিন গুরু ছাড়াই তার সেই সাধনা সিদ্ধ হল।

নিজের সিদ্ধি লাভের পর গুণকীর্তি একদিন ওই রাজদরবারে গিয়ে সবাইকে বীণাবাদন শুনিয়ে দেয়।

একদিন বিচিত্র বীণায় যে বাদন শ্রোতারা শুনেছিল গুণকীর্তি সেই বাদন তাদের শোনাল।

তারপর গুণকীর্তি কলাবতীকে বীণাবাদন শেখাল। আরও বহু শিষ্য তার কাছে শিখতে এলে সে তাদের একইভাবে সানন্দে সাগ্রহে শেখাতে লাগল। তারপর এক শুভ দিনে গুণকীর্তির সাথে কলাবতীর বিয়ে হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ গুণকীর্তি কী ধরনের লোক? বিচিত্র বীণা ভেঙে ফেলা পাগলামি নয়? সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে তার কতখানি ক্ষতি হত? গুণকীর্তি এরকম করল কেন? আমার এসব প্রশ্নের জবাব তুমি জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথা শুনে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'গুণকীর্তি বোকা নয়, পাগলও নয়। তার জীবনে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য ছিল। সদানন্দের হঠাৎ মৃত্যু ঘটায় তার সেই লক্ষ্য পূরণের পথে বাধা পড়ল। গুরুর কাছে সে চাইল পাণ্ডিত্য কিন্তু সে পেল বিচিত্র বীণা। প্রতিভাশালীর কাছে সাধনার মহত্ব নেই। কিন্তু যে সাধনা করে প্রতিভার মহত্ব অর্জন করতে চায় সে তা না করতে পারলেই অশান্তি ভোগ করে। তাই একদিন গুণকীর্তিকে নিজের হাতে সেই বিচিত্র বীণা ভেঙে চুরমার করতে হয়েছে। গুণকীর্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস পুরোমাত্রায় ছিল। এবং ছিল বলেই একলব্যের মতো গুরুকে স্মরণে রেখে সাধনা করে একদিন সে সিদ্ধিলাভ করল। সিদ্ধিলাভ না করলেও তার মনে অশান্তি থাকত না।'

রাজা এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ করার সাথে সাথে বেতাল শব নিয়ে সেই গাছে উঠে পড়ল।

৭. রাক্ষস বিবাহ

বদ্ধপরিকর বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে নামিয়ে মড়াটাকে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে হাঁটতে লাগলেন।

শবে-লগ্ন বেতাল বলল, 'রাজা, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কেন তুমি এভাবে খাটছ। কেন তুমি এই মাঝরাতে এভাবে পরিশ্রম করছ। মনে রেখ সিংহপুরীর রাজা বিজয়বসন্তের মতো নিজের প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত রক্ষা না করার লোকও জগতে আছে। তোমার এই পরিশ্রম ভোলানোর জন্য তোমাকে একটি গল্প শোনাচ্ছি, শোনো।'

বেতাল নিজের কাহিনি শুরু করল : বিজয়বসন্ত অসাধারণ পরাক্রমী এবং শক্তিশালী ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার অরুণকুমারী নামে এক কন্যা ছিল। তার কন্যার রূপের প্রশংশা তার বাবার অসাধারণ ক্ষমতার মতো চারদিকে ছড়িয়ে গেল।

অরুণকুমারী বড়ো হল। রাজদরবারে রাজকন্যার বিয়ে দেবার ব্যাপারে আলোচনা হল। রাজা ঘোষণা করল, 'যুদ্ধবিদ্যায় যে রাজকুমার সবার চেয়ে ক্ষমতাশালী প্রমাণিত হবে তার সাথেই আমার মেয়ের বিয়ে হবে।'

এই ঘোষণার ভিত্তিতে মন্ত্রীরা অরুণকুমারীর স্বয়ংবর সভার ব্যবস্থা করল। চারদিকে প্রচার করে দিল : যে সমস্ত রকমের যুদ্ধবিদ্যায় সবাইকে পরাজিত করতে পারবে তার সাথেই রাজকন্যার বিয়ে হবে। এই ঘোষণা সমস্ত দেশেই করানো হয়েছিল। হয়নি শুধু শালপুরীতে। কারণ শাকলপুরী এবং সিংহপুরীর মধ্যে বহুদিনের শত্রুতা ছিল।

কিন্তু শাকপুরীর রাজকুমার কমলশেখর অরুণকুমারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা বহুদিন ধরে গোপনে করেছিল। অন্য দেশের রাজকুমারের মাধ্যমে সে অরুণকুমারীর স্বয়ংবরের খবর পেল। তখন সেই রাজকুমারের বন্ধু হিসেবে কমলশেখর স্বয়ংবর সভায় যোগদান করল।
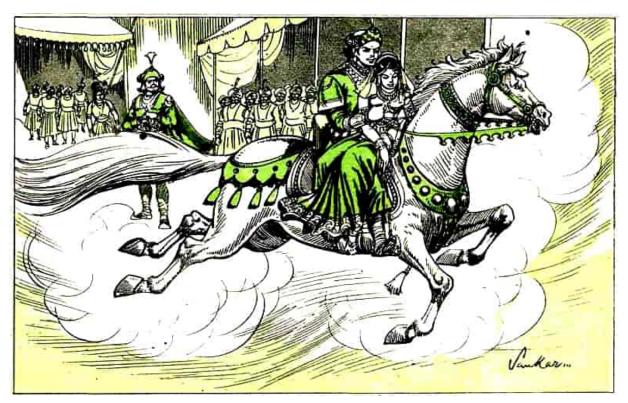
স্বয়ংবর সভার দিন অন্য রাজকুমারদের মতো কমলশেখরও ঘোড়ায় চড়া, গদাযুদ্ধ, এবং তির চালনায় অংশগ্রহণ করল এবং পরিশেষে অস্ত্র চালনায় সবার সেরা প্রমাণিত হল।

অরুণকুমারী কমলশেখরের গলায় মালা দিতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ বিজয়বসন্ত কমলশেখরকে আলিঙ্গন করে প্রশ্ন করল, 'কুমার, আমি তোমার যুদ্ধ কৌশলে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি কোন দেশের রাজকুমার। তোমার নাম কী?'

'আমি শাকপুরীর রাজকুমার। নাম আমার কমলশেখর।'কমলশেখর বলল।

রাজা বিজয়বসন্ত ক্রোধে গর্জে উঠে বলল, 'পাজি, এক্ষুনি তুমি এখান থেকে চলে যাও। এবারের মতো আমি তোমাকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিচ্ছি।'

কমলশেখরের রাগ হল। একইরকমের কঠোর কণ্ঠস্বরে সে বলল, 'যে মুহূর্তে আপনার ঘোষণা অনুসারে আমি জয়ী হয়েছি সেই মুহূর্তেই আপনার মেয়ে আমার স্ত্রী হয়ে গেছে। আমিও দেখতে চাই আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনি কীভাবে বাধা দেন।'

এই কথা বলে কমলশেখর খাপ থেকে তরবারি বের করল।

বিজয়বসন্তও তরবারি বের করল। দুজনের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধের সময় বিজয়বসন্তের হাতে মারাত্মক আঘাত লাগল।

পরক্ষণেই কমলশেখর অরুণকুমারীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজের দেশের দিকে রওনা হয়ে গেল। বিজয়বসন্ত যুদ্ধ-ভেরি বাজাল। নিজের সমস্ত সেনা নিয়ে শাকলপুরীর দিকে এগিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে শাকপুরীর সেনা যুদ্ধে নামল। সেনাদের সামনে ছিল কমলশেখরের সাথে স্বয়ং অরুণকুমারী।

নিজের কন্যাকে দেখেই বিজয়বসন্ত নিজের সেনাকে যুদ্ধ করতে বারণ করে দিল। নিজের কন্যা এবং জামাতাকে আশীর্বাদ করে ওদের শাকপুরীতে ঢুকল। কমলশেখরের বাবার সাথে মৈত্রী স্থাপন করল। নিজের কন্যার বিয়ে ঘটা করে সম্পন্ন করিয়ে বিজয়বসন্ত নিজের দেশে ফিরল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল, ‘রাজা, অত বড়ো পরাক্রমশালী রাজা বিজয়বসন্তের এই ধরনের কাজের উদ্দেশ্য কী ? নিজের ঘোষণা অনুযায়ী যে রাজকুমার জয়ী হল তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না কেন? তাকে মেরে ফেলার জন্য অস্ত্র বের করল কেন? পরে তার দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমস্ত সেনা নিয়ে গেল কেন? এই প্রশ্নগুলোর জবার জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এককথায় বিক্রমাদিত্য বলল, ‘অরুণকুমারীর স্বয়ংবর সভায় কমলশেখরকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। তাই, ওই স্বয়ংবর সভায় তার অংশগ্রহণ করার অধিকার ছিল না। কমলশেখর বিজয়বসন্তের শত্রুর ছেলে। অতএব সে-ও শত্রু। তা সত্ত্বেও বিজয়বসন্ত কমলশেখরকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল। কিন্তু কমলশেখরই প্রথমে তরবারি বের করল। আক্রমণ যে করে তাকে আক্রমণ করা অপরাধ নয়। বিজয়বসন্তের যুদ্ধ করতে যাওয়াও যুক্তিসংগত। নিজের কন্যাকে স্বয়ংবর সভা থেকে হঠাৎ কমলশেখরের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে ওই বিয়ে রাক্ষস বিয়েতে পরিণত হয়েছিল। তাই বিজয়বসন্ত নিজের কন্যাকে উদ্ধার করতে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কমলশেখরের পাশে নিজের কন্যাকে দেখে বিজয়বসন্ত পরিষ্কার বুঝল যে এ বিয়েতে মেয়ের পুরো মত আছে। যে কুমার জোর করে নিয়ে গেছে তাকেই নিজের মেয়ের পছন্দ। সেক্ষেত্রে ওই বিয়ে আর রাক্ষস বিয়ে হিসেবে ধরা যায় না। সেইজন্য, বিজয়বসন্ত সানন্দে মেয়ের বিয়ের মত দিল। আর জামাইয়ের সাথে শত্রুতার সম্পর্ক রাখা অনুচিত ভেবে তার বাবার সাথে মৈত্রী স্থাপন করল।'

রাজা মৌনভাব ভঙ্গ করার সাথে সাথে বেতাল শব উধাও হয়ে আবার সেই গাছে উঠে গেল।

৮. প্রাণদান

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতোই নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, ‘রাজা, বহু বছর আগে মাধব নামে একজন। বহু লোককে সাহায্য করেছিল। কিন্তু আপনজনকে কোনোরকম সাহায্য করেনি। তোমারও দেখছি সেই অবস্থা হচ্ছে। শুধু পরের জন্য খেটে মরছ। মাধবের কাহিনি একটু খুলে বলছি, তাতে তোমার খাটুনিও কমবে।'

বেতাল মাধবের কাহিনি শুরু করল : পিনাকিনী নদীর ধারে সম্পন্ন পরিবারে মাধব নামে এক যুবক ছিল। তার শৈশব, কৈশোর কেটেছে খুব বেশি আদরযত্নে। বিপদ-আপদে সে কোনোদিন পড়েনি। যথাসময়ে লেখাপড়া করার কষ্টও সে করেনি। তাই লেখাপড়া তার আর হল না। তার জমিজায়গা ছিল অনেক। তাই, মাধবের বাবা-মা তাকে লেখাপড়া করতে জোর করেনি। মাধবের যা ইচ্ছা তাই তাকে করতে দিত।

মাধব বড়ো হল। তার ইচ্ছে করল শহরে যাওয়ার। বাবা-মা-কে নিজের ইচ্ছা জানাল। ওর বাবা-মা বারণ করল না। মাধব জমিজায়গা সব বিক্রি করে শহরে চলে গেল। ওই শহরের নাম বিক্রমসিংহপুর। শহরে ভালো বাড়ি কিনল। বাকি সমস্ত অর্থ দিয়ে ব্যাবসার জিনিস কিনে যত্ন করে ভাণ্ডারে রেখে দিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তার। একদিন তার বাড়িতে আগুন ধরে গেল। মাধব কোনোরকমে আগুনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাল। কিন্তু পারল না তার বাবা-মা ও ব্যাবসার জিনিস উদ্ধার করতে। ধনী মাধব ভিখারি হয়ে গেল। বাঁচার পথ তার সামনে খোলা ছিল না।

কিন্তু ভিক্ষে করতেও তার মন চাইল না। তাই সে ঠিক করল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে। একদিন গভীর রাত্রে সে চুপিচুপি পিনাকিনী নদীতে ঝাঁপ দিতে গেল।

হঠাৎ সেই অন্ধকারে গাছের নীচে থেকে অজানা অচেনা কে একজন চিৎকার করে বলে উঠল, 'বাবা তুমি যাচ্ছ কোথায়? কী করতে যাচ্ছ?’

মাধব সেই গাছের নীচে গেল। সেখানে এক মুনিকে দেখতে পেল। মাধব মুনিকে নিজের কাহিনি শোনাতে গেল। মুনি তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমি তোমার সমস্ত কাহিনি ভালোভাবেই জানি। এই জগতে কীভাবে বাঁচতে হয়। তা তুমি দেখছি মোটেই জান না। তুমি নদীতে ঝাপ দিয়ে মরতে চাইছ বটে কিন্তু তুমি তা কিছুতেই পারবে না।'

‘কেন মুনিবর?’ মাধব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল !

‘তোমার আয়ু যে এক-শো বছর। এক-শো বছর না হলে তুমি মরবে কী করে?’ মুনি বলল।

এ-কথা শুনে মাধব মোটেই খুশি হল না। আরও ঘাবড়ে গিয়ে সে বলল, ‘আমার এখন একমুঠো খাবারের জোগাড় করার ক্ষমতা নেই। আর আপনি বলছেন কিনা আমি এক-শো বছর বাঁচব? বাঁচা আমার কাছে নরকযন্ত্রণা। মনিবর, এখন আমাকে কি এক-শো বছর ধরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?’

মুনি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, তুমি টাকাপয়সা ছাড়া বাঁচতে পারবে না? তুমি কি টাকাপয়সা রোজগার করতে চাও? বল তাহলে আমি একটা উপায় বলে দেব। মরা মানুষকে তুমি নিজের আয়ু থেকে ভাগ দিয়ে বাঁচাতে পারবে। এইভাবে একটু একটু আয়ু বিক্রি করে অনেক রোজগার করতে পারবে। কিন্তু মনে রেখ যত আয়ু তুমি বিক্রি করবে তোমার এক-শো বছর থেকে কিন্তু তত বছর কমবে।'

মাধব ভাবল মুনির কথা যদি সত্য হয় তাহলে তো তার জীবনে কোনো সমস্যাই থাকবে না।

মুনির কাছে মাধব মন্ত্র নিল। কী করে অন্যকে বাঁচাতে হয়। কী করে আয়ু বিক্রি করতে হয়।

তারপর সে হাঁটতে শুরু করল। যেতে যেতে সকালে একটি গ্রামে পৌঁছোল। ওই গ্রামে এক ধনীর বাড়ির সামনে অনেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। আগের দিন রাত্রে নাকি ওই ধনী লোকটা দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

মাধব ওই ধনীর আত্মীয়দের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি একে বাঁচিয়ে দিলে তোমরা আমাকে কী দেবে?'

তার কথা শুনে সবাই অবাক হল। বিশ্বাস করল না তার কথা।

'আমি বাঁচাতে না পারলে কারও কোনো ক্ষতি তো হবে না? বাঁচাতে পারলে কী দেবে তাই জিজ্ঞেস করছি।' মাধব বলল।
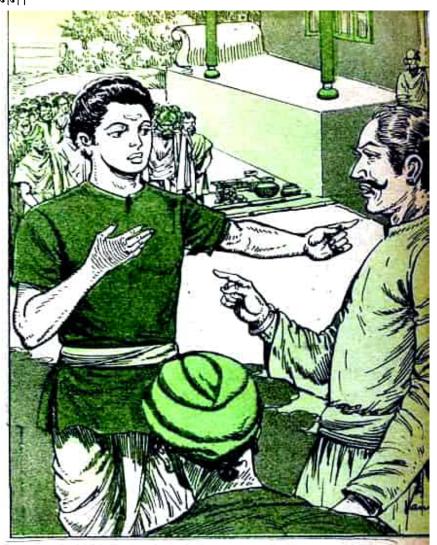
'একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেব। তুমি যদি পার বাঁচিয়ে তোল।' ধনীর আত্মীয়রা বলল।

মাধব হাত-পা ধুয়ে নিল। একটা জল ভরতি পাত্র নিয়ে মড়ার কাছে বসল। মন্ত্র পড়ে নিজের আয়ুর অংশ দান করতে করতে মড়ার উপর জলের ছিটে দিল। সাথে সাথে মডা নড়ে উঠল। ধনী বেঁচে উঠল। মাধবকে ওরা শুধু যে স্বর্ণমুদ্রা দিল তাই নয় বস্ত্র ও বাহন দিয়ে তাকে প্রণাম করল।

স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে মাধব নিজের শহরে ফিরে এল। তার যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রতিদিন পালকিতে করে বহু মড়া তার বাড়ির সামনে লোকে আনত।

মাধবের জীবন দানের ব্যাবসা জোর জমে উঠেছিল। ওর বাড়িতে ধনসম্পত্তির যেন বৃষ্টি হতে লাগল। বহু গরিবও মড়া নিয়ে হাজির হত, প্রাণ দান করতে অনুরোধ করত তাকে।

মাধব অল্পদিনের মধ্যেই কোটিপতি হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও তার প্রাণ দানের ব্যাবসা দিনের পর দিন বাড়ছিল। সে সতর্ক হল। অল্প অল্প দিনের আয়ু বণ্টন করতে লাগল। শুধু মাধব নিজে জানত সে কতদিনের আয়ু বণ্টন করতে পারে। অন্যেরা ভাবত মাধব অফুরন্ত আয়ু বণ্টন করতে পারে।

মাধব যোগ্য এক মেয়েকে বিয়ে করল। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই তার বউ মারা গেল। মাধব নিজের বউকে আয়ু দান করে বাঁচাল না। শাস্ত্র মতে স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর্মাদি সারল।

সবাই অবাক হল। যে লোকটা এত লোককে বাঁচাতে পেরেছে সে নিজের বউকে বাঁচাতে পারল না! লোকে ভাবতে লাগল মাধবের আর বাঁচানোর ক্ষমতা নেই। যে ক্ষমতা দেখিয়ে মাধব হাজার হাজার মানুষকে অবাক করেছিল, সেই ক্ষমতা যে মাধবের হারিয়ে গেছে লোকে তার প্রমাণ হাতেনাতে পেয়ে গেল।

এই ঘটনার পর থেকে যারাই মড়া নিয়ে মাধবের কাছে যেত তাদের সবাইকে মাধবের প্রতিবেশীরা বলত, 'আরে তোমরা কার কাছে এসেছ! যে মাধব নিজের বউকে বাঁচাতে পারল না সে অন্যকে বাঁচাবে কী করে?' এ-কথা শুনে লোকে ফিরে যেত হতাশ হয়ে। ক্রমে ক্রমে মড়া আর কেউ আনত না। এর পর আশি বছর বয়স পর্যন্ত মাধব ভালোভাবে বেঁচেছিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। যে মাধব এত লোককে বাঁচিয়েছে সে নিজের স্ত্রীকে বাঁচাল না কেন? ওর স্ত্রীর কাছে টাকাপয়সা পাবে না বলে? নাকি সে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসত না ? স্ত্রীকে না বাঁচিয়ে মাধব নিজের সুনাম ক্ষুন্ন করল কেন? এই প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

তারপর বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মাধব ব্যাবসা করছিল। ওর ব্যাবসার মূলধন ছিল ওর নিজের আয়ু। সীমিত আয়ু থেকে কিছু কিছু বণ্টন করে সে টাকাপয়সা রোজগার করছিল। সে সুনাম অর্জনের জন্য এসব করেনি। তার টাকাপয়সা যখন হয়ে গেল তখন সে ঠিক করল, আয়ু বিক্রির ব্যাবসা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু তার যশ এবং সুনাম এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল যে তার পক্ষে ব্যাবসা বন্ধ করা অসম্ভব ছিল। একমাত্র সুনাম ক্ষুন্ন করা ছাড়া ব্যাবসা বন্ধের অন্য কোনো উপায় ছিল না। ঠিক এই সময় তার স্ত্রী মারা গেল। স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও মাধব তাকে বাঁচল না। নিজেকে সে অনেক বছর বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিল। তাই সে ত্যাগ করল নিজের সুনাম এবং স্ত্রীকে। মাধব তা না করলে অন্যদের বাঁচাতে বাঁচাতে নিজে মরে যেত।'

রাজার এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সাথে সাথেই বেতাল শব নিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

৯. পিতার ধর্ম

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে এলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতো আবার নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। শবেস্থিত বেতাল বলল, 'মহারাজ, এই অসময়ে তুমি ভীষণ পরিশ্রম করছ। কিন্তু কেন যে করছ বুঝতে পারছি না। নিজের জন্য না পরের জন্য? কার জন্য এই পরিশ্রম? তোমার পরিশ্রম কমানোর জন্য তোমাকে রামশাস্ত্রীর কাহিনি শোনাচ্ছি শোনো।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীন কালে পার্বতীপতি নামে এক নাম করা পণ্ডিত ছিল। পণ্ডিতের পরিচয় জেনে সেই দেশের রাজা তাকে একটি গ্রাম উপহার দিয়ে দেয়।

পার্বতীপতির ধনসম্পত্তি অথবা খ্যাতির অভাব ছিল না। কিন্তু তার মনে শান্তি ছিল না। কারণ তার ছিল না কোনো সন্তান। সেটাই তার দুঃখ। অনেক জপতপ তীর্থ দর্শন প্রভৃতির ফলে তার একটি পুত্র সন্তান হল। ছেলের নাম রাখা হল রামশাস্ত্রী।

প্রত্যেক পিতাই চান তার পুত্র তার চেয়ে খ্যাতিমান হোক। পার্বতীপতিও চেয়েছিল তার ছেলে বিরাট পণ্ডিত হোক। তার চেয়ে বেশি যশ ও খ্যাতি পাক। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হল না। কারণ রামশাস্ত্রীর একদম লেখাপড়ায় মন ছিল না।

রামশাস্ত্রীর স্বভাব চরিত্রও খুব ভালো ছিল। বাবা-মার প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধাও ছিল। কিন্তু লেখাপড়ার নাম করলেই তার জ্বর আসত। যা শিখত পরক্ষণেই তা ভুলে যেত। কিছুই তার মাথায় ঢুকত না। তার মাথায় যেন গোবর ভরা ছিল।

পার্বতীপতির মনে নতুন এক দুঃখ দেখা দিল ছেলের এই অবস্থা দেখে। ছেলে যে পড়তে বসত না তা নয়। বসত। কিন্তু অনেক বার পড়লেও সে কিছুই মনে রাখতে পারত না। পড়ত আর ভুলত। দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল রামশাস্ত্রী।

একবার পার্বতীপতির এক ছেলেবেলার বন্ধু তার সাথে দেখা করতে এল। নাম তার চন্দৰভট্ট। চন্দ্রভট্ট পাশের রাজ্যের দরবারের পণ্ডিত ছিল। চন্দৰভট্ট যখন এল পার্বতীপতি তখন বাড়িতে ছিল না। রামশাস্ত্রী ছিল। তার সাথেই চন্দৰভট্টের কথাবার্তা হল।

'তুমিই পার্বতীপতির ছেলে?' চন্দৰভট্ট প্রশ্ন করল। রামশাস্ত্রী দিল নিজের পরিচয়। বাবা কোথায় গেছে তা-ও জানাল। দুজনের মধ্যে অনেক কথা হল।

এত কথা হওয়ায় চন্দ্রভট্ট বুঝতে পারল যে রামশাস্ত্রীর বুদ্ধিসুদ্ধির একেবারেই অভাব। ইতিমধ্যে পার্বতীপতি বাড়ি ফিরল। অনেকদিন পরে ছেলেবেলার বন্ধুকে দেখে পার্বতীপতির খুব আনন্দ হল। চন্দৰভট্টকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করল। চন্দৰভট্ট বলল, 'পার্বতীপতি, আমার এখন আর কোনো চিন্তাভাবনা নেই। এবার ছুটি নেব সব কাজ থেকে।'

'কেন? কী হয়েছে?' পার্বতীপতি প্রশ্ন করল।

'আমার চেয়ে যোগ্য পণ্ডিত যখন আছে। তখন আর ওই পদ আঁকড়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করে না।' চন্দৰভট্ট জবাবে বলল।

'তোমার চেয়ে যোগ্য পণ্ডিত আবার কে আছে?' পার্বতীপতি প্রশ্ন করল। 'আর কে থাকবে আমার ছেলেই আছে।' সগর্বে চন্দ্রভট্ট বলল।

এই কথা শোনার পর সূক্ষ্ম অপমানের জ্বালায় পার্বতীপতি মাথা নীচু করে ফেলল। চন্দৰভট্ট আগেই জেনেছিল পার্বতীপতির ছেলের বিদ্যের দৌড়। পরক্ষণে সহানুভূতির সাথে চন্দৰভট্ট বলল, 'অনেক

সাধ্যসাধনা করার পর ছেলে হয়েছে তো তাই আদর দিয়ে ছেলের মাথা খেয়েছ। এখন আর দুঃখ করে কী হবে।'

পার্বতীপতির মুখে কথা নেই। গম্ভীরভাবে চুপ করে বসে রইল।

সেই দিন রাত্রে খেতে বসে পার্বতীপতি বউকে বলল, 'এমন মূর্খ ছেলে জন্মানোর চেয়ে আমাদের কোনো ছেলে না হলেই ভালো হত। ছি। এ-রকম ছেলে থাকলে অপমানের বোঝাই বাড়ে। কোনো দরকার ছিল না এ-রকম অপগণ্ড, এ-রকম মূর্খ ছেলের।'

রামশাস্ত্রী আড়ি পেতে মা-বাবার কথা শুনে বড়ো দুঃখ পেল। সেই রাত্রেই রামশাস্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা করল যতদিন না পণ্ডিত হবে ততদিন সে বাড়ি ফিরে আসবে না।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেও কিছুতেই সে ভেবে পেল না কেমন করে পণ্ডিত হবে। শেষে ঠিক করল সরস্বতীর কৃপা প্রার্থনা করবে। তার কাছে বর পেতে হলে তপস্যা করতে হবে। তাই, রামশাস্ত্রী তপস্যায় বসল।

অনেকদিন পরে রামশাস্ত্রীর তপস্যা সার্থক হল। সরস্বতী দর্শন দিয়ে বললেন, 'বৎস, তুমি মহাপণ্ডিত হতে চাইছ? তুমি যদি এইরকম বোকা থাক তোমার ছেলে মহাপণ্ডিত হবে। আর তুমি যদি মহাপণ্ডিত হতে চাও তবে তোমার ছেলে হবে মূর্খ ও দুষ্ট। এই দুটোর মধ্যে তুমি কোন বর চাও?’

এই কথা শুনে রামশাস্ত্রী অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'মা, আমি মহাপণ্ডিত হতে চাই মা।'

'তথাস্তু।' বলে সরস্বতী অদৃশ্য হলেন।

সরস্বতীর বর পেয়ে রামশাস্ত্রী সমস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত হলেন। বাড়ি ফেরার পথে যত পণ্ডিতের সাথে তার দেখা হল প্রত্যেককে সে পাণ্ডিত্যে পরাজিত করল। মূর্খ ছেলে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে পণ্ডিত হয়ে ফেরাতে পাবর্তীপতি খুশি হল। নিজের জীবন সার্থক হয়েছে মনে করল পার্বতীপতি।

বাড়ি ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই রামশাস্ত্রীর বিয়ে হল। দু-বছর পরে রামশাস্ত্রীর একটা ছেলে হল। ছেলে যত বড়ো হতে লাগল সরস্বতীর কথা তত ফলতে লাগল। রামশাস্ত্রীর ছেলে যে গণ্ডমূর্খ ও দুষ্ট হবে তার লক্ষণ ফুটে উঠল। ছেলের জন্যে বার বার রামশাস্ত্রীকে অপমানিত হতে হত। তার বোকামি দুষ্টামির জন্য তাকে অনেক কথা শুনতে হত। ক্রমশ রামশাস্ত্রীর মনে নানা চিন্তাভাবনা বাড়তে লাগল। সে ভাবল তার ছেলেকে কী করে পণ্ডিত করে তুলবে। কারণ তার ছেলের মুখ হওয়ার জন্যে সেই তো দায়ী।

অনেক ভেবে রামশাস্ত্রী আবার সরস্বতীর তপস্যায় বসল। এবারের তপস্যার উদ্দেশ্য নিজে পণ্ডিত হওয়া নয়। ছেলে যাতে পণ্ডিত হয় তার জন্য বর প্রার্থনা করা। কিছুদিন পরে সরস্বতীর দর্শন পেয়ে বলল, “মা,

আমার ছেলে কি এইরকমই থাকবে?’

'তুমি যদি তোমার পুণ্য কাজ ও পাণ্ডিত্য ছেলের জন্য ত্যাগ করতে পার তাহলে তোমার ছেলে পণ্ডিত হয়ে উঠবে।' এ-কথা বলে সরস্বতী অদৃশ্য হলেন।

রামশাস্ত্রী তাই করল। তার ছেলে এক মহাপণ্ডিত হয়ে গেল। যশ পেল। পেল খ্যাতি।

রামশাস্ত্রী মূর্খ ও দুষ্ট হয়ে উঠল। তার সুনাম ক্ষুণ্ণ হল। সবাই তার নিন্দা করতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ, রামশাস্ত্রী স্বার্থপরের মতো কাজ করল না ত্যাগীর মতো? রামশাস্ত্রী নিজের ছেলেকে মহাপণ্ডিত হিসেবে দেখার জন্য আগে থেকে নিজে মুখ থাকলেই পারত। জেনে-শুনে নিজে পণ্ডিত হল। ছেলেকে মূর্খ ও দুষ্টু করে রাখল কিছুদিন। তারপর সরস্বতীর কাছে বর চেয়ে নিজে মূর্খ হল আর ছেলেকে পণ্ডিত করল। এই ধরনের পরস্পর বিরোধী কাজ রামশাস্ত্রী করল কেন? আমার প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই কথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, ‘রামশাস্ত্রী নিজের পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করল নিজে মহাপণ্ডিত হয়ে। আবার নিজের পুত্রের প্রতি কর্তব্য পালন করল নিজে মূর্খ হয়ে। এরজন্য তাকে যথেষ্ট নিন্দা ও অপযশের ভাগী হতে হয়েছিল। আপত দৃষ্টিতে দেখলে তার চরিত্রের মধ্যে এই পরস্পর বিরোধী গুণ ছিল। এইভাবে রামশাস্ত্রী নিজের পুত্রধর্ম ও পিতৃধর্ম পালন করল। অর্থাৎ নিজের পিতার প্রতি এবং পুত্রের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করল। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই।'

বিক্রমাদিত্যের মুখ খোলার সাথে সাথে বেতাল শবসহ উধাও হয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

১০. গরিবের দম্ভ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতো নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, ‘রাজা, তোমার জিদ দেখে আমি খুশি হয়েছি কিন্তু জানো তো জিদ মাঝে মাঝে জীবন নিয়ে টানাটানি করে। কিংশুকের কাহিনি শুনিয়ে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করছি। শুনলে অবশ্য তোমার কষ্ট লাঘব হবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : মণিপুর রাজ্যে অত্যন্ত গরিব একটা লোক বাস করত। তার কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। ছিল না কোনো আপনজন। এই ধরনের লোক সাধারণত ভিক্ষে করে অথবা খেটে খুটে দিন আনে দিন খায়। কিন্তু কিংশুকের স্বভাব ছিল অদ্ভুত। সে খেটে রোজগার করত না আবার ভিক্ষেও করত না। কেউ তাকে ডেকে খাবার দিলে খেত। আর যেদিন কেউ খেতে দিত না সেদিন সে পুকুরের জল খেয়ে গাছের নীচে শুয়ে পড়ে থাকত।

তার কথা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। তার মেজাজের ব্যাপার নিয়ে অনেকে আলোচনা করত। অনেকে বলত, 'যে খেতে পায় না তার অত দেমাগ কীসের!’ যার দয়া হয় সে কিছু এনে তাকে খেতে দিত। সারাদিন কিংশুক ঘোরাঘুরি করত লোকালয়ে। খেতে পেলে খেত, না পেলে না। নিজে কোনোদিন কারো কাছে হাত পেতে চাইত না।

কিংশুকের কথা মণিপুরের রাজার কানেও গেল। রাজমহল থেকে রাজা বেরুলে তার অনুচররা তাকে দেখিয়ে বলল, 'মহারাজ, এই সেই দাম্ভিক ভিখিরি কিংশুক। রাজা মনে মনে ঠিক করল সময়মতো একবার লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় রাজা প্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছিল। রাজা দেখতে পেল উদ্যানের এক কোণে ভিখিরি কিংশুক শুয়ে ছিল। দেখে মনে হয় যেন সে দু-তিন দিন খেতে পায়নি। তার শরীরে যেন উঠার ক্ষমতাও নেই।

রাজা এক চাকরকে ডেকে বলল, 'ওই উদ্যানে যে লোকটা শুয়ে পড়ে আছে তাকে খাবার এবং দুধ দিয়ে এসো।'

চাকর এক থালায় খাবার আর এক গেলাসে দুধ নিয়ে গিয়ে কিংশুককে বলল, 'তুমি এই খাবার আর দুধ খেয়ে নাও।'

কিংশুকের পেটে প্রচণ্ড খিদে কিন্তু তার দেমাগ ঠিক আছে। সে খাবার দেখে মনে মনে খুশি হলেও দম্ভভরে চাকরকে জিজ্ঞেস করল, 'এই খাবার কে পাঠিয়েছেন?’

‘রাজা পাঠিয়েছেন?’ চাকর রাজপ্রাসাদের ছাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে জবাব দিল। কিংশুক মাথা তুলে রাজপ্রাসাদের ছাদের দিকে তাকাল। কিন্তু তখন সেখানে রাজাকে দেখতে পেল না।

ভেতরে ভেতরে খিদের জ্বালায় সে ছটফট করছিল। তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে খাবার এবং দুধ খেয়ে নিয়ে বলল, 'রাজাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবে।'

চাকর থালা আর গেলাস নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরতে ফিরতে বলল, 'কাল থেকে তোমাকে আর খিদের জ্বালা সহ্য করতে হবে না। তোমার উপর রাজার নজর পড়েছে। যখনই তোমার খিদে পাবে সোজা এখানে চলে আসবে। পেট ভরে খেতে পাবে।'

রাজার চাকর কিংশুককে ভিখিরি ভেবে নিয়েছিল। কথাটা শুনে কিংশুকের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিন্তু সে কোনো জবাব দিল না। এতদিন সে যত লোকের অতিথি হয়েছে তারা সব সাধারণ লোক। আজ

থেকে সে রাজার অতিথি।

পরের দিন কিংশুক সারা শহরে পাগলা কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাকে সেদিন কেউ ডেকে খেতে দিল না। তৃতীয় দিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত। ঘুরে দেখল কেউ তাকে খেতে ডাকছে না। অগত্যা সে আবার সেই রাজার উদ্যানে গিয়ে গাছের নীচে শুয়ে পড়ল।

সেদিন সন্ধ্যায়ও রাজার চাকর খাবার, মাংস, ফল, ক্ষীর এনে কিংশুকের সামনে রেখে তাকে বলল, 'তোমাকে তো আমি বলেছিলাম তুমি এখানে প্রত্যেক দিন ভালো ভালো খাবার পাবে। তবু তুমি এলে না কেন? কোথায় ছিল এ দু-দিন?'

'এই বাগানে শুতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই বলে খিদে পেলেই যে আমি এই বাগানে আসি তা নয়। আবার যখন-তখন আসলে রাজা হয়তো ভাববেন আমি এখানে খাবার লোভেই আসি।' কিংশুক বলল।

তারপর সমস্ত খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে সেখান থেকে সে চলে গেল। আবার পর পর সাত দিন ধরে তার আর কোনো পাত্তা নেই।

সাত দিন পরে রাজা কিংশুককে দেখে অবাক হয়ে গেল। বাগানে তার হাঁটা দেখে রাজার মনে হল যেন কঙ্কাল চলেছে। রাজা ডেকে পাঠাল। নিজের চাকরকে। নিজে যে খাবার খায় সেই খাবার তাকে দিয়ে আসতে বলল রাজা। দূর থেকে খাবারের সুগন্ধ পেয়ে কিংশুক মনে মনে খুশি হল। ঢাকনা খুলে দেখে তাতে রাবড়ি মালাই প্রভৃতি দামি খাবার রয়েছে।
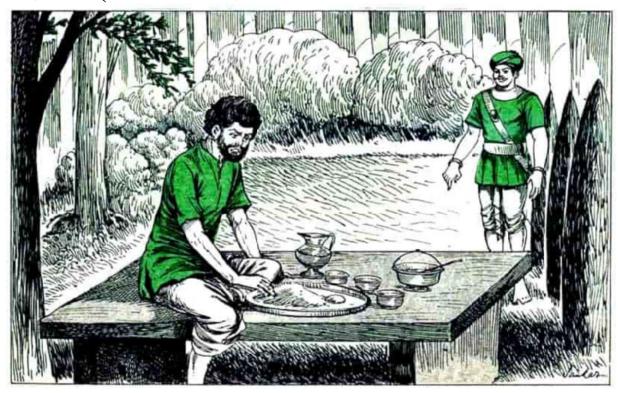
সেই খাবার খেয়ে কিংশুক সেই যে গেল আর দশ দিনের মধ্যে সে ওই মুখো হল না। রাজার মনে আশঙ্কা জাগল কিংশুক মারা গেছে কি না। রাজা অনুচরদের পাঠাল তার খোঁজ করতে।

মৃত্যুপথযাত্রী কিংশুককে অনুচরেরা ধরে এনে রাজার সামনে হাজির করল। তার অবস্থা দেখে কারও চোখে পলক পড়ল না।

তার অবস্থা দেখে রাজার চোখ জলে ভরে গেল। রাজা বলল, 'কিংশুক আমাকে ক্ষমা কর।'

'মহারাজ, দোষ তো আমার। আপনার কোনো দোষ নেই।' কথাটা শেষ হতেই কিংশুকের ঘাড় কাত হয়ে গেল। সে মারা গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'মহারাজ, কিংশুক রাজার সুস্বাদু খাবার খেয়েও মরতে বসল কেন? কিংশুকই বা বলল কেন যে দোষ তার নিজের? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও উত্তর না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে কিংশুক আগে যা পেত তাই খেত। তাতে তার কোনো অসুবিধা হত না। কিন্তু রাজার দেওয়া খাবার খাওয়ার পর থেকে সে অন্যের দেওয়া খাবার খেতে পারত না। তাই সে দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে যেতে লাগল। রাজা কিংশুককে খেতে দিয়েছিল পরীক্ষা করতে। তার প্রতি দয়া দেখানোর জন্য নয়। রাজা ভেবেছিল কিংশুক তার খাবারের লোভে প্রত্যেক দিন তার উদ্যানে আসবে। ফলে তার অহংকার বা দম্ভ চূর্ণ হবে। প্রথম প্রথম মনে হল রাজার পরিকল্পনা সফল হতে চলেছে। কারণ কিংশুক দু-বার শুধু খাবার লোভেই উদ্যানে গিয়েছিল। কিন্তু যখন সে টের পেল যে তার দম্ভের খুঁটি নড়ে যাচ্ছে তখন সে দম্ভ ঠিক রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হল। ফলে মৃত্যুর দিকে ছুটে গেল। রাজা ভাবতেই পারেনি যে সে নিজের জীবন নিয়ে এভাবে খেলা করবে। কিংশুকের মৃত্যুর কারণ রাজার পরীক্ষা। এই কথা বুঝে রাজা তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। আবার কিংশুক নিজের দোষ স্বীকার করার কারণ সেও ভেবেছিল যে পর পর দু-বার রাজা দয়া করেছেন ভেবে উদ্যানে না এলে সে বেঁচে থাকতে পারত। আসাটাই তার অন্যায় হয়েছে। রাজার মতলব বুঝতে না পারা তার ভুল হয়েছে। রাজা যে তার দম্ভ চূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছে এটা বুঝতে না পারাটাই কিংশুকের মস্তবড়ো দোষ হয়েছে।'

রাজার এইভাবে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শবের সাথে হাওয়া হয়ে গেল। ঝুলে পড়ল আবার সেই গাছে।

১১. পরিবর্তন

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ওই গাছের কাছে ফিরে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে চুপচাপ শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, আমি জানি না কীসের আশায় এই মাঝ রাতে তুমি এত পরিশ্রম করছ। এই পৃথিবীতে কিন্তু বিনা কারণেই বন্ধু শত্রু হয়ে যায় আবার শত্রু বন্ধু হয়। আমার বক্তব্য বুঝতে পারবে একটি কাহিনি শুনে। গল্প শুনলে তোমার পরিশ্রমও কমতে পারে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : বিক্রমপুরের রাজা বিক্রমবর্মা শাসন কাজে খুব দক্ষ ছিল। প্রজাদের সুখ-সুবিধের দিকে খুব নজর ছিল তার। ফলে তার উপর প্রজাদের ছিল অগাধ বিশ্বাস। রাজার আদেশে, এমনকী, তারা আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত ছিল।

রাজা বিক্রমবর্মার এই সুখ্যাতি পাশের দেশের রাজা দেবরাজের কাছে অসহ্য ছিল। দেবরাজের প্রজারা তার উপর রেগে ছিল। তারা বিক্রমবর্মাকে প্রশংসা করত। কারণ তারা দেবরাজের অত্যাচারের জ্বালায় জর্জরিত ছিল। দেবরাজ যুদ্ধ করে বিক্রমবর্মাকে হারাতে পারে না। বিক্রমপুরে যতদিন না অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ছে ততদিন সে বিক্রমবর্মাকে পরাস্ত করতে পারে না।

অনেক ভেবে দেবরাজ একটা চক্রান্ত করল। দেবরাজ এবং বিক্রমবর্মার রাজ্যের মাঝে অনেক ঘন বন ছিল। সেই বনে ছিল অনেক উপজাতি। তারা থাকত ছোটো ছোটো দলে। অনেকগুলো অঞ্চলে ভাগ হয়ে থাকত তারা। তারা শান্তিতে নিজেরা নিজেদের মতো বাস করত। একদিন দেবরাজ গোপনে বনের উপজাতির দলের নেতাদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের বলল, 'তোমরা যেভাবে আছ তা দেখে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। বনের জানোয়ারও এত কষ্টে থাকে না। বিক্রমপুর স্বর্গের মতো একটা দেশ। তোমরা সবাই জোট বেঁধে ঢুকতে পার না বিক্রমপুর রাজ্যে ? তোমাদের বাধা দেবার ক্ষমতা আছে ওই বিক্রমবর্মার? ওর শক্তি কতটুকু! তোমরা ইচ্ছে করলে হেলায় বিক্রমপুর থেকে ধনসম্পত্তি লুঠ করে আনতে পার। বিক্রমপুরের সেনারা যদি তেমন আক্রমণ করতে আসে, তোমাদের ভয় কী? তোমরা চলে আসবে আমার রাজ্যে। আমি তোমাদের আশ্রয় দেব। আর দেরি নয়। এবার তোমরা যাও। আক্রমণ কর বিক্রমপুর। খেয়ে-পরে আনন্দে থাক। মানুষের মতো বাঁচতে শেখ।'

দেবরাজের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে বনের বাসিন্দারা বিরাট বাহিনী গঠন করে বিক্রমপুর আক্রমণ ও লুঠ করতে লাগল।

বিক্রমবর্মা তার দেশের উপর আক্রমণ যে পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে তা লক্ষ করল। লুণ্ঠনকারীদের ধরার ভার দিল প্রজাদের উপর। জনতা লুণ্ঠনকারীদের ধরার উদ্যোগ নিল। রাতদিন পাহারা দিতে লাগল। বহু লুণ্ঠনকারীকে ধরল। জনতা যাদের ধরল বিক্রমবর্মা তাদের দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে ফাঁসি দিল।

তারপর রাজা বিক্রমবর্মা বনের ওই অধিবাসীদের কাছে খবর পাঠাল, 'আমি তোমাদের স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করিনি, করব না। তোমরা ইচ্ছে করলে আমার রাজ্যে এসে বাস করতে পার। কিন্তু যদি চুরি করতে আসো তাহলে ফাঁসি দেব।'

যে লুণ্ঠন শুরু হয়েছিল তা ঘোষণার পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। দেবরাজ আশা করেছিল বিক্রমপুরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। বনের অধিবাসীরা বিক্রমবর্মার ঘোষণা সঠিক বলে গ্রহণ করল।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন অন্য কথা মনে মনে ভেবে রাখল। তার নাম ভীম। বিক্রমপুরের কাছাকাছি একটা বনে ভীম আর তার দাদা রাম বাস করত। রাম বনের আর দশজন অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে ওদের মতোই কাজ করে জীবনযাপন করত। ভীম কাঠ কাটত আর সেই কাঠ বিক্রমপুরে বিক্রি করে

পয়সাকড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরত। ফলে শহরের জীবনের সাথে সে ভালোভাবেই পরিচিত ছিল। শহরের বেশ কিছু লোকের সাথে তার চেনাজানা এমনকী বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছিল। বিক্রমপুরে যারা লুণ্ঠন করতে গিয়েছিল তাদের দলে ছিল রাম। অন্যদের মতো সে-ও ধরা পড়েছিল। ফলে তার ফাঁসি হল। ভীমের কাছে ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ লাগল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যে রাজা তাকে ফাঁসি দিয়েছে তাকে বধ করে তার দাদার আত্মাকে শান্তি দেবে।

প্রতিবেশী রাজা দেবরাজও বিক্রমবর্মাকে শেষ করে ফেলবে ঠিক করল। সে বুঝতে পারল যে কোনোক্রমে বিক্রমবর্মার রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তারপর সে একটা ছোটো সেনাবাহিনীকে বিক্রমবর্মা যে বনে শিকার করে সেই বনে পাঠিয়ে দিল। সৈনিকদের কাজ হবে বিক্রমবর্মার অপেক্ষায় ওত পেতে বসে থাকা। একদিন বিক্রমবর্মা সদলে শিকার করতে ওই বনে এল। দেরবারজের সেনারা বিক্রমবর্মার দলের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। ওই সেনাদের নেতা বিক্রমবর্মাকে আক্রমণ করল। উভয় পক্ষের তরবারি যুদ্ধ হল অনেকক্ষণ।

বিক্রমবর্মার শিকার করতে বনে আসার খবর ভীমও পেয়েছিল। সে-ও তির-ধনুক নিয়ে বনের ওই জায়গায় পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে বিক্রমবর্মা তরবারি যুদ্ধে মেতে রয়েছে। তখন সেই যুদ্ধ কিছুক্ষণ দেখে বিক্রমবর্মার দিকে তাক করে ভীম তির ছুঁড়ল। কিন্তু সেই তির লাগল গিয়ে বিক্রমবর্মার সঙ্গে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীর নেতার গায়ে। সে তক্ষুনি মারা গেল। নেতার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে দেবরাজের সেনারা ছুটে পালাল।

বিক্রমবর্মা ভাবল ভীম সেনা-নেতাকে তাক করেই তির ছুঁড়েছে। তাই সে ভীমের কাছে তার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাল। ভীমকে নিজের সঙ্গে রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে নিজের দেহরক্ষক করে নিল। ভীম মনে মনে ভাবল দেহরক্ষকের চাকরি নিলে ভালোই হবে। বিক্রমবর্মাকে বধ করা খুব সহজ হবে। এ-কথা ভেবে ভীম দেহরক্ষকের চাকরি নিল। দেবরাজ যখন দেখল যে তার দ্বিতীয় চালও খাটল না তখন সে আর একটা চক্রান্ত করল। সে বিক্রমবর্মার সেনাপতির কাছে গোপনে দূত পাঠাল। দূত ওই সেনাপতিকে বলল, 'আপনি বিক্রমবর্মাকে বধ করলে আপনাকে বিক্রমপুরের রাজ সিংহাসনে বসাব। বিক্রমবর্মার মারা যাওয়ার পর যদি দেশবাসী বিদ্রোহ করে তখন সেই বিদ্রোহ আপনার এবং আমার সেনারা একযোগে দমন করবে। আপনাকে সিংহাসনে বসানোর পর দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।'

রাজা হওয়ার লোভ পেয়ে বসল বিক্রমবর্মার সেনাপতির। দেবরাজের টোপ সে চমকার খেল। ঠিক করল নিজের রাজাকে বধ করবে। একদিন রাত্রে রাজার শোওয়ার ঘরে সেনাপতি গিয়ে জরুরি কথা সারতে চাইল। রাজা সরল বিশ্বাসে সেনাপতির সাথে কথা বলতে বসল।

ভীমও বিক্রমবর্মাকে বধ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিছুতেই ঠিক সুযোগ পাচ্ছিল না। শেষে সে ঠিক করল শোওয়ার ঘরেই রাজাকে হত্যা করবে। তক্কে তক্কে ছিল ভীম। সেনাপতির রাজার শোওয়ার ঘরে ঢুকে বেরুতে দেরি হচ্ছে দেখে ভীমও পা টিপে টিপে ঢুকল। একবার রাজাকে যে লোকটা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তার অঙ্গরক্ষকের পদ পেয়েছে তাকে আটকাতে সাহস করেনি ওই ঘরের পাহারাদার।

বিক্রমবর্মার শোওয়ার ঘরে ঢুকেই ভীম চমকে উঠল। সে দেখতে পেল রাজা সেনাপতির হাত শক্ত করে ধরে রয়েছে। সেনাপতির হাতে মস্তবড়ো ছোরা। সেটাকেই সুবর্ণ সুযোগ ভেবে ভীম তরবারি ছুঁড়ে দিল রাজার দিকে। কিন্তু তরবারি সোজা বিঁধল গিয়ে সেনাপতির বুকে।

রাজা ভীমকে আন্তরিকভাবে প্রশংসা করল। পরের দিন তাকে নতুন সেনাপতির পদে নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করল।

এই ঘটনার পর ভাইকে ফাঁসি দেওয়ার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে ভীমের মন থেকে একেবারে লোপ পেল। ক্রমে ভীম রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসী ভক্তে রূপান্তরিত হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, ভীম প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা কেন পালন করল না? কারণটা কি এই যে রাজা তাকে উচ্চ পদে বসিয়েছিল? নাকি রাজার প্রতি ঈশ্বরের অপার করুণা ছিল। এই প্রশ্নের সমাধান জানা সত্ত্বেও না বললে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, 'ভীমের মনে পরির্তন আসার কারণ এগুলো নয়। আস্তে আস্তে ভীম বুঝেছিল তার দাদা রামকে ফাঁসি দেওয়ার রাজার ইচ্ছে ছিল না। রাজার একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাজত্ব রক্ষা করা। এমনকী বনের অধিবাসীরাও বলেনি যে রাজা ফাঁসি দিয়ে অন্যায় কাজ করেছে। অতএব, মানতেই হবে যে রাজার কাজের প্রতি কারও মনে অবিশ্বাস জাগেনি। ভীমের মনেও সেই বিশ্বাসই দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

রাজার এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ঝুলে পড়ল ওই গাছে।

১২. ঘুমন্ত রাক্ষস

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য আবার ওই গাছের কাছে ফিরে এলেন। কাঁধে তুলে নিলেন শব। নীরবে এগিয়ে গেলেন শ্মশানের দিকে। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, ‘রাজা যে লোকটা তোমাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে সে তোমার প্রশংসা করবে কি নিন্দা করবে তা বোধ হয় তুমি অনুমান করতে পারছ না। সাধারণ লোকের নিজস্ব কোনো মতামত থাকে না। আমার কথার প্রমাণ শঙ্কুর একটি কাহিনির মাধ্যমে দিচ্ছি। নিজের পরিশ্রম অনেকখানি কমে যাবে এই গল্প শুনলে।

বেতাল বলতে লাগল : হাজার বছর আগে গোদাবরীর তীরে একটি পাহাড়ি অঞ্চলে এক রাক্ষসী থাকত। তার শঙ্কু নামে এক ছেলে ছিল। তার বড়ো হওয়ার পর তার মা বলল, 'বাবা, আমি সারাটা জীবন এই বনে কাটিয়েছি। লোকে আমার কোনো ক্ষতি করেনি আর আমিও লোকের কোনো ক্ষতি করিনি। আমার বয়স হয়েছে। আমি এবার তপস্যা করে শিবের মধ্যে লীন হয়ে যাব। তুমি একা বনে থেকে জীবন কাটাতে পারবে না। তাই তুমি বরং মানুষের সমাজে যাও। তাদের ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে অথবা তাদের কাছে নত হয়ে জীবন কাটাও।

তার মার তপস্যা করতে যাওয়ার পর শঙ্কু বন থেকে বেরিয়ে এক পাহাড়ে উঠে অদূরের গ্রামের দিকে তাকাল। অনেক মানুষ সে দেখতে পেল। তার মার কথা মনে পড়ল। মানুষের মধ্যে থেকে জীবনযাপনের কথা। সে ভাবল মানুষের সাথে মেশার ব্যাপারটা পরে হবে। আগে বিশ্রাম করে নি। তারপরে সে এক গুহার ভিতর ঢুকল। সেখানে ঠান্ডা হাওয়া বইছিল। শঙ্কু সেখানেই পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

শঙ্কু পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে বিচিত্র ঢং-এ যখন নগরের দিকে তাকাচ্ছিল তখন কিছু লোক তাকে দেখতে পেল। দেখেই ‘ওরে বাবারে, রাক্ষস!' বলে চিৎকার করে ছোটাছুটি করতে লাগল। ওরা চারিদিকে দৌড়ে গিয়ে খবর দিয়ে এল। ওদের কথা শুনে বহু লোক দূর থেকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ানো রাক্ষসকে দেখল।

সবাই ভাবল রাক্ষসটা একদিন ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। সবার ঘার মটকাবে। বহু লোককে সাবাড় করে ফেলবে। মাস ছয়েকের মধ্যে নগরে আর লোকজন কেউ থাকবে না। নগরের রাজা সবাইকে বল্লম ও তরবারি দেবেন কথা দিলেন। পাহাড় থেকে নাবার সাথে সাথে রাক্ষসটাকে হত্যা করার জন্য নানা ধরনের পন্থা লোকে ভেবে রাখল।

শুধু তাই নয়, সেদিন রাতে কেউ ঘুমোল না। ভয়ে ভয়ে কেউ ঘরে আলোও জ্বালালো না। বহু লোক সারারাত ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

কিন্তু রাক্ষস নগরে এল না। দিনের পর দিন যায় কিন্তু রাক্ষসের আর কোনো পাত্তা নেই। লোকের ভয়ও কেটে যেতে থাকে। কিছু লোকের ধারণা হল রাক্ষস অন্য কোথাও চলে গেছে। যারা সাহসী তারা খেতের কাজকর্ম করতে লাগল।

তারপর বহুদিন কেটে গেল কিন্তু রাক্ষসের পাত্তা নেই। কয়েক জন সাহসী যুবক, কুড়ুল, বল্লম তরবারি নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। ওরা সেখানে একটা গুহা দেখতে পেল। সেই গুহার ভিতর থেকে ভয়ংকর একটা শব্দ ভেসে আসছিল। মুহূর্তে এই খবর দাবানলের মতো গোটা নগরে ছড়িয়ে পড়ল।

পণ্ডিতরা বললেন, 'রাক্ষসদের শক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক বেড়ে যায় তার ঘুম ভাঙার সাথে সাথে তাকে কেউ হারাতে পারে না।' এ-কথা শুনে লোকের ভয় আরও বেড়ে গেল।

রাজা মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, 'খবর পেয়েছি রাক্ষস গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। তাই ঘুমন্ত অবস্থাতেই রাক্ষসটাকে মারা হবে কি না ভেবে দেখতে হবে। কারণ পণ্ডিতরা বলেছেন যে জাগার পর রাক্ষসের শরীরে ভীষণ শক্তি থাকে।'

কয়েক জন মন্ত্রী বলল, রাক্ষসকে বাঁচিয়ে না রেখে সুযোগ পাওয়া মাত্র তাকে মেরে ফেলা উচিত।

কিন্তু এই পরামর্শ প্রধান মন্ত্রীর ভালো লাগল না। তিনি বললেন, 'মহারাজ, আমরা সিংহ, বাঘ, মত্ত হাতি প্রভৃতিকে পুষে থাকি। ওরা ভীষণ হিংস্র জানোয়ার। আমরা ইচ্ছে করলে তো রাক্ষসকে পুষতে পারি। রাক্ষস খুব জোর এক-শো-টা মানুষের খাবার খায়। কিন্তু একটা রাক্ষস হাজারটা সৈনিকের সমান। রাক্ষস শুধু খেতে

জানে। সে ধোকা দিতে জানে না। চক্রান্ত কীভাবে করতে হয় তা-ও সে জানে না। তাকে ঠিকমতো পুষতে পারলে সে মানুষের চেয়ে বেশি বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। তাই তাকে ঘুম থেকে জেগে উঠতে দিন, আস্তে আস্তে তাকে পোষ মানান। তারপর দেখবেন আমাদের শত্রু-ভয় বলতে আর কিছু থাকবে না। আমরা তাকে পুষে তার কাছ থেকে অনেক কাজ আদায় করতে পারব। ফলে আমাদের ভালোই হবে।

এই প্রস্তাব রাজা ও অন্য মন্ত্রীদের কাছে ভালোই লাগল। মুখে মুখে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল। লোকেও রাক্ষসকে মারার পরিবর্তে তাকে পোষার কথা ভাবতে লাগল। পরে সে দেশে আকাল দেখা দিল।

'রাক্ষস পাহাড় থেকে নামে না কেন? সে তো নদীর পথ পরিবর্তন করতে পারে। এদিকে জল এলে চাষ-আবাদ হবে। ইচ্ছে করলে পাতালের জলও সে এনে দিতে পারে। আমাদের কপালে শুধু নামেই একটা রাক্ষস আছে, কোনো কম্মের নয়।'

এই সব নানা কথা নগরের বুড়োরা বলাবলি করতে লাগল।

আকালের ফলে চোর ডাকাতের সংখ্যা বেড়ে গেল। প্রত্যেক দিন রাত্রে শয়ে শয়ে চোর ডাকাত যারা তাদের বাধা দিতে এগুতো তাদের প্রাণে মেরে ফেলত, এবং তরিতরকারি যা পেত তাই নিয়ে পালাত।

বুড়োরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল, ঠিক এই সময় রাক্ষসটাকে আনতে পারলে কাজের কাজ হত। যাদের সাহস আছে তারা সব জোট বেঁধে রাক্ষসটাকে জাগিয়ে নিয়ে এসো।'

ঘুমন্ত রাক্ষসকে জাগানো খুব বিপদের ব্যাপার। ঘুম ঘুম চোখে কী শুনবে, কী বুঝবে তারপর হয়তো যাকে সামনে পাবে তাকেই সাবাড় করে ফেলবে।' যুবকেরা ভয় পেয়ে বলল।

এর এক বছর পরে শত্রুপক্ষের রাজা ওই নগর আক্রমণ করল। এখন আর অপেক্ষা করা চলে না ভেবে কিছু যুবককে সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি পাহাড়ের উপর উঠে গেল। রাক্ষস যে গুহায় ছিল সেই গুহার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল। কিন্তু গুহার ভিতরে রাক্ষস ছিল না। কবে কোথায় সে। চলে গেছে। শত্রুরাজা ওই দেশ দখল করে নিল। দেশের লোক মনে মনে রাক্ষসকে গালাগাল দিতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, নগরবাসী প্রথমে রাক্ষস দেখে ভয় পেল। তারপর তাকে পাবার জন্য হাঁকপাঁক করতে লাগল। তাকে না পেয়ে গালাগাল দিতে লাগল। তাহলে রাক্ষসটার ব্যাপারে লোকের মত আসলে কোনটা ? লোকে কি তাকে ভালোবাসত না ঘৃণা করত? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথায় বিক্রমাদিত্য জবাব দিলেন, 'জনতা ও রাক্ষসের মধ্যে ভালোবাসার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। জনতার চোখে রাক্ষস একটা বিরাট শক্তিশালী জীব। প্রচণ্ড শক্তিধরকে কেউ ভালোবাসে না। যখন বুঝবে যে তার কাছ থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে তখনই তারা তাকে দেখে ভীষণ ভয় পায়। আবার যখন বোঝে যে তার মাধ্যমে কোনো উপকারের আশা আছে তখনই তারা লোভে পড়ে যায়। ঠিক সময়ে যখন কোনো উপকার পায় না তখন তার নিন্দা করে।'

রাজার এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ হবার সাথে সাথে বেতাল শব নিয়ে কেটে পড়ে আবার সেই গাছে উঠে পড়ল।

১৩. জনতার শক্তি

বিক্রমাদিত্য ফিরে এলেন সেই গাছের কাছে। গাছে উঠে একটি শব কাঁধে নিয়ে গাছ থেকে নেমে নীরবে পথ চলতে লাগলেন।

ওই সময় বেতাল বলল, 'রাজা তোমার উদ্যমের প্রশংসা করছি কিন্তু আবার এও দেখা যায় যে চেষ্টা করে যে কাজ হয় না ভাগ্যের জোরে তা অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। কেকয়ের রাজা উপাহার বর্মার কাহিনি শুনলে আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ পাবে। শুনলে তোমার পরিশ্রমও কিছুটা লাঘব হবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীনকালে কেকয় দেশ শাসন করতেন রাজা উপাহার বর্মা। তিনি খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তার সেনাবাহিনী ছিল বিরাট। আবার ধনসম্পত্তিও ছিল অগাধ। তাই, পাশের দেশের রাজা তার দেশের দিকে তাকাতেও ভয় পেতেন। কেকয় দেশের অধিবাসীরা এমন রাজাকে পেয়ে গর্ব বোধ করত।

রাজা উপাহার বর্মার শত্রু ভয় বলে কিছু ছিল না। কোনো কিছুই তিনি পরোয়া করতেন না।

একবার কেকয় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু প্রজা কিছুটা অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। উপাহার বর্মা ওই অরাজকতা দমন না করে ঘোষণা করলেন যে যদি ওরা রাজদ্রোহী হয় তাহলে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

কিছুদিন পরে রাজা খবর পেলেন যে যারা অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল তারা সব দল বেঁধে রাজধানী দখল করতে আসছে। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই তাদের উদ্দেশ্য। তিনি ভাবলেন আসুক বিদ্রোহীরা আমার সেনাবাহিনী তাদের এক ফুকারে উড়িয়ে দেবে।

কিন্তু কার্যত তা হল না। বিদ্রোহীদের আক্রমণের তোড়ে রাজার সেনাবাহিনীই উড়ে গেল। রাজার বহু সৈন্য বিদ্রোহীদের হাতে মারা গেল। কিছু সৈন্য বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিল। তারপর বিদ্রোহীদের নেতা রাজধানীতে ঢুকল।

নিরুপায় হয়ে রাজা উপাহার বর্মা কিছু ধনসম্পত্তি ও বিশ্বাসী অনুচরদের নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে গা-ঢাকা দিলেন। পরক্ষণেই বিদ্রোহীদের নেতা সিংহাসন দখল করে রাজা হয়ে বসল।

বিদ্রোহীরা যখন উৎসব করছিল তখন রাজা গোপন পথে চন্দ্রভাগা নদী পেরিয়ে মদ্রদেশের রাজার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইলেন।

মদ্রদেশের রাজার সঙ্গে উপাহার বর্মার আগেই বন্ধুত্ব ছিল। তাই মদ্ররাজ বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই থাকবেন এখানে। আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? জয়-পরাজয় তো ভাগ্যের খেলা। আপনি আমার সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে পারেন।'

বন্ধুর কথা শুনে উপহার বর্মার আত্মবিশ্বাস বাড়ল। তার ধারণা হল তিনি এইভাবে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে পারবেন। এসব ভেবে মদ্রদেশের সেনা নিয়ে নিজের দেশের বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন।

কিন্তু যুদ্ধ চন্দ্রভাগা নদীর তীরেই সমাপ্ত হল। উপাহার বর্মা এগোতে পারলেন না। সেই যুদ্ধে এমনকী নিজের ঘোড়াও হারিয়ে কোনোরকমে বন পথে প্রাণ বাঁচিয়ে পালালেন।

উপাহার বর্মার হাতে আর কিছুই রইল না। কানাকড়িও তার হাতে ছিল না । বহুদিন পায়ে হেঁটে ব্রহ্মবর্তে পৌছোলেন। ব্রহ্মবর্ত ছিল তখনকার দিনে একটা ছোট্ট রাজ্য। উপাহার বর্মার তুলনায় সে দেশের রাজ্য ছিল নগণ্য। তা সত্ত্বেও উপাহার বর্মা সেই দেশের রাজার কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বললেন,

'মহারাজ, আমি অনেক বড়ো বড়ো সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছি। আমাকে আপনার বাহিনী চালনা করার অধিকার দিন, আমাকে আপনার সেনাপতি করে নিন।'

ব্রহ্মবর্তের রাজা আপত্তি করলেন না। উপাহার বর্মাকে নিজের বাহিনীর সেনাপতি করে নিলেন।

কিছুদিন পরে সিন্ধুদেশের সেনাবাহিনী যৈত্রযাত্রা করতে যাওয়ার পথে ব্রহ্মদেশের গ্রামে লুণ্ঠন করল। এতে রাজা ব্রহ্মদত্ত রেগে গিয়ে বললেন উপাহার বর্মাকে, 'আমরা সিন্ধু দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'

তার কথা শুনে উপাহার বর্মা অবাক হলেন। বুঝলেন অত বড়ো বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া যাবে না। অতএব তাঁর জীবনে আর একটা পরাজয় অপেক্ষা করছে।

রাজা ব্রহ্মদত্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করলেন। নিজে সেনা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হল।

সিন্ধু দেশের সেনাবাহিনী স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তাদের উপর হঠাৎ কেউ আক্রমণ করতে সাহস পাবে। আর এরকম ভয়ংকর আক্রমণ করবে। ব্রহ্মদত্তের সেনাবাহিনী চটপট সিন্ধুসেনাদের তাবুতে আগুন ধরিয়ে দিল। যারা পালাতে গেল তাদের ধরে মেরে ফেলল। আর যারা ধরা দিল তাদের বন্দি করে রাখল। সিন্ধুদেশের সেনাবাহিনীর যৈত্রযাত্রা মারাত্মক পরিণতির মাধ্যমে ব্রহ্মদেশেই সমাপ্ত হল।

বিজয়ী রাজা ব্রহ্মদত্তের সানন্দে বিজয় গৌরবে ফেরার সময় উপাহার বর্মা জিজ্ঞাসা করলে, 'মহারাজ, আমাদের এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আপনি কীভাবে বিজয়ী হতে পারলেন? আমার কাছে বিষয়টি রীতিমতো বিস্ময়ের। আজ আপনার কাছে আত্মপরিচয় দিচ্ছি। আমি কেকয় দেশের রাজা উপাহার বর্মা।

সামান্য সংখ্যক সেনার কাছে আমার বিরাট সংখ্যক সেনা পরাজিত হয়েছিল। আমাকে সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে।'

এ-কথা শুনে রাজা ব্রহ্মদত্ত বললেন, 'যুদ্ধ শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। সেনাদের জয়ী হওয়ার মনোবলের উপরই নির্ভর করে।'

নিজের পরিচয় জানানোর পর উপাহার বর্মার আর ব্রহ্মদত্তের কাছে থাকতে ইচ্ছা করল না। তার মন দেশের দিকে টানল। তিনি চললেন দেশের দিকে। চন্দ্রভাগা নদী পেরিয়ে মাটিতে পা রাখতে না রাখতেই সৈন্যরা তার পথ আগলে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'তোমরা আমার পরিচয় জানতে চাইছ কেন ভাই? উপাহার বর্মা বললেন।

'আমাদের রাজা আগন্তুকদের উপর কড়া নজর রাখতে বলেছেন।' একজন সৈনিক জবাব দিল।

'তোমাদের রাজা নবাগতকে এত ভয় করেন কেন? উপাহার বর্মা জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের রাজা কপাল জোরে এই রাজ্য পেয়েছেন। আমাদের আগেকার রাজা উপাহার বর্মাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ইনি রাজা হয়েছেন। তাই এই রাজার ধারণা যেকোনো সময়ে সেই রাজা এসে হঠাৎ আক্রমণ করবেন। সিংহাসন কেড়ে নেবেন।' সৈনিক বলল।

উপাহার বর্মা ভেবে পেলেন না এখনও সেই জবরদখলি রাজা তাঁকে এত ভয় করে কেন!

কিছুক্ষণ ভেবে তিনি ওই সেনাদের কাছে বললেন, 'আমি সেই রাজা উপাহার বর্মা। তোমাদের রাজা তো আমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, আর আমাকে ভয় পাবার কি আছে। আমার তো আর কিছুই নেই। ব্যাপারটা আমার কাছে আজব ঠেকছে।'

হঠাৎ সেনারা তাঁর পায়ে পড়ে প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, আমরা আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনি তাড়াতাড়ি আমাদের দেশে ফিরে আসুন। তা না হলে আমরা ধনে-প্রাণে মারা যাব।'

'আমি বেঁচে থেকেও মরার মতো আছি। হারানোর জন্য আমার কাছে বাকি আছে। শুধু নিজের প্রাণ। আমি মরি তো নিজের দেশে মরব। বাঁচি তো নিজের দেশে।' উপাহার বর্মা বলল।

তারপর সেনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করল। তাদের মধ্যে একজন সৈনিক নিজের পোশাক পরিয়ে নিজেদের শিবিরে নিয়ে গেল উপাহার বর্মাকে।

উপাহার বর্মার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিতে প্রস্তুত এমন বহু লোককে পাওয়া গেল। গোপনে গোপনে প্রচার হয়ে গেল যে রাজা উপাহার বর্মা ফিরে এসেছেন।

দেখতে দেখতে সংগঠন গড়ে উঠল। গোপন সংগঠন। ওই রাজাকে রাজপ্রাসাদের মধ্যেই একটা ছোট্ট দল অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করল। পরক্ষণেই ওই রাজার যারা ঘোর সমর্থক তাদের কারাগারে পুরে দেওয়া হল।

পরের দিন ঘটা করে উপাহার বর্মাকে সিংহাসনে বসানো হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, বিদ্রোহী-রাজা উপাহার বর্মাকে এত ভয় করত কেন? উপাহার বর্মা নিজের অত সৈন্য থাকা সত্ত্বেও কেন পরাজিত হলেন আর শেষে নিজের যখন কোনো কিছুই ছিল না তখন কী করে সিংহাসন ফিরে পেলেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা এখনই ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথা শুনে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'পরাজিত হওয়ার পরেও দেশবাসীর দরদ ও সহানুভূতি হয়তো উপাহার বর্মার প্রতি ছিল। এরজন্য বিদ্রোহী রাজার কুশাসনও দায়ী হতে পারে। যাই হোক না কেন বিদ্রোহী রাজা বুঝতে পেরেছিল যে দেশবাসীর মধ্যে বহু লোক রাজা উপাহার বর্মাকেই মনে মনে চায়। জনতার শক্তি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে না পেরে দু-দু-বার রাজা উপাহার বর্মা পরাজিত হলেন। কিন্তু তৃতীয় বারে দেশের মানুষ নিজেদের জীবনের তাগিদে উপাহার বর্মাকে আবার সিংহাসনে বসাল। মনোবল কীভাবে যে বাড়াতে হয় তা উপাহার বর্মা ব্রহ্মদত্তের কাছে শিখেছিলেন। কারণ তিনি চোখের সামনে দেখতে পেলেন

ব্রহ্মদত্তের সেনারা কীভাবে মাইনে করা সেনার মতো না লড়ে নিজের দেশের জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছে। কীভাবে ওই রাজা তার সেনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।'

রাজার এই মৌনভাব ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল আবার গিয়ে ঝুলে পড়ল ওই গাছে।

১৪. ধর্মস্থাপনা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছে উঠে শব নাবিয়ে। কাঁধে ফেলে চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন। বেতাল বলে উঠল, 'রাজা, তুমি ধর্মাধর্ম রক্ষার কাজে এগিয়ে যাচ্ছ? মনে রেখ ধর্ম রক্ষা করা অত সহজ ব্যাপার নয়। গণ্ডের কাহিনি শুনলেই বুঝতে পারবে আমার কথা কতখানি সত্য। শুনতে শুনতে পথ হাঁটার পরিশ্রমও তুমি টের পাবে না।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীনকালে বসন্ত নগরের রাজা ছিলেন মদনবর্মা। লোকটা খুব আরামে কাটাত। রাজা হয়েও রাজ্যের কোনো কাজকর্ম নিজে দেখাশোনা করত না। সবসময় মদ্যপান করত আর বহু নারীকে কাছে রাখত। আনন্দ উপভোগ করত।

দেশ দেখাশোনার ভার মন্ত্রী ও সেনাপতিদের উপর ছেড়ে দিয়েছিল। তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছিল।

এইসব সত্ত্বেও মদনবর্মার নাম অন্য দেশে মহা ধর্মাত্মা হিসেবেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তার কারণ হল সেই রাজা বছরে দু-বার খুব ঘটা করে যজ্ঞ করত। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ বিদায় করত অনেক কিছু দিয়ে। ব্রাহ্মণেরা নানান মূল্যবান জিনিস পেয়ে রাজাকে ভালো কথা বলে প্রশংসা করত। তাকে বুকভরা আশীর্বাদ জানাত। এই যজ্ঞ উপলক্ষে প্রচুর অর্থ খরচ করত। কোনো হিসেব থাকত না। যজ্ঞের জন্য যা লাগত সব দেশের অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে আনা হত। দেশবাসীকে ফতুর করে দিয়েও জিনিস সংগ্রহ করত। যজ্ঞ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে আকাল দেখা দিত।

দেখতে দেখতে দেশবাসীর অবস্থা ভয়াল রূপ ধারণ করল। এই ধরনের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে গণ্ড নামে এক চোরের উপদ্রব ভীষণ বেড়ে গেল। নতুন নতুন পদ্ধতিতে সে চুরি করত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গণ্ডের নামে ভয়ে কাঁপত।

অন্য বছরের মতো সে-বছরেও রাজা মদনবর্মা খুব খরচ করে যজ্ঞের ব্যবস্থা করল। দূর দূর থেকে ব্রাহ্মণেরা এসে রাজার কাছ থেকে সোনাদানা নিয়ে বনপথে নিজের দেশে ফিরে যেতে লাগল।

রমশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বনপথে চলার সময় ভয় পেয়ে জোরে জোরে শ্লোক উচ্চারণ করছিল। গণ্ড হঠাৎ তার সামনে হাজির হয়ে বলল, 'দেশবাসী খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না, আর তোমরা যজ্ঞ করাচ্ছ? যজ্ঞ ? বলি কার অর্থে এসব করছে রাজা? কার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থে এসব করছে রাজা? তোমরা কি প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা অর্থে ভাগ বসাচ্ছ না? একটা অকর্মণ্য অপদার্থ, ভোগী রাজাকে তোমরা প্রশংসা করতে এসেছ? সমস্ত সোনাদানা যা কিছু পেয়েছ ওখানে রেখে নিজের পথে চলে যাও। যাও! এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলে। ফের যদি আসো প্রাণে মারা পড়বে।'

'বাবা তুমি যা বলছ আমি মেনে নিচ্ছি। তবে তোমরাও একবার ভেবে দেখ যা করছ ঠিক করছ কি না। একটু চিন্তা করো।' বলল রামশর্মা।

'আমি অধর্ম দূর করছি। তাই আমি যা করছি তা অবশ্যই ধর্ম। এই রাজা কোনো কাজ করে না। এর মন্ত্রী ও সেনাপতিরা প্রজাদের লটেপটে খাচ্ছে। ব্যাবসাদাররা ইচ্ছেমতো শোষণ করছে। আমি যতটা পারি এই রাজা ততটাও সক্ষম নয়।' বলল নাম করা চোর গণ্ড। 'তাহলে তোমরা এদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ধর্মস্থাপনা করছ না কেন?' রামশর্মা গণ্ডকে প্রশ্ন করল।

'ধর্মস্থাপনা করতে গেলে গোটা দেশের ক্ষমতা হাতে পাওয়া চাই। তা আমার একার পক্ষে এই কাজ কি করা সম্ভব?' বলল গণ্ড।

'কেন সম্ভব নয়? চেষ্টা করলেই সম্ভব হবে। ভাবতে হবে। ভেবে ঠিক করতে হবে কীভাবে কী করা যায়। কত বড়ো বড়ো রাজারা কি এক-একটা চোর ডাকাত ছিল না প্রথম জীবনে চোর ডাকাতে যা ক্ষমতা থাকে

তাতে

সে ইচ্ছা করলেই রাজা হতে পারে।' বলল রামশর্মা।

রামশর্মার কথা গণ্ডের মনে ধরল। এর আগে কোনোদিন তার মাথায় এই ধরনের কথা তো খেলেনি। তুমি আমাকে ভালো পরামর্শ দিয়েছ রাজা হয়ে ধর্মস্থাপনার। তুমি খুব গরিব ব্রাহ্মণ। তোমার জিনিস নিয়ে যাও।' বলল গণ্ড।

রামশর্মা বিরাট ফাড়া কেটে যাওয়ার মতো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চলে গেল।

গণ্ড সেই দিনই বসে গেল পরিকল্পনা করতে। দেশের অন্যান্য চোর ডাকাতদের নানা কৌশল প্রয়োগ করে মস্তবড়ো একটা দল তৈরি করল। কেউ ভয়ে এল গণ্ডের অধীনে আবার কেউ এল কোনো লোভে। গণ্ড সেনাবাহিনী গঠন করল তাদের দিয়ে।

তারপর রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ করে একের-পর-এক গ্রাম দখল করতে লাগল গণ্ড। দখল করা গ্রামের লোককে আশ্বাস দিল। তাদের কোনো কিছুর অভাব থাকবে না। রাজকর্মচারীদের ভরসা দিল এই বলে যে তাদের চাকরি বহাল থাকবে। যে যে পদে আছে সে সেই পদেই থাকবে। এইভাবে রাজার প্রভাব থেকে ওই সব গ্রাম মুক্ত করল।

দেখতে দেখতে গণ্ড একটা ছোটোখাটো রাজা হয়ে গেল। মদনবর্মার কর্মচারীরা দেখল গণ্ডরাজা তো মন্দ নয়। ওরা আগে যা করত তাই করতে পারছে।

এদিকে মদনবর্মা যখন জানতে পারল যে তার রাজ্যের বেশ কিছু অংশে রাজা হয়ে বসে আছে গণ্ড। কী করে যে এত বড়ো একটা সর্বনাশ হল তা মদনবর্মা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না।

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে মদনবর্মা নিজের সমস্ত সেনা নিয়ে গণ্ডের বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। গণ্ড জানত যে একদিন তাকে রাজার প্রচণ্ড আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে। তাই সে তার সৈন্যকে বনেই সুসজ্জিত রাখত। গাছের উপর থেকে, গাছের আড়াল থেকে কীভাবে শত্রুকে পরাজিত করতে হয় তার কৌশল নিজের সেনাকে শিখিয়ে দিল গণ্ড! গণ্ডের বাহিনী চারদিক থেকে রাজার বাহিনীকে আক্রমণ করল। তির ছুঁড়ে, আগুনের তিরে বিদ্ধ করে ছড়িয়ে দিল রাজার সেনাকে। তারপর এক-এক সেনার উপর এক-এক ধরনের অস্ত্র চালাতে লাগল গণ্ডের সেনারা। মদনবর্মার পরাজয় ঘটল ওই বনের যুদ্ধে। তার বহু সৈন্য মারা গেল, হয় শিবিরেই নয় শিবিরের বাইরে। আর কালমাত্র বিলম্ব না করে পরের দিন ভোরেই গণ্ড রাজধানী আক্রমণ করে মদনবর্মার ছেলেকে বন্দি করে অনুষ্ঠান করে সিংহাসনে বসল। কারা যেন প্রশ্ন করল, ‘গণ্ড কোন জাতের লোক? ক্ষত্রিয় না হলে কি রাজ সিংহাসনে বসতে পারে?’

এ-কথা কানে যেতেই রাজপুরোহিত বলল, 'বীর গণ্ড হলেন অতি উত্তম স্তরের ক্ষত্রিয়। এঁর বংশ হল সূর্য বংশ। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের এক-শো আট সংখ্যক বংশধর। এঁর বংশ পরিচিতি আমার কাছে ছিল।' বলেই পুরোহিত তৈরি করে রাখা বংশসূচী পড়তে লাগল।

রাজপুরোহিতের কথা শুনে গণ্ড মনে মনে খুব খুশি হল। তার মনে হল সে সত্যি ক্ষত্রিয়। গোটা অনুষ্ঠানে ভালো ভালো কথা শুনে গণ্ডের মনে হল এই সিংহাসন ন্যায়সংগতভাবে তারই প্রাপ্য।

তারপর গণ্ড তার ক্ষত্রিয় সেনাপতি ও মন্ত্রীদের কথামতো চলতে লাগল।

পাশের দেশের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের রাজ্যের কিছু কিছু অংশ দখল করে নিল।
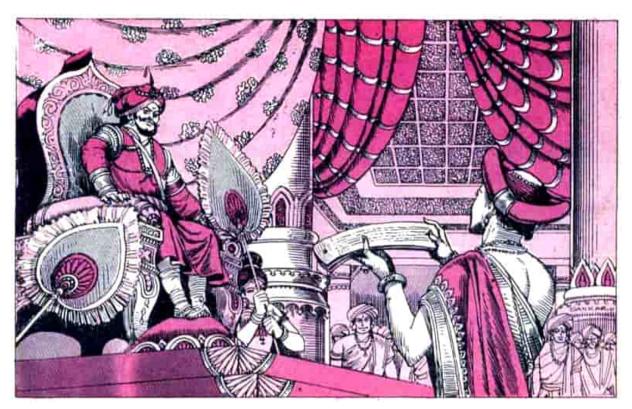
'মহারাজ, এ-বছর আপনার এমন এক মহাযজ্ঞ করা উচিত যা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।' রাজপুরোহিত গণ্ডকে বলল। গণ্ড রাজ্যে যজ্ঞ করার অনুমতি দিল।

রাজকর্মচারীরা সারা দেশ জুড়ে জোগাড় করতে লাগল যজ্ঞের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের শেষ সম্বল কেড়ে আনল ওরা। হাজার হাজার ব্রাহ্মণ খেয়ে-দেয়ে উপহার নিয়ে ভালো ভালো শব্দ উচ্চারণ করে গণ্ডরাজাকে আশীর্বাদ করল। প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে? গণ্ডরাজারও ভালো লাগল।

ওই সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে রামশর্মাও ছিল। গণ্ডের মনে হল লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে। চেনা চেনা লাগছে। রামশর্মা এগিয়ে এসে গণ্ডরাজাকে বলল, 'মহারাজ, আমাকে চিনতে পারছেন? আপনি আপনার কথা রেখে ধর্ম রক্ষা করেছেন। আপনি যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করুন। আমরা যেন আপনার ছত্রছায়ায় থাকতে পারি।'

রামশর্মার কথা শুনে গণ্ডরাজার মুখ ঝুলে গেল। সোজা অন্তঃপুরে ঢুকে গেল তাড়াতাড়ি উপহার বণ্টনের পালা শেষ করে। সেই রাত্রেই মদনবর্মার ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর আদেশ মন্ত্রীকে দিয়ে কালো রাত্রের অন্ধকারে একটা ঘোড়ায় চলে গণ্ড চলে গেল। পরের দিন মন্ত্রী ঘোষণা করল যে গণ্ডরাজা বিরক্ত হয়ে বনে গেছেন। মদনবর্মার ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। মদনবর্মার ছেলেকে সিংহাসনে বসানো হল।

কিছু দিনের মধ্যে আবার একটা খবর বেরুলো। বনে এক ভয়ংকর ডাকাতের আবির্ভাব ঘটেছে। বড়োলোকদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে গরিবদের মধ্যে নাকি তা বণ্টন করবে। কথা রটতে লাগল। আরও জানা গেল যে সিংহাসন ছেড়ে যে গণ্ড বনে গেছে সেই এই লুণ্ঠনের কাজ করছে।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, যে গণ্ড ধর্মস্থাপনার জন্য সিংহাসনে বসতে চেয়েছিল সে সিংহাসনে বসে ধর্মস্থাপনা করল না কেন? কেন আবার লুণ্ঠনকারী হয়ে গেল? যে গণ্ড

যজ্ঞের অত বিরোধী ছিল সে নিজে রাজা হয়ে কেন যজ্ঞ করল? এই প্রশ্নগুলোর সমাধান জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, 'অধর্ম রাখা বলবানের পক্ষে খুব সহজ কাজ। ধর্ম রক্ষা করতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন।

সবার সাহায্য ছাড়া ধর্ম রক্ষা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। গণ্ড অধর্মের মোকাবিলা করতে পারত। সে ভেবেছিল রাজা হয়ে অধর্ম দূর করে ধর্ম রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু রাজা হওয়ার পর বুঝল যে রাজা কোনো কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে না। তাকে নির্ভর করতে হয় সেনাপতি, মন্ত্রী, পুরোহিত এবং আরও অনেকের উপর। তারা যতক্ষণ না কোনো কিছুর বিরোধিতা করছে। ততক্ষণ রাজার একার কোনো কিছু করার মুরোদ নেই। তাই গণ্ড বুঝল যে তার পক্ষে ধর্মস্থাপনা করা সম্ভব নয়। এই সত্য উপলব্ধির পর সে আর একমুহূর্ত সিংহাসনে বসেনি। সবাই মিলে একে বুঝিয়ে দিল যজ্ঞ ঘটা করে করা উচিত। এই যজ্ঞের বিরোধিতা করা তার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। গণ্ড তখন থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে রাজা স্বাধীন নয়। তাই শেষে সে স্বাধীনভাবে বাঁচার পথ বেছে নিল।'

রাজার এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে উধাও হয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

১৫. প্রদর্শনী

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে এলেন।

গাছ থেকে মড়া নামিয়ে কাঁধে ফেলে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

শবেস্থিত বেতাল বলল, 'মহারাজ, কী পরিশ্রম না করছ! তুমি যে এ কাজের ভার কাকে দিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছি না। প্রাচীনকালে মহারাজ চতুরসেন হাজার খুঁজেও নিজের জন্য একজন অঙ্গরক্ষক পেল না। তার কাহিনি বলছি, শুনলে এই মাঝরাতে তুমি যে পরিশ্রম করছ তা লাঘব হবে।'

বেতাল শুরু করল :

সেকালে মহারাজা চতুরসেন চতুরঙ্গপুরে শাসন করত। তার আনন্দ নামে এক অঙ্গরক্ষক ছিল। সে রাজাকে বহু বার নানাবিধ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

হাজার চোখে যেন সে রাজাকে পাহারা দিত। একবার আনন্দের কঠিন অসুখ করার ফলে তার হাত খসে পড়ল। বহু বদ্যি চেষ্টা করেও তাকে সারাতে পারেনি। সারাজীবন তাকে হাত হারিয়ে কাটাতে হয়েছে।

একদিন আনন্দ রাজাকে বলল, 'মহারাজ যতদিন আমি আপনার পাশে ছিলাম ততদিন আমি আমার জীবন দিয়ে আপনাকে রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু এখন যতদিন না আপনার জন্য একজন উপযুক্ত অঙ্গরক্ষকের সন্ধান পাচ্ছি ততদিন আমি শান্তি পাব না।'

চতুরসেন আনন্দের রাজভক্তি যে কত বেশি তা জানত।

আর আনন্দের মতো একজন অঙ্গরক্ষক রাজার না থাকলে চলে না।

'তা এ ব্যাপারে অত ভেবে মরছ কেন? আমার অঙ্গরক্ষক নিযুক্ত করার দায়িত্ব সেনাপতি ও মন্ত্রীর।' রাজা বলল। 'তা আপনি ঠিকই বলেছেন মহারাজ। কিন্তু আমি একটি কথা ভাবছি। আপনি সুধন্যর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমাদের রাজ্যে এর চেয়ে বড়ো ধনুর্বিদ আর কেউ নেই। দূর সম্পর্কে সে আমার আত্মীয়। আপনি একবার তাকে ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনের জন্য ডেকে পাঠান। বললে সে নিশ্চয় আসবে।' বলল আনন্দ।

সুধন্যকে ডেকে পাঠানো হল। সুধন্য ধনুর্বিদ্যার নানা কৌশল রাজাকে দেখাল। তার আগে সে রাজাকে সবিনয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার বয়স বেড়েছে, হয়তো আমার কলাকৌশল আপনার ততটা ভালো লাগবে না।' তারপর সে দেখাল নানান ধরনের মজার খেলা।

ওই খেলা দেখে রাজসভার প্রত্যেকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ একসময় সুধন্য বলল, 'যেকোনো একজন মাথায় ফল রেখে এখান থেকে এক-শো গজ দূরে দাঁড়ান, আমি সেই ফল ফেলে দেব। যারা ভীরু, যাদের প্রাণের ভয় আছে তারা এখানে আসবেন না। কই এবার কার সাহস আছে এগিয়ে আসুন।'

সুধন্যের ক্ষমতা সম্পর্কে উপস্থিত লোকের ধারণা ছিল।

তাই দশ বারো জন যুবক এগিয়ে এল। তখন সুধন্য বলল, 'আমি বুঝলাম যে এই দশ বারো জনের আমার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস আছে। তবে তোমরা হয়তো কোনোদিন দেখনি আমার তির ছোড়া। হয়তো লোকমুখে শুনেছ। আমারও অনেক দিন অভ্যেস নেই। তবু দু-একবার অন্য কিছু লক্ষ্যভেদ করে তারপর মাথার ফল ফেলব।'

সুধন্যের চাহিদা অনুসারে রাজা একটি থালা ও একটি সোনার কৌটো এবং একটি রুপোর কৌটো আনিয়ে তাকে দিলেন।

সুধন্য অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ওই থালে রাখা কৌটোগুলোর দিকে দেখিয়ে বলল, 'আমি রুপোর কৌটোর ঢাকনা ফেলে দেবার চেষ্টা করব।'

পরমুহূর্তেই সুধন্যের হাত থেকে তির ছুটে বেরিয়ে গেল। সোনার কৌটোর ঢাকনা ছিটকে বেরিয়ে গেল দূরে। সুধন্যের মুখ ঝুলে গেল। দর্শক সবাই সুধন্যর এই ব্যর্থতায় অবাক হয়ে গেল।

তারপর সুধন্য আর একবার চেষ্টা করল।

দুটো হাঁড়ি আনাল।

এক হাঁড়িতে থাকবে জল অন্য হাঁড়িতে গোলাপজল। দূরে গিয়ে সুধন্য বলল 'গোলাপজলের হাঁড়ি ফুটো করব আমি।'

তির সোজা গিয়ে জলের হাঁড়ি ফুটো করল।

পরক্ষণেই সুধন্য বলল, 'এখন আমি ওই ফুটো বন্ধ করে দিচ্ছি।' বলে একটি তির ছুড়ল।

তির গিয়ে ফুটোর মুখ বন্ধ করে দিল।

তখন সুধন্য যুবকদের বলল, তোমরা লক্ষ করেছ আমার মন একটু অশান্ত।

আমি ঠিক লক্ষ্যভেদ করতে পারছি না। এখন তোমরা আবার ভেবে বল তোমাদের মধ্যে কে মাথায় ফল নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত আছ।'

এ-কথা শুনে মাত্র একজন যুবক এগিয়ে এসে বলল, 'আমি প্রস্তুত আছি।'

ওই সময় আনন্দ রাজার কাছে গিয়ে কানে কানে বলল, 'মহারাজ, একেই আপনার অঙ্গরক্ষক হিসেবে নির্বাচন করতে যাচ্ছি।'

তারপর যুবক মাথায় একটি ফল রেখে দাঁড়ানোর জন্য দূরে গেল সেখানে মাথায় ফল রেখে প্রস্তুত হল।

সুধন্য ধনুকে তির জুড়ে দাঁড়ানোর পরেও ওই যুবকের চোখে-মুখে ভয়ের কোনো চিহ্ন ছিল না। দর্শকদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয়ের সঞ্চার হল।

সুধন্য যুবকের কাছ থেকে এক-শো গজ দূরে দাঁড়িয়ে তির ছুড়ল।

মুহূর্তে যুবকের মাথার উপর থেকে ফল উড়ে গেল।

যুবক একটুও বিচলিত হয়নি। সঙ্গেসঙ্গে মহারাজ আসন থেকে উঠে যুবককে অভিনন্দন জানিয়ে তাকে নিজের অঙ্গরক্ষক করে নিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। রাজার জন্য দরকার ছিল একজন অঙ্গরক্ষক।'

'তাহলে আনন্দ ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনের আয়োজন রাজাকে করাল কেন? রাজাই বা তাতে রাজি হল কেন? সুধন্য যখন জানত যে সে লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না তখন সে কেন ওই প্রদর্শনের নামে যুবকদের বিব্রত করল?’

‘সবাই যখন পেছিয়ে গেল তখন একজন যুবকই-বা এগিয়ে এল কোন ভরসায়?’

‘আনন্দই বা রাজাকে পরামর্শ দিল কেন ওই যুবককে অঙ্গরক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে?’

‘আমার এইসব প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না বল তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, ‘অঙ্গরক্ষকের নির্বাচন বা পরীক্ষা করে নিয়োগের ব্যাপারে রাজার যত না চিন্তা ছিল তার চেয়েও বহুগুণ বেশি চিন্তা ছিল আনন্দের।'

‘আনন্দের কথামতোই রাজা ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনের আয়োজন করলেন।'

'কারণ আনন্দের প্রত্যেকটি কথা রাজা রাখতেন। সুধন্যের লক্ষ্যভ্রষ্টের মূলে ছিল সাহসী যুবক নির্বাচনের চেষ্টা। সুধন্য ভালোভাবেই জানত যে তার তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার নয়।'

‘এবং তা জানত বলেই প্রদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল ।'

‘যুবকদের মধ্যে যারা ছিল ভীরু যাদের বুদ্ধি ছিল কম, তারাই পেছিয়ে গেল।'

‘সুধন্যের প্রস্তাবে রাজি হয়ে নির্ভয়ে যে যুবক এগিয়ে গেল একমাত্র সেই যুবকই বুঝতে পেরেছিল যে সুধন্যের লক্ষ্য অভ্রান্ত। এবং বুঝেছিল বলেই সে সাহস করে এগিয়ে এসেছিল। গোটা ব্যাপারটাই ছিল আনন্দের পূর্ব পরিকল্পিত। আনন্দ তার দুরাত্মীয়কে দিয়ে এই কাজ করিয়েছিল বলেই পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিল।

আর তার পরামর্শ অনুসারেই ওই যুবককে রাজা নিজের অঙ্গরক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন।'

রাজার এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ করার সাথে সাথে বেতাল শব থেকে বেরিয়ে আবার গিয়ে বৃক্ষলগ্ন হল।

১৬. বিজয় চিহ্ন

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে ফিরে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে পরিশ্রম করছ তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু মনে রেখো রাজ্য শাসন করা এর চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমের। উদাহরণস্বরূপ আমি এক যুবরাজের কাহিনি তোমাকে শোনাচ্ছি, শুনলে তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।

বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীন কালে যবন দেশে এক সুন্দর রাজ্য ছিল। সেই দেশের রাজাকে প্রজারা আদর্শ রাজা বলে মনে করত।

তার শাসনকালে দেশবাসী অত্যন্ত সুখে ছিল। সেই রাজার ছিল দুটো ছেলে রাজার ইচ্ছে হল তার মৃত্যুর পরও দেশে ভালো শাসন যেন থাকে। প্রজারা যেন এখনকার মতোই সুখে থাকে। রাজার ইচ্ছে হল তার দুই ছেলের মধ্যে। ভালো শাসনকার্য চালানোর জন্য উপযুক্ত ছেলে যে কে, তা একবার যাচাই করে দেখা। তাই সে ঠিক করল তার দুই ছেলের মধ্যে প্রজারা কাকে চায় তা নির্বাচন করার ভার প্রজাদের হাতেই তুলে দেবে। প্রত্যেক বছর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রজাদের মধ্যে রাজার ছাপ দেওয়া পত্র বণ্টন করা হবে। নির্বাচনের দিন প্রত্যেক গ্রামে দুটো করে বাক্স থাকবে। তার মধ্যে একটা বাক্স হবে বড়ো রাজকুমারের, অন্যটা ছোটোর। প্রজারা নিজের ইচ্ছেমতো গোপনে সেই মুদ্রাঙ্কিত পত্র যেকোনো বাক্সে পুরে দেবে।

কিন্তু কোন বাক্স যে কার তা চেনা যাবে কী করে? ঠিক হল এক-একটা বাক্সে এক-এক ধরনের চিহ্ন অঙ্কিত থাকবে। প্রথম নির্বাচনের সময় বড়ো রাজকুমারের বাক্সের উপর সিংহের চিহ্ন আঁকানোর ব্যবস্থা হয়েছিল।

নির্বাচনের আগে রাজা দুই কুমারকে অনুমতি দিল দেশে ঘুরে ঘুরে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করতে।

বড়ো রাজকুমার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে প্রচার করল যে সে রাজা হতে পারলে দেশে চাষ-আবাদের সুবিধে করে দেবে, জলসেচের সুবিধে করে দেবে, পুকুর খোঁড়াবে, প্রজাদের জীবিকার উন্নতি ঘটাবে। আর প্রত্যেক গ্রামে হাসপাতাল ও পাঠশালা তৈরি করবে। তার বাবা জনতাকে সুখে রাখার জন্য যেভাবে কাজ করে থাকে সে-ও সেইভাবে কাজ করে যাবে।
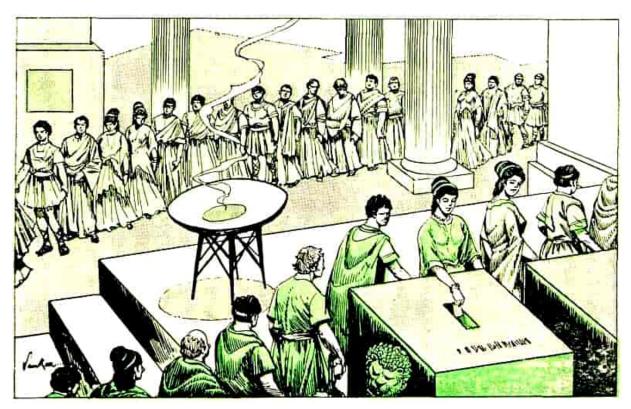
দ্বিতীয় রাজকুমার প্রজাদের কাছে অন্য কথা প্রচার করল। সে বলল সে আশপাশে কোনো শত্রু-রাজাকে রাখবে না। ওদের পরাজিত করে ওদের রাজ্য কেড়ে নেবে। নিজের রাজ্যের বিস্তার করবে। এইভাবে রাজ্যের যশ বৃদ্ধি করবে।

যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচন হল। দেখা গেল দেশবাসী বড়ো রাজকুমারকেই পছন্দ করে।

ছোটো রাজকুমার বাবাকে বলল, 'আপনি আমার বাক্সে যদি সিংহের চিহ্ন আঁকিয়ে দিতেন তাহলে দেশবাসী আমাকেই বেশি পছন্দ করত। দাদা যে সবার সমর্থন পেয়েছেন তার কারণ ওই চিহ্ন।'

'ওরে পাগলা, চিহ্নে কী এসে যায়! তোমার দাদা প্রজাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাতেই প্রজারা তোমার দাদাকে পছন্দ করেছে। বেশ তো, তোমার যদি ইচ্ছে হয়, আগামী বছর তোমার বাক্সে সিংহের চিহ্ন আঁকা হবে। তখন বুঝতে পারবে কার জয় হবে।' রাজা ছোটো রাজকুমারকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলল।

নির্বাচনে জয়লাভ করে বড়ো রাজকুমার এক বছর রাজত্ব করল। নির্বাচনের আগে প্রজাদের কাছে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। প্রজারা তার শাসনে খুশি।

এক বছর পরে আবার রাজা নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সে-বছর রাজার নির্দেশমতো দ্বিতীয় রাজকুমারের বাক্সে সিংহের চিহ্ন আঁকা হল। আগের মতো সে-বছরও দুই রাজকুমার সারা দেশে ঘুরে ঘুরে নিজের নিজের কথা প্রচার করতে লাগল।

নির্বাচন হয়ে গেল। প্রজারা সে-বছর দ্বিতীয় রাজকুমারকে নির্বাচন করল। দ্বিতীয় রাজকুমার সিংহাসনে বসে আশেপাশের দেশের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করল। বিভিন্ন পেশায় যারা জড়িত তাদের টেনে নিল সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করার কাজে। খেতখামারের অসুবিধাগুলো দেখার জন্য লোক রইল না। বিরাট এক সর্বনাশের আগেই আবার নির্বাচন এসে গেল।

রাজ সেই বছর সিংহের চিহ্ন বড়ো রাজকুমারের বাক্সে লাগাতে চাইল। কিন্তু দ্বিতীয় রাজকুমার কিছুতেই তাতে রাজি হল না।

বড়ো রাজকুমার রাজাকে বলল, 'ন্যায়সংগতভাবে সিংহের চিহ্ন এ বছর আমারই পাওয়া উচিত।'

তখন রাজা বড়ো রাজকুমারকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বলল, 'ওরে পাগলা, চিহ্নে কী এসে যায়? প্রথমবারে দেশবাসী নির্বাচনে তোমাকেই নির্বাচিত করেছিল। কারণ ওদের ধারণা ছিল সিংহাসনের তুমিই উত্তরাধিকারী। কিন্তু দ্বিতীয় বার ওদের ইচ্ছে হল ছোটো রাজকুমারের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে একবার পরখ করে দেখার। এখন ওরা দুই রাজকুমারেরই শাসন দেখে নিয়েছে। আর চিহ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। আমার ধারণা এ-বছর প্রজারা তোমাকেই বেছে নেবে। আর যাই হোক প্রজাদের অত বোকা ভেব না।'

বাবার কথা মন দিয়ে শুনে বড়ো রাজকুমার চিহ্ন নিয়ে মাথা ঘামালো , আর এ-বিষয়ে কোনো কথাও সে বলল । ফলে সেবারেও সিংহের চিহ্ন পেল দ্বিতীয় রাজকুমার।

তৃতীয় নির্বাচনেও দ্বিতীয় রাজকুমারেরই জয় হল। তৎক্ষণাৎ রাজা দেশটাকে দু-ভাগ করে দুই রাজপুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিল। আর নিজে সন্ন্যাসীর পোশাকে মঠে চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, এখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। তৃতীয়বারের নির্বাচনেও প্রজারা কেন অযোগ্য দ্বিতীয় রাজকুমারকে নির্বাচন করল? রাজা তো শুধু বড়ো রাজকুমারকে রাজত্ব দিতে পারত। রাজ্যটাকে ভাগ করতে গেল কেন? আর সন্ন্যাসীর পোশাক পরেই-বা মঠে চলে গেল কেন? আমার এই প্রশ্নের সমাধান জানা সত্ত্বেও যদি না জানাও, তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

তারপর বিক্রমাদিত্য বললেন, 'প্রজারা শুধু ভালো শাসন কাকে বলে তাই জানত। খারাপ শাসনের ফলে যে কি হয় সে ব্যাপারে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ওদের কাছে সিংহ চিহ্ন ভীষণভাবে ভালো লেগে গেল। মনে হয় যেন ওই সিংহ চিহ্নের জন্যই ছোটো রাজকুমার বার বার নির্বাচিত হয়ে যেত। এই ধরনের একটা আশঙ্কা করেই রাজার মাথা ঘুরে গেল। রাজার যে ধারণা ছিল। প্রজারা বোকা নয়, সে ধারণা তার বদলে গেল। তার মনে হল জনতা যে কী চায় তা বড়ো রাজকুমারের চেয়ে ছোটো রাজকুমার বেশি বুঝেছে। এহেন ছোটো রাজকুমারকে একেবারে রাজত্ব না দিয়ে বঞ্চিত করা ভুল হবে। আবার বড়ো রাজকুমারকে বঞ্চিত করা অন্যায় হবে ভেবে রাজা রাজ্যকে দু-ভাগ করে দুই রাজকুমারকে দিয়ে দিলেন। তারপর তার আর ইচ্ছে করল না এই রাজ্য শাসন পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখার। কারণ তার ধারণা হল, সুশাসন বলতে কী বোঝায় তা তিনি প্রজাদের মধ্যে ভালোভাবে প্রচার করতে পারেননি। কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রজাদের মুখর হতে শেখাননি। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

রাজা বিক্রমাদিত্যর মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গেল গাছে।

১৭. হারানো সুযোগ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে এলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'মহারাজ, এই গভীর অন্ধকারে এইভাবে যে কেন পরিশ্রম করছ আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি কি জান না যে ঠিক এইসময় এই কাজ করার ফলে তুমি অন্যদিকে বিরাট সুযোগ হারাচ্ছ? ঠিক যেভাবে দয়ানিধি হারিয়েছিল। দয়ানিধির কাহিনি শুনলে তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : দয়ানিধির বাবা ছিল এক বিখ্যাত নৌকা ব্যবসায়ী। সারাজীবন দেশে-বিদেশে ব্যাবসা করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পেরেছিল। দয়ানিধিই ছিল তার একমাত্র পুত্র। তাই তার বাবা ভেবেছিল দয়ানিধিও একদিন মস্তবড়ো নৌকা ব্যবসায়ী হবে।

কিন্তু দয়ানিধি যত বড়ো হতে লাগল তত তার আচার-আচরণ অন্য ধরনের হয়ে উঠল। ব্যাবসার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তার মনে একটা দুশ্চিন্তা ঢুকেছিল, বাবা যে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে তা দিয়ে কী করা যায়। বাচ্চা বয়স থেকেই দয়ানিধির বৈদ্যশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল। মানুষের শরীরে কোথায় কী আছে, কেন অসুখ করে, কোন অসুখে কী ওষধ দেওয়া যায় প্রভুতি বিষয়ে পড়াশোনা করল সে। শেকড়, বাকল এনে নিজেই ওষুধ বানাত। দয়ানিধির এই হাবভাব দেখে তার বাবা তাকে ফেরাতে অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু দয়ানিধির মন ব্যাবসায় বসতে চাইল না। চিন্তায় চিন্তায় দয়ানিধির বাবা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। অবশেষে মারা গেল।

বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দয়ানিধি এক বিরাট চিকিৎসালয় তৈরি করল। বিনা পয়সায় ওষুধ বণ্টন করতে লাগল। তারজন্য তার হাজার ভাগের এক ভাগ অর্থও খরচ করে উঠতে পারত না। দয়ানিধি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না তার বাবা তাকে নিয়ে কেন এত দুশ্চিন্তায় পড়েছিল।

বিনা পয়সায় চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়ে সারা দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন রোগ সারাতে আসত আর ওষুধ নিয়ে যেত। এক জনের রোগ সারলে সে দশ জনের কাছে প্রচার করত। প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল এবং চিকিৎসালয়ের সুনাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল দেশে-বিদেশে।

কিন্তু দয়ানিধির এইভাবে এত বড়ো চিকিৎসালয় গঠন বিনা পয়সায় ওষুধ বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে দু-ধরনের লোক চটে গিয়েছিল। এক হল চিকিৎসক। কারণ তাদের কাছে রোগীরা যেত না। বিনা পয়সায় রোগ সারাতে পারলে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পয়সা দেবে কেন? অন্য জন ছিল ধনীরা। ওদের রোগ যখন কোনো চিকিৎসকের কাছে সারত না, তখন তাদের যেতে হত দয়ানিধির কাছে। হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়িয়ে দয়ানিধির কাছ থেকে ওষুধ নিতে হত। এতে ধনীরা ভীষণ অপমান বোধ করত। কিন্তু অন্য উপায়ও ছিল না। আর একটা কারণেও ধনীদের কাছে দয়ানিধির আচরণ ভালো লাগল না। তারা ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করে দেশে খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছিল। দয়ানিধির চিকিৎসালয় হওয়ার পর থেকে সারা দেশে দয়ানিধির নামই প্রচারিত হত।

কীভাবে যে তার খ্যাতি নষ্ট করা যায় তা নিয়ে তাদের চিন্তার আর শেষ ছিল না।

কিছু ধনী ভাবতে লাগল অন্য কোনোভাবে উপকার করে নাম করার কথা। বৈদ্যরাও মাথা ঘামাল। কেউ ভাবল তাকে ইহজগত থেকে সরানোর কথা। ঠিক এরকম একটা সময়ে সেই দেশের রাজার মৃত্যু হল। রাজার মৃত্যুর পর রাজপুত্র সিংহাসনে বসল। নতুন রাজা যে হল সে গরিব-দুঃখীদের দিকে একেবারে নজর দিত না। সে ছিল ভীষণ লোভী। চারদিক থেকে ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বৈদ্যরা

ওই রাজাকে জানাল যে দয়ানিধি ধনী। প্রতিদিন সে চিকিৎসা করার নামে হাজার হাজার রোগীকে জড়ো করছে আত্মপ্রচারের জন্য।

রাজা লোক পাঠিয়ে দয়ানিধির কাছে কত অর্থ আছে, কী কী ধনসম্পত্তি আছে খোঁজ নিল। নানা অজুহাতে দয়ানিধির চিকিৎসালয় ও সমস্ত সম্পত্তি রাজা অন্যায়ভাবে দখল করে নিল।

এত নিয়েও রাজার শান্তি ছিল না। প্রতিদিন যেহেতু বহু গরিব মানুষ দয়ানিধির কাছে আসত, দয়ানিধির কাছে শুনত যে রাজা দাতব্য চিকিৎসালয় দখল করে নিয়েছে সেহেতু রাজার প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। ক্রমশ রাজার প্রতি গরিবদের ঘৃণা বাড়তে লাগল। তখন রাজা দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে। দয়ানিধিকে দেশ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

অগত্যা দয়ানিধিকে দেশ ছাড়ার জন্য দেশের প্রান্তে, সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াতে হল। সমুদ্রতীরে এক সওদাগরের নৌকা ছিল। ওই সওদাগর দয়ানিধির বাবাকে চিনত। তৎক্ষণাৎ দয়ানিধিকে নিজের নৌকায় তুলে নিল। যেতে যেতে ওই সওদাগর দয়ানিধিকে অনেক উপদেশ দিল। দুঃখ না করে ব্যাবসায় মন দিতে বলল।

কিন্তু দয়ানিধির মত প্রকাশের আগেই সমুদ্রে ঝড় তুফান উঠল। ওই নৌকা ডুবে গেল। কাঠের গুড়িতে দয়ানিধি ভাসল।

পরে দয়ানিধির চেতনা লোপ পেল। অজ্ঞান অবস্থায় দ্বীপের কিনারে পৌছে গেল।

সেই দ্বীপে আদিবাসীদের বসতি। দয়ানিধিকে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পেল এক আদিবাসী যুবতী। সে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। জ্ঞান ফেরার পর তাকে খেতে দিল। দয়ানিধি ভালোভাবে সেরে উঠল। তাকে ঘিরে বহু আদিবাসী যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ভিড়।

তাদের চোখে-মুখে দয়ানিধি সম্পর্কে কৌতুহলের ছাপ। ওই দ্বীপের আদিবাসীরা ওখানকার জমিতে চাষ করে। ওখানকার বনে শিকার করে। বাকল আর গাছের পাতা তাদের পরিধানে। ওদের মধ্যে উচ্চ নীচের কোনো মনোভাব নেই। খেতের ফসল আর শিকার করা পশুর মাংস খেয়ে তাদের পেট ভরে।

দয়ানিধি আদিবাসীদের ভাষা শিখে নিল। যে আদিবাসী যুবতী তাকে সমুদ্রতীরে দেখেছিল, এবং সুস্থ করে তুলেছিল, তাকেই দয়ানিধি বিয়ে করে ফেলল।

ওই দ্বীপের অধিবাসীদের একটা মারাত্মক রোগ হত। চোখের দৃষ্টি দ্রুত কমে যেত। অন্ধ হয়ে যেত। দয়ানিধি এই মারাত্মক রোগ কবে থেকে শুরু হল তা জানল।

'সাবধান! তুমিও অন্ধ হয়ে যেতে পার!' দয়ানিধির বউ বলল।

'তাতে ভয় পাই না। যে পরিবেশে অসুখ করে সেই পরিবেশে ওষুধও পাওয়া যায়।' দয়ানিধি বলল।

দয়ানিধি আর তার আদিবাসী বউ জঙ্গলে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরতে লাগল। দয়ানিধি যা খুঁজছিল তা পেল।

ওষুধ তৈরি করে যার চোখে রোগ ধরে দয়ানিধি তাকে সেই ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তোলে। দয়ানিধির চিকিৎসার ফলে সেখানে আর কেউ অন্ধ হল না।
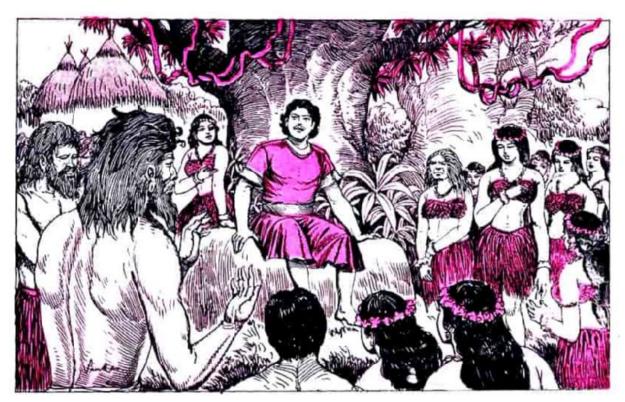
এত বড়ো উপকার করায় সেই দ্বীপের অধিবাসীরা দয়ানিধিকে দেবতার মতো দেখতে লাগল। আস্তে আস্তে দয়ানিধি নানা রোগের চিকিৎসা করতে লাগল। দেখতে দেখতে সে দ্বীপে রোগ বলে কোনো কিছু ছিল না।

একদিন দয়ানিধি ও তার বউ খেতের কাজ করছিল। এমন সময় একটি নৌকা সেই সমুদ্রতটে পৌছাল। একজন সওদাগর সেই নৌকা থেকে নেমে দয়ানিধিকে দেখতে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি এখনও বেঁচে আছ? আমরা তো তোমার সম্পর্কে কত কথা শুনলাম। ওই নৌকা ডুবির পর আর কি কেউ বাঁচতে পেরেছে?' দয়ানিধি যা যা ঘটেছিল বিস্তারিতভাবে বলল। তার কথা শুনে সওদাগর বন্ধুটি বলল, 'তোমার দেশত্যাগ করার পর দেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমরা যাকে রাজা মনে করতাম সে তো আসলে ছিল এক বিরাট সম্রাটের অধীনস্থ রাজা। সম্রাট তার লোভ তার অত্যাচার সম্পর্কে গোপনে সব জানতে পারল। তারপর তাকে একদিন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। সেই সম্রাট তোমার মতো যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সব শাস্তি মকব করেছে। অতএব তুমি এখন আর দেশদ্রোহী নও। তুমি এখন দেশে ফিরে এসো। যে ধনসম্পত্তি ওই লোভী রাজা দখল করে নিয়েছিল সে সমস্তই তুমি ফেরত পাবে। আগের মতো তুমি তোমার সম্পত্তি নিয়ে সুখে জীবনযাপন করতে পারবে। তোমার চিকিৎসালয় আবার চালু করতে পারবে। দেশের মানুষ এখনও তোমায় ভোলেনি। ওরা তোমার কথা বলে। চল, আমার নৌকায় ফিরে চল দেশে।'

দয়ানিধি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সওদাগরের সব কথা শুনল। দেশের কথা। দেশের মানুষের কথা। তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'না বন্ধু এই দ্বীপ ছেড়ে আমি অন্য কোথাও যাব না। দাঁড়াও, তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সওদাগর বন্ধুটি দয়ানিধির কথা শুনে ভাবল, নৌকাডুবির ফলে দয়ানিধির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তা না হলে কি আর দয়ানিধি নিজের দেশে ফিরে যেতে চাইত না? ধনসম্পত্তি ফেরত পেতে চাইত না?

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ, দয়ানিধি তো সহজেই দেশে ফিরে যেতে পারত? অগাধ ধনসম্পত্তি নিয়ে শেষের জীবনটা সুখেই কাটাতে পারত। এত বড়ো সুযোগ পেয়েও কেন সে ফিরে গেল না?

সে কি নিজের দেশকে ভালোবাসত না? আদিবাসীদের ওই অসভ্য জীবনযাত্রা রাতারাতি তার এত ভালো লেগে গেল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'দয়ানিধির ধনসম্পত্তি বা সুখী জীবনের প্রতি টান ছিল না। তার জীবনে যে দুঃখদুর্দশা এল তার মূলে ছিল ধনসম্পত্তি। একমাত্র রোগীদের রোগ সারিয়ে সে আনন্দ পেত। ওর ধনসম্পত্তি যে রাজা দখল করে নিয়েছিল সে রাজা মারা গেলেও যেসব বৈদ্যরা তার বিরোধী ছিল তারা তখনও বর্তমান ছিল। যেসব ধনী দয়ানিধির বিরুদ্ধে ছিল তারাও বহাল তবিয়তে সেই দেশে বেঁচে ছিল। তাই তার মাতৃভূমি তার মনের ভূমি ছিল না। তাই দেশের মাটি তাকে টানতে পারেনি। অপর পক্ষে আদিবাসীদের মধ্যে কোনো ধনী-গরিব ছিল না। সে যাদের রোগ সারাত তারা দু-হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করত। সেই দ্বীপে কোনো রাজা ছিল না। কোনো সম্রাটের অধীনে ছিল না সেই দ্বীপ। ওখানকার মানুষ যে যতটা পারে পরিশ্রম করত। ফল যা পেত ভাগ করে খেত। এসব দয়ানিধির ভালো লেগেছিল। তাই দয়ানিধি ওই দ্বীপেই রয়ে গেল। ' রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল ওই গাছে।

১৮. কথা না রাখা

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে গেলেন সেই বৃক্ষের কাছে। সেখান থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, 'রাজা তুমি কাউকে কথা দিয়ে বসে আছ কি না জানি না। আমি এও জানি না যে পাছে কথা রাখতে পারবে না সেই ভয়ে তুমি এই গভীর রাতে পরিশ্রম করছ কিনা। তবে একটা কথা জেনে রেখো, যখন কোনোক্রমেই কথা রাখতে পারবে না তখন কথা না রাখলেও পার। বীরসিংহের মতো রাজাও কথা দিয়েছিল কিন্তু নিরুপায় হয়ে কথা সে রাখতে পারেনি। আচ্ছা, তোমাকে শোনাচ্ছি সেই কাহিনি। এতে তোমার পরিশ্রম কমবে, ভালোও লাগবে।'

বেতাল বীরসিংহের কাহিনি শুরু করল : বীরসিংহ যখন যুবরাজ ছিল তখন সে যখন-তখন শিকার করতে বনে যেত। সে ছিল খুব সাহসী। একদিন শিকার করতে করতে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খেতে একটা পুকুরের কাছে গিয়ে দেখল এক বনবাসী যুবতীকে স্নান করতে। সেই রূপলাবণ্যময়ী যুবতীকে দেখে রাজার চোখের পলক পড়ল না। সে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল। বীরসিংহ সেই যুবতীর কাছে গিয়ে বলল, 'তুমি এত সুন্দরী যে তোমাকে এই বনে-বাদাড়ে রাখা কোনোক্রমেই উচিত নয়। তুমি চল আমার সঙ্গে। আমাকে বিয়ে করে জগতের সমস্ত রকমের সুখ আনন্দ ভোগ কর।'

'আমার গর্ভের সন্তানকে যদি আপনি রাজা করে সিংহাসনে বসান তবে আমি বিয়ে করব।' যুবতী বলল। বীরসিংহ তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। তাকে বিয়ে করে সুখে জীবনযাপন করতে লাগল।

কিছুদিন পরে বীরসিংহ আবার শিকার করতে বনে গেল। শিকার করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তৃষ্ণাও পেল তার। তখন সে ওই পুকুরে গেল জল খেতে। গিয়ে দেখে যাকে বিয়ে করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী এক যুবতী পুকুরে স্নান করছে। যুবরাজ তার কাছে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল।

দ্বিতীয় বনবাসী যুবতীও প্রথম যুবতীর মতো শর্ত রাখল। তার গর্ভজাত সন্তান রাজা হওয়ার অধিকার পেলে সে বিয়ে করবে। বীরসিংহ এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাকেও বিয়ে করে নিয়ে গেল রাজমহলে।

আবার কয়েক মাস পরে বীরসিংহ শিকার করে ফেরার পথে ওই পুকুরের কাছে জল পান করতে এসে যা দেখল তাতে তার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। এমন এক পরমাসুন্দরী যে ওই ধরনের বনে থাকতে পারে তা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

বীরসিংহ তাকেও বিয়ে করতে চাইল। তৃতীয় যুবতীও প্রথম ও দ্বিতীয় যুবতীর মতো শর্ত রাখল বীরসিংহের কাছে। বীরসিংহ সেই অপরূপা যুবতীর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। এভাবে বীরসিংহ পর পর তিন জন বনবাসী যুবতীকে একই রকমের কথা দিয়ে, একই ধরনের শর্তে রাজি হয়ে বিয়ে করেছিল। যাই হোক, বীরসিংহ তৃতীয় যুবতীকে বিয়ে করে রাজমহলে ঢুকল।

কিছুদিন পরে আবার বীরসিংহ শিকারে গেল। শিকার সেরে সেই পুকুরের ধারে জল খেতে এসে তার নজরে পড়ল এক বনবাসী যুবতী। তবে আগের যুবতীদের মতো তার রূপ নেই। সাধারণ এক যুবতী।

বীরসিংহের মনে এই সাধারণ মেয়ের প্রতিও দুর্বলতা জাগল। সারল্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে গিয়ে বলল, 'তুমি এত চিন্তিত কেন? কী তোমার পরিচয়? এখানে গালে হাত দিয়ে বসে আছ কেন?'

'আমার তিন বোন আমাকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গেছে। আমি এখন একা এখানে পড়ে আছি। আমি ভেবে পাচ্ছি না কী করব!' যুবতী বলল।

বীরসিংহ বুঝতে পারল যে তার বউরাই এই যুবতীর তিন বোন। তখন সে ওই যুবতীকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করল। একে নিয়ে বীরসিংহের চার স্ত্রী হল।

কিছুকাল পর বীরসিংহ রাজা হল। তার কিছুদিন পর চার বউয়ের চার ছেলে হল। চার ছেলের মধ্যে চতুর্থ স্ত্রীর পুত্র অন্য ছেলেদের মতো ছিল না । সে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। বাপের কাছে বেশি ঘেষত না। আপন মনে নিজের কাজে জড়িয়ে থাকত। বড়ো ভাইদের সঙ্গেও মিশত না। সে সুযোগ পেলেই বনে গিয়ে বনের অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করত। আর বাকি তিন ছেলে বাপের কথামতো চলত। মন্ত্রীরও ধারণা ছিল রাজা ওই তিন জনের মধ্যেই একজনকে সিংহাসনে বসাবে। রাজা চতুর্থ রাজকুমারকে কোনো কাজের ভার দিলে নিজে তা না করে অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিত।

চতুর্থ রাজকুমারকে বনের অধিবাসীরা নেতা হিসেবে নির্বাচন করল।

এদিকে রাজা বীরসিংহের বয়স বাড়তে লাগল। রাজার পরে কে সিংহাসনে বসবে তা ঠিক করে দেবার জন্য মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞেস করল। মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা বনে গিয়ে চতুর্থ রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে তাকেই রাজা করে দিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, এখন তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বীরসিংহ কেন চতুর্থ রাজকুমারকে রাজা করল? এর ফলে বাকি তিন বউকে যে কথা দিয়েছিল তার ভঙ্গ হয়নি কি? এইভাবে রাজার কথা না রাখা কি উচিত? এটা কি ছোটোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব নয়? অন্য রাজকুমারদের প্রতি উপেক্ষা নয়? এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান জেনেও যদি না জানাও তবে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথা শুনে বিক্রমাদিত্য জবাব দিলেন, 'রাজা বীরসিংহ চতুর্থ ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে কোনো শর্ত ভঙ্গ করেননি বরং তিনি দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন। রাজা যখন দ্বিতীয় রানিকে কথা দিলেন তখনই প্রথম রানির শর্ত নষ্ট হয়ে গেল। এইভাবে চতুর্থ রানিকে কথা দেওয়ার সাথে সাথে আগের তিন রানিকে যে কথা দিয়েছিলেন তার কোনো দাম রইল না। বনবাসী যুবতীদের শর্ত আরোপের মধ্যে যত না যোগ্যতা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল মোহ। কিছু না ভেবেই ওরা শর্ত করেছিল। বড়ো তিন রানির ছেলেদের ছিল গোলামির মনোভাব। তাদের যা করতে বলা হত তাই করত। কিন্তু ছোটো রাজকুমার তা করত না। তার রাজা হওয়ার যোগ্যতা আছে কি না তা প্রথম বুঝেছিল বনের অধিবাসীরা। তাই রাজা যোগ্য রাজকুমারকেই রাজা করেছিলেন। তিনি কোনো ভুল বা শর্ত ভঙ্গ করেননি।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

১৯. আসল কারণ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ওই গাছের কাছে আগের মতোই ফিরে এলেন। গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, 'রাজা, তুমি ধনী তাই তুমি হয়তো ধনের আশায় এই পরিশ্রম না করতে পার, তবু মনে রেখো ধন হল অত্যন্ত পাপপূর্ণ একটি জিনিস। ধন স্নেহ বোঝে না, ভালোবাসা বোঝে না। আমার কথা আরও ভালো করে বুঝতে পারবে যদি একটি গল্প শোনো। তোমার পথ হাঁটার পরিশ্রম লাঘব হবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : সাকেতপুরে এক ছিল খুব গরিব লোক। একদিন সে অন্যান্য দিনের মতোই কাঠ কাটতে গেল বনে। কাঠ কেটেই সে পরিবারের খরচ চালাত। সেদিন শুনতে পেল এক কাতর আর্তনাদ।

গরিব লোকটার নাম ছিল গোপ। সে তাড়াতাড়ি যে দিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেই দিকে গেল। গিয়ে দেখে একজন গর্তে পড়ে ছটফট করছে। গোপ তাকে তুলে দেখে লোকটা পাশের গাঁয়ের লোক। নাম রামভদ্র। বিরাট ধনী।

'আমাকে ডাকাতরা লুঠ করে এনে এই গর্তে ফেলে রেখে গেছে। দু-দিন ধরে আমার পেটে একমুঠো ভাত পড়েনি। আমি ক্ষুধার্ত। তৃষ্ণার্ত। তুমি উদ্ধার করতে এসেছ।' রামভদ্র বলল।

গোপ রামভদ্রকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই রামভদ্র সেরে উঠল। একদিন রামভদ্র গোপকে ডেকে বলল, 'আমি তোমার জন্য এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম। তুমি উদ্ধার না করলে আর কে উদ্ধার করত।' বলে রামভদ্র তাকে কিছু টাকা দিতে চাইল। গোপ বলল, 'মানুষ মানুষকে সাহায্য করবে তারজন্য আবার টাকা নেবে! এ ভালো নয়।'

দু-জনের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা ক্রমশ বাড়তে লাগল। গোপের যখন অভাব অনটন দেখা দিত তখন সে অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার নিত। সে রামভদ্রের কাছ থেকে ধার নেবার কথা ভাবতে পারত না। কথাটা রামভদ্রের কানেও গেল যে গোপ ধার করে বেড়ায়। তার দিন কাটে না। এসব জানার ফলে রামভদ্র এমনভাবে মেলামেশা করত যেন সেও গরিব।
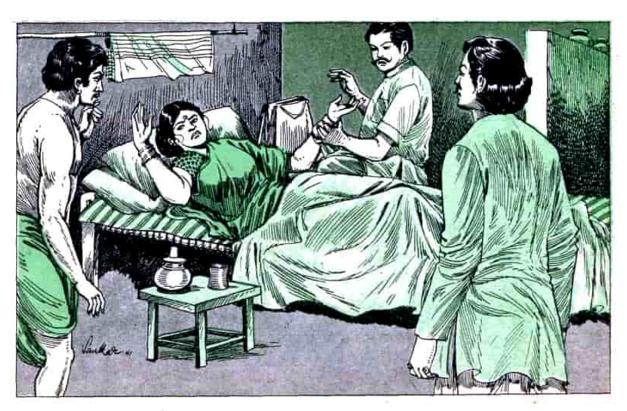
দু-জনের বন্ধুত্ব এত গভীর এবং নিবিড় হয়ে গেল যে সারা গাঁয়ের লোকের কাছে ওদের বন্ধুত্ব প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়ে গেল।

এভাবে অনেক বছর কেটে গেল।

গোপের স্ত্রী অসুখে পড়ে গেল। সাধারণ তো দূরের কথা ভালো বৈদ্যের পক্ষেও তার অসুখ সারানো সহজ ছিল না।

'এরকম কঠিন রোগ দেবশর্মা ছাড়া অন্য কেউ সারাতে পারে না।' যারা দেখতে এসেছিল তারা বলল।

গোপ চমকে উঠল। সে তার বউয়ের বাঁচার আশা ছেড়েই দিল। কারণ দেবশর্মা পাথরে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে কিন্তু তার মন পাথরের চেয়ে কঠিন। তাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হলে শত শত টাকা দরকার।

এ-কথা কানে যেতেই রামভদ্র নিজেই দেবশর্মাকে ডেকে আনল। দেবশর্মা এসে গোপের স্ত্রীকে পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'এ রোগ সারানো যাবে। তবে তিরিশ দিন ওষুধ খেতে হবে। প্রত্যেক দিনের জন্য খরচ পড়বে পঞ্চাশ টাকা।'

'ঠিক আছে আপনি চিকিৎসা শুরু করুন।' রামভদ্র বৈদ্যকে বলল।

টানা একমাস গোপের স্ত্রীর চিকিৎসা চলল। গোপের স্ত্রী দেবশর্মার কথামতো ঠিক এক মাসেই সেরে উঠল। রামভদ্র দেবশর্মাকে পনেরো-শো টাকা দিয়ে দিল। গোপের মনে আনন্দ হল। যাই হোক তার বউ অত বড়ো রোগ থেকে সেরে উঠেছে। কিন্তু তার মনে দুঃখও হল। ভাবল বন্ধুত্বের মধ্যে টাকার আদান-প্রদান উচিত নয়।

এই ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গোপ দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যেকোনো ভাবে সে রামভদ্রের টাকা ফেরত দেবেই। কিন্তু যত দিন যায় ততই অবস্থা খারাপ হতে থাকে। গোপ বুঝতে পারে যে সে যত সহজে টাকা শোধ দেবার কথা ভেবেছিল তার পক্ষে কাজটা তত সহজ হবে না। পরিশ্রম বাড়িয়ে খাওয়া কমিয়েও তার টাকা জমানো সম্ভব হচ্ছিল না। পনেরো-শো তো দূরের কথা পনেরো টাকাও সে জমাতে পারল না।

টাকা জমানোর জন্য স্বামীকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখে গোপের স্ত্রী বলত, 'এতদিন তুমি বলতে রামভদ্র তোমার বন্ধু। বন্ধুকে সাহায্য করে কি কেউ ফেরত নেয়? ওর মতো ধনী লোকের পক্ষে পনেরো-শো টাকা তো কিছুই নয়। বিপদে বন্ধু খরচ করবে না। তোমার বন্ধু কি জানে না যে তুমি যতই পরিশ্রম কর না কেন কোনোক্রমেই তোমার পক্ষে অত টাকা জমানো সম্ভব নয় ?'

গোপের স্ত্রী আশেপাশের মহিলাদের এই কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলত। প্রত্যেক দিন এককথা শুনতে শুনতে গোপেরও মনে হল তার স্ত্রীর কথাই ঠিক। যত সে ওই টাকার কথা ভাবে ততই রামভদ্রের বিরুদ্ধে তার মনে প্রচ্ছন্ন রাগ যেন জমতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল অতীতের কথা। তাকে সে গর্ত থেকে তুলে বাঁচিয়েছে। তারজন্য সে কি পেল। শুধু দুটো মিষ্টি কথা। রামভদ্রের কথা ভাবলেই গোপের মাথা গরম হয়ে যেত।

আস্তে আস্তে সে রামভদ্রের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমিয়ে দিল। তাকে দেখলেই তার মনে পড়ত সেই পনেরো-শো টাকার কথা। আর টাকার কথা মনে পড়লেই রামভদ্রকে যেন শত্রুর মতো লাগত।

এরকম অবস্থায় গোপের স্ত্রী যে কথা প্রতিবেশিনীদের কাছে বলে বেড়াত সে-কথা ঘুরতে ঘুরতে রামভদ্রের কানেও গেল। সবাই তো অন্যের মঙ্গল কামনা করে না। তাই যারা গোপ ও রামভদ্রের বন্ধুত্ব ভালো চোখে দেখত

না তারা এই অবস্থার সুযোগ নিল। কয়েক জন রামভদ্রকে বলল, 'আপনার ধার শোধ করার জন্য গোপ প্রাণপাত পরিশ্রম করছে আর আপনি দেখেও না দেখার ভান করছেন। এ আপনার উচিত হচ্ছে না।'

রামভদ্র লোকের মুখ থেকে এইসব কথা শুনে ভাবল সে তো গোপকে কোনোদিন টাকা শোধ করার কথা বলেনি। তবু কেন লোকের মুখে মুখে এ-কথা ঘুরছে। গোপ নিজেই তো শোধ করে দেবে বলেছে। সে তাতে কোনো কথা বলেনি। কারণ শোধ দিতে হবে না বললে গোপ হয়তো মনে দুঃখ পেত। অন্যদিক থেকে গোপ যদি বলত, 'আমি তোমার টাকা কোনোদিনই বোধ হয় শোধ দিতে পারব না।' তাহলে কি আমি তার কাছে হাত পেতে চাইতাম। বরং আমার কত ভালো লাগত। সামনাসামনি কিছুই বলল না অথচ পিছনে এইসব কথা প্রচার হচ্ছে। এইভাবে ভাবতে ভাবতে নিজেদের অজান্তেই কবে যে একে অন্যের শত্রু হয়ে গেল তারা নিজেরাই টের পেল না।
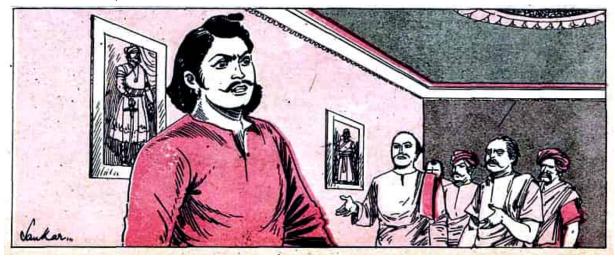
বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, গোপ ও রামভদ্রের মধ্যকার অমন নিবিড় বন্ধুত্বে চিড় ধরল কেন? গোপের দারিদ্রই কি এরজন্য দায়ী? নাকি রামভদ্রের ব্যস্ততা? অথবা রামভদ্রের টাকাপয়সাই দায়ী? রাজা আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি তুমি জবাব না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

‘ওদের বন্ধুত্বে চিড় ধরার মূলে ছিল শুধু টাকা। ওদের দুজনেই একথা ভালোভাবেই জানত যে টাকার আদান-প্রদানের ফলে সম্পর্ক নষ্ট হয়। ওরা সবসময় টাকাপয়সার ব্যাপারে সতর্ক থাকত। টাকার ব্যাপারে ওদের ওই ধারণার ফলেই বন্ধুত্বে ফাটল ধরতে ধরতে পরিণতি অত খারাপ হয়ে গেল। টাকার ব্যাপারে অত গুরুত্ব না দিয়ে ওরা বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করার চেষ্টা করলে ওদের বন্ধুত্ব অটুট থাকত।'

রাজার এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে। হাওয়া হয়ে গেল। পরক্ষণেই গিয়ে উঠল সেই গাছে।

২০. দেবতার রাগ

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে গেলেন। গাছ থেকে শব নাবিয়ে যাথারীতি মৌনভাবে শব কাধে ফেলে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, দেবতাদের নিন্দা করার ফলে অনেক সময় নানা রকমের বিপদ ঘটে যায়। তোমার কাজ দেখে সন্দেহ জাগছে, তুমিও দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছু করছ কি না। দেবতাদের বিরুদ্ধে যৌধেয় শৃঙ্গ গিয়েছিল। ফলে তাকে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। আমি এখন তোমাকে তার কাহিনি শোনাচ্ছি। শুনলে তোমার ভালোই লাগবে। এত রাত্রে তুমি যে পরিশ্রম করছ তা কিছুটা লাঘব হতে পারে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীন কালে সিন্ধু প্রদেশের বহুপ্রান্তে নানা জাতের বনবাসীরা বাস করত। তারা বনেই থাকত। বনের জীবজন্তু শিকার করাই তাদের একমাত্র কাজ ছিল। ওদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শৃঙ্গ। তার শক্তি সাহস ও শিকার করার কৌশলের ফলে সে কিছুদিনের মধ্যেই একটি দুর্গ তৈরি করে নিতে পারল। কৈশোর অবস্থা থেকেই সে শিকারের ব্যাপারে অন্যদের নেতৃত্ব দিত। এভাবে যৌধেয় জাতির লোক তাকে একদিন তাদের নেতা হিসাবে ঘোষণা করল। নেতা হয়ে শৃঙ্গের ইচ্ছে করল গোটা জাতির উন্নতি সাধনের। সে তার সমগ্র যৌধেয় জাতির উন্নতির জন্য সমস্ত রকমের কষ্ট স্বীকার করে রাতদিন পরিশ্রম করতে লাগল।

যৌধেয়দের বাসস্থানের পাশে মায়াব নামক আর এক জাতের লোক বাস করত। ওরা জাদুর সাহায্যে নানাদিক থেকে নানাভাবে অনেক ধনসম্পত্তি জমিয়েছিল। ওরা জাদু বলে এমনকী ঘরবাড়িও বানাতে পারত। তবু, ওদের একটা অভাব ছিল। তা হল ওদের শক্তি। ওরা নিজেদের মতো করে দুর্গ বানিয়ে তাতে নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগল। বাইরের কোনো শত্রুকে আক্রমণ করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। আক্রমণ করার শক্তি না থাকলেও আত্মরক্ষা করার শক্তি না থাকলে কোনো দুর্গই বেশিদিন রক্ষা করা যায় না।

আক্রমণ না করলে নিজেদের কবলিত অঞ্চল বাড়ানো যায় না। তাই আক্রমণ করার মতো বাহিনী গঠনের দিকে প্রথম নজর দিতে হল শৃঙ্গকে।

শৃঙ্গ নিজের জাতের লোককে ভালোভাবে যুদ্ধকৌশল শিখিয়ে মায়াব লোকের দুর্গের উপর আক্রমণ করল। মায়াবরা জাদুর সাহায্যে শৃঙ্গকে রোখার চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল। শৃঙ্গ ওদের দুর্গ দখল করে নিল। মায়াব জাতির বিভিন্ন শিল্পীদের দিয়ে মনের মতো দুর্গ ও একটি নগর তৈরি করে নিল শৃঙ্গ। ওই লুণ্ঠিত জিনিস দিয়ে সেই নগর সাজাল।

যারা বনে বাস করত, সেই যৌধেয় জাতের মানুষ নগরে বাস করার সুযোগ পেল শৃঙ্গের জন্য। নগরে বাস করতে করতে ওরা নানা ধরনের পেশা শিখে নিল। চাষ-আবাদ থেকে ব্যাবসাবাণিজ্য পর্যন্ত সব কিছুই যৌধেয় লোকের শেখা হয়ে গেল।

শৃঙ্গকে ওরা রাজা করে নিল।

কিন্তু শৃঙ্গ লক্ষ করল তার জাতের লোক অনেক দূর এগিয়ে গেলেও তারা অনেকগুলো কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস নিয়েই আছে। কুসংস্কারের হাত থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য শৃঙ্গ ভাবতে লাগল। শেষে একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য যৌধেয় জাতের প্রত্যেককে একদিন মাঠে জমায়েত হতে বলল। যৌধেয় জাতের লোক শৃঙ্গকে দেবতার মতো ভক্তি করত। তাই তার আদেশ পাওয়া মাত্র ওরা বিরাট এক মাঠে হাজির হল। সেই মাঠের সামনে ছিল রাজমহল, পিছনে ছিল পাহাড়।

শৃঙ্গ তার রাজমহলের উপরে উঠে তার প্রজাদের দেখল। তাকে দেখেতে পেয়ে প্রজারা তার জয়ধ্বনি করল। শৃঙ্গ তাদের উদ্দেশে বলল, 'আমি তোমাদের প্রথমেই একটি প্রশ্ন করতে চাই। তোমরা যখন বনে থাকতে যেরকম ছিলে, যতটা কষ্ট সহ্য করেছিলে তার চেয়ে এখন অনেক ভালো আছ কি না? তোমাদের কষ্ট অনেক কমে গেছে কি না? এখন তোমরা বল এর কারণ কী? এর আগে যদি না ভেবে থাক তবে এখন ভেবে বল।'

'সবই ভগবানের দয়া।' প্রজারা একবাক্যে বলল।

ওদের কথা শুনে শৃঙ্গের বিরক্তি জাগল। সে প্রজাদের বলল, 'এতে ভগবানের দয়ার কী আছে? তোমরা পরিশ্রম করে যুদ্ধকৌশল শিখলে, দুর্গ দখল করলে, নগর গড়ে তুললে, চাষ-আবাদ করছ, ব্যাবসাবাণিজ্য করছ, আর বলছ কিনা ভগবানের দয়া!'

পরক্ষণেই সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। ভয়ংকর ঝড় উঠল।

ভূমিকম্প হল। রাজমহলের পাহাড়ের চূড়া থেকে লাভা বেরুল। জমির ভিতর থেকে হাজার হাজার সাপ বেরুল। চাষ-আবাদ সব আশা মাটিতে মিশে গেল। ফলে বহু প্রজা মারা গেল। এমনকী শৃঙ্গের পোশাকের রং-ও বদলে গেল।

প্রজারা খুব ভয় পেয়ে যে যেদিকে পারল পালাল। তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেল না। কারণ ভূমিকম্পের ফলে ঘরবাড়ি সব ভেঙে পড়েছিল।

যৌধেয় জাতির যে গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা শৃঙ্গের উপর ছিল তা চোখের পলকে উবে গেল। ওদের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হল শৃঙ্গ ভগবানকে নিন্দে করেছে। বলেই এসব হয়েছে।

প্রজাদের এই মনোভাবের কথা উত্তরাঞ্চলের রাজা রাবল জানতে পেরে সেনাবাহিনী নিয়ে শৃঙ্গের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করল।

শৃঙ্গ প্রজাদের উত্তেজিত করে রাবল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানোর অনেক রকমের চেষ্টা করল।

কিন্তু প্রজাদের মন ভেঙে গিয়েছিল, শৃঙ্গের উপর আস্থা ছিল না। ফলে তারা যুদ্ধ করতে এগোল না। তখন নিরুপায় হয়ে শৃঙ্গ রাবল রাজার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গোপন পথে পালিয়ে গেল। মায়াব, যবন ও অন্য বনবাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে বাধ্য হয়েছিল পুব দিকের পথ ধরে পালাতে।

অনেক কষ্টে সে রেগিস্তান পার হয়েছিল। কুড়ি দিন কষ্ট করে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক রাজ্যে শৃঙ্গ পৌঁছাল।

শৃঙ্গ ইন্দ্রপ্রস্থের একটি উদ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখল। সেইসময় রাজকুমারী কেশিনি উদ্যানে বেড়াচ্ছিল। শৃঙ্গ উদ্যানের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে বাধা পেল। পাহারায় যে ছিল সে তাকে বাধা দিল।

তখন উদ্যানের বাইরে একটি গাছের নীচে সে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারীর পরিচারিকা উদ্যানের বাইরে এসে শৃঙ্গের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে ছুটে গিয়ে রাজকুমারীকে জানাল। রাজকুমারী কেশিনি ওই যুবককে ডেকে পাঠিয়ে তার ক্লান্ত দেহ দেখে তাকে কিছু ফল খেতে দিল। ওইটুকু সময়ের মধ্যে কেশিনি বুঝতে পারল যে ওই যুবক সাধারণ যুবক নয়। তাই তাকে সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন করল, আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?'

কেশিনি ছিল অপূর্ব সুন্দরী। প্রথম দর্শনেই শৃঙ্গ তার রূপে মুগ্ধ হল। শৃঙ্গ থেমে থেমে গম্ভীর গলায় বলল, 'এখন আমার আর কোনো পরিচয় নেই। তবে একসময় পরিচয় ছিল।'

কেশিনি ওই যুবককে রাজমহলে নিয়ে গিয়ে রাজার কাছে তার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

মেয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে কেশিনির বাবা বলল, 'যার কোনো ঠিকানা নেই, নাম নেই, তাকে কোন ভরসায় কোন বিশ্বাসে বিয়ে করতে চাও মা? তোমাকে বিয়ে করার জন্য কত বড়ো বড়ো রাজার কুমাররা অপেক্ষা করছে।'

কেশিনি তখন শৃঙ্গের দিকে ঘুরে তাকে বলল, 'আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আপনি রাজকুমার। আপনি আপনার সত্য পরিচয় দিলে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে। বাবার মত পাব।'

শৃঙ্গ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আমি এখন অসহায়। আমার ভাগ্য এখন বিড়ম্বিত। এই অবস্থায় আমি আমার পরিচয় কী করে দিতে পারি!' বলে শৃঙ্গ নিজের সমস্ত কাহিনি বলল। কেশিনি যখন জানতে পারল যে ওই যুবকই যৌধের শৃঙ্গ তখন তার খুব আনন্দ হল। কারণ এই ঘটনার কয়েক দিন আগেই সে শৃঙ্গের নাম শুনেছিল। তার বীরত্বের কাহিনিও শুনেছিল। তাই কেশিনি শৃঙ্গকে বলল, 'আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাকে বিয়ে করার পর আপনি এই ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য পাবেন। যে রাজ্য হারিয়েছেন তার জন্য দুঃখ করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দুর্ভাগ্যের দিনও শেষ হয়ে গেছে ধরে নেবেন।' তারপর কেশিনি বাবার অনুমতি চাইল।

সব কথা শুনে রাজা ঠিক করতে পারল না কী করবে। তখন রাজা মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রণা কক্ষে গেল। রাজকুমারী কেশিনি ওদের মন্ত্রণা কক্ষে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি সে নিজেও ওই কক্ষে ঢুকে পর্দার আড়ালে দাঁড়াল। ওদের সমস্ত কথাবার্তা শুনল।

শুরুতে রাজা শৃঙ্গের সমস্ত কাহিনি শুনিয়ে মন্ত্রীদের বলল, 'শৃঙ্গ এখন আমাদের অতিথি সে কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।'

তৎক্ষণাৎ একজন মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, রাবল এক শক্তিশালী রাজা। এই সুযোগে আমরা যদি শৃঙ্গকে বন্দি করি, রাবল রাজার হাতে তাকে তুলে দি তাহলে রাবল রাজার সঙ্গে আমাদের মৈত্রী অনন্তকাল ধরে অটুট থাকবে।'

'অতিথিকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। নীতি বিরুদ্ধ কাজ। রাবল রাজা যদি ইতিমধ্যে টের পেয়ে থাকে যে, শৃঙ্গ আমাদের অতিথি হয়ে আছে তাহলে ওই রাজা আমাদের উপর আক্রমণ করবে।' অন্য এক মন্ত্রী বলল।

এইসব কথা শুনে আর এক মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, রাজকুমারীর ইচ্ছাপূরণের মাত্র একটি উপায় আছে। এই সুযোগে আমরাও তো প্রতিবেশী রাজ্যদের সাহায্য নিয়ে রাবল রাজাকে আক্রমণ করতে পারি। ওর উপর বহু রাজা চটে আছে। রাবল প্রত্যেক রাজার সঙ্গে পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া করে। এর ফলে শৃঙ্গও নিজের বদলা নিতে পারবে। আর রাজকুমারীর ইচ্ছাও পূরণ হবে।'

এই প্রস্তাব উপস্থিত সকলের কাছে ভালো লাগে। বহু ছোটো ছোটো দেশের রাজা রাবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি হল। রাবলের বিরুদ্ধে বিরাট এক সেনাবাহিনী গঠিত হল। শৃঙ্গ ওই বাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে যোগদান করল। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবলের বিরুদ্ধে স্বয়ং শৃঙ্গ এগিয়ে এল। রাবলকে শৃঙ্গ বধ করল।

তারপর শৃঙ্গ নিজের জাতির লোককে খোঁজ করে জানতে পারল যে ওদের অনেকে বনে ফিরে গেছে। আর বাকি লোকগুলো যবন মায়াবদের গোলাম হয়ে গেছে।

শৃঙ্গ নিজের জাতের সবাইকে আবার জড় করে নিজের হারানো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কেশিনিকে বিয়ে করে। বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, দেবতারা যখন শৃঙ্গের উপর চটে গেল, তখন আবার তারা রাজ্য পাইয়ে দিলেন কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শৃঙ্গ যে দেবতাদের বিশ্বাস করে না এই ভুল ধারণা ছিল তার জাতির লোকের। অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিল বলেই শৃঙ্গকে ওরা ভুল বুঝেছিল। স্বাভাবিক কারণে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল, তারজন্য ওরা শৃঙ্গই অপরাধী ভেবেছিল। আবার যখন শৃঙ্গ রাজ্য ফিরে পেল, তখন ওরা ভাবল যে ভগবান আর তার উপর চটে নেই।'

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য মৌনভাব ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল গাছে।

২১. পুরুষদ্বেষিণী

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য আবার গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে এগোতে থাকেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তোমার পরিশ্রম দেখে আমার মনে হচ্ছে। তুমিও বিশ্বমিত্রের মতো কোনো নারীর হিংসার শিকার হয়ে গেছ। বিশ্বমিত্রের কাহিনি শুনলে তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীন কালে শ্রীপুরে বিশ্বমিত্র নামে এক ধনী যুবক ছিল। তার স্বভাব ছিল উদার, মন ছিল প্রশান্ত। কিশোর বয়সেই তার মা-বাবা মারা গেল। ফলে তার নিকট আত্মীয়রা তাকে লালনপালন করে বড়ো করল এবং বিয়ে দিল পাশের গাঁয়ের এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে।

বিশ্বমিত্রের স্ত্রী মিত্রবিন্দু খুব সুন্দরী ছিল বটে তবে ওদের দুজনের মধ্যে বনিবনা ছিল না। কথায় কথায় ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগত। বিশ্বমিত্র মিত্রবিন্দুর গায়ে হাত দিলে তার মনে হত তার গায়ে যেন সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম প্রথম বউয়ের আচরণ দেখে তার মনে হত তার বাবা-মা বুঝি জোর করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বমিত্রের এই ধারণা যে ভুল তা সে টের পেল। মিত্রবিন্দু শুধু যে তার স্বামীকেই ঘৃণা করে তাই নয় গোটা পুরুষ জাতিকেই ঘৃণা করে।

একবার কথায় কথায় মিত্রবিন্দু বলল, 'পুরুষ মাত্রেই ভূতের মতো লেগে থাকে। কোনো বুদ্ধিমতীর উচিত নয় বিয়ে করা। নেহাত বাবা-মা দুঃখ পাবে তাই, না হলে আমি বিয়ে করতাম না।'

তার কথা শুনে বিশ্বমিত্র মনে মনে ভাবল বউয়ের এই ভুল ধারণা যেকোনো ভাবে দূর করতে হবে। আর একবার ভুল ধারণা দূর করতে পারলে মিত্রবিন্দুর মনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এইসব কথা ভেবে বিশ্বমিত্র নানান ধরনের চেষ্টা করতে লাগল। মিত্রবিন্দুকে খুশি করার সমস্ত রকম চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হল ঠিক সেইসময় মিত্রবিন্দুর মধ্যে মা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন বিশ্বমিত্র ভাবল বাচ্চা হওয়ার পরে নিশ্চয়ই মিত্রবিন্দুর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেবে।

যথাসময়ে মিৎৰবিন্দুর যমজ সন্তান হল। যমজ সন্তান হওয়ার পরে মিত্রবিন্দুর মনে পরিবর্তন দেখা দেওয়া দূরে থাক সে বিশ্বমিত্রের প্রতি আরও বেশি ঘৃণা পোষণ করতে লাগল। সে খালি ভাবত বিশ্বমিত্র তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে আরও অসুবিধেয় ফেলতে চায়। সে স্বামীকে দেখেই চটে যা মুখে আসত তাই বলত।

স্ত্রীর কাছ থেকে এতটা রুক্ষ ব্যবহার পেয়ে বিশ্বমিত্র বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ঠিক করল। ভাবল সে বাড়ি থেকে চলে গেলে হয়তো মিত্রবিন্দুর মনে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। ভেবে ভেবে শেষে একদিন বিশ্বমিত্র বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

যেতে যেতে অরণ্যের এক প্রান্তে এক সিদ্ধ যোগীর সাক্ষাৎ পেল। সেই যোগী বিশ্বমিত্রকে বলল, 'বাবা, তোমার যদি তাড়া না থাকে আমার কাছে একটু দাঁড়াও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি দেহত্যাগ করব। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে কামরূপ বিদ্যা দান করে যেতে চাই। এই বিদ্যা শিখে আমার দেহত্যাগের পর এই দেহটাকে পুড়িয়ে তুমি তোমার পথে চলে যাবে।'

বিশ্বমিত্র সিদ্ধ যোগীর কথামতো কাজ করতে রাজি হল। যোগী খুশি হয়ে বিশ্বমিত্রকে কামরূপ বিদ্যা দান করে প্রাণত্যাগ করল। বিশ্বমিত্র সেখানেই কাঠ সাজিয়ে চিতা তৈরি করে যোগীর মৃতদেহ দহন করল। তারপর বিশ্বমিত্র বিলম্ব না করে শ্রীপুরে ফিরে এল।

বিশ্বমিত্র নিজের গাঁয়ে যখন ফিরল তখন রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল। সে তখন কামরূপ বিদ্যার প্রয়োগ করে নারী রূপ ধারণ করল। নারী রূপ ধরে তার বাড়ির সামনের বাড়ি কড়া নাড়ল। সে বাড়িতে থাকত দেবদত্ত নামে এক যুবক।

দেবদত্তের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলে দেবদত্ত দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অপ্সরা, অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতীকে দেখে দেবদত্তের ঘুম ছুটে গেল।

'আমার নাম সুমিত্রা। আমি দূর দেশ থেকে পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। মা-বাবা থাকলে পথ হারাতাম না। কিন্তু আমাদের উপর হঠাৎ ডাকাত দল ঝাঁপিয়ে পড়ায় এই অবস্থায় পড়েছি। ডাকাতরা বড়ো নিষ্ঠুর। আমার বাবা-মাকে আমারই চোখের সামনে মেরে ফেলেছে। আমাকে মেরে ফেললেই পারত। এই রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। এই রাতের মতো দয়া করে আপনি আমাকে থাকতে দিন কাল সকালেই চলে যাব।' নারী রূপ ধারণকারী বিশ্বমিত্র বলল।

'এখানে এসে আপনি ভালো করেছেন। নিরাপদে থাকতে পারবেন। কোনো ভয় নেই আপনার। নিশ্চয়ই আপনি থাকুন। রাতটা কাটিয়ে যান। কিন্তু আমি ভাবছি, কাল আপনি কোথায় যাবেন। আবার কোনো খারাপ খপ্পরে পড়ে যাবেন। এবার হয়তো ডাকাতরা আপনাকেই ধরে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আপত্তি না থাকলে আমাকে বিয়ে করতে পারেন।' দেবদত্ত ভদ্রভাবে নিবেদন করল।

সুমিত্রা রাজি হল। পরের দিন শাস্ত্রসম্মত ভাবে দুজনের বিয়ে হল। কিছু দিনের মধ্যেই মিত্রবিন্দু ও সুমিত্রার মধ্যে বন্ধুত্ব হল। সুমিত্রা মিত্রবিন্দুর বাচ্চাদের খুব ভালোবাসত। সবসময় ওই দুটি বাচ্চাকে আদর করত, খেলাত, খাইয়ে দিত। ওই বাচ্চারাও নিজের মার কাছে থাকার চেয়ে সুমিত্রার কাছেই থাকতে বেশি ভালোবাসত।

সুমিত্রা মিত্রবিন্দুকে কথায় কথায় নিজের স্বামী দেবদত্তের কথা বলত। স্বামীর সুখ-সুবিধার দিকে যে সতর্ক দৃষ্টি রাখে সে-কথাও মিত্রবিন্দুকে বলত। সুমিত্রার রূপ ধারণকারী বিশ্বমিত্র লক্ষ করল, মিত্রবিন্দুর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে দেখে সে খুশি হল।

একবার মিত্রবিন্দু সুমিত্রাকে বলল, 'তুমি বেশ সুখে আছ। আমি বোধ হয় যা হারিয়েছি তা আর ফিরে পাব না।'

এই কথার জবাবে সুমিত্রা বলল, 'ক-দিন ধরে জিজ্ঞাসা করব করব ভাবছি কিন্তু পাছে তুমি ভুল বোঝো তাই আমি জিজ্ঞেস করিনি। আচ্ছা এই বাচ্চাদের বাবা কোথায় গেছেন? কবে ফিরবেন?

মিত্রবিন্দুর চোখ জলে ভরে গেল। সে বলল, 'উনি যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন তারজন্য আমিই দায়ী। ফিরবেন কি না কে জানে।'

তার এই কথা শুনে সুমিত্রার রূপধারণকারী বিশ্বমিত্র বুঝল যে তার স্ত্রীর মনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তারপর সে কামরূপ বিদ্যার মাধ্যমে নিজের রূপ ধারণ করে বিশ্বমিত্র বউকে সব কথা বুঝিয়ে বলল।
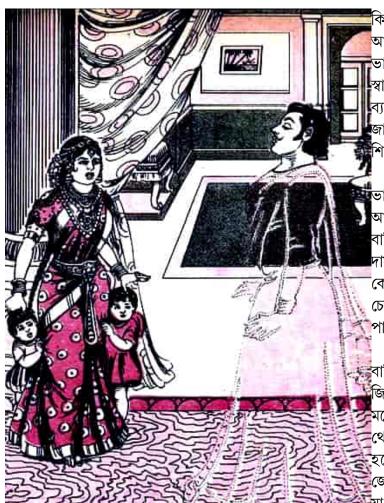
কিছুক্ষণ মিত্রবিন্দুর দিকে তাকিয়ে বিশ্বমিত্র আবার বলল, 'এখন আমি খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছি যে নারীর জীবনে স্বামী এবং সন্তান অপরিহার্য। তোমার ব্যবহারের ফলে নারী জাতির উপর ঘৃণা জাগত। ভাগ্যিস আমি কামরূপ বিদ্যা শিখেছিলাম।'

মিত্রবিন্দু আনন্দে দুঃখে অনুতাপে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, 'সত্যি আমার জন্য আপনার কষ্টের সীমা নেই। আপনি যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন তারজন্য আমিই দায়ী। আপনি এত কষ্ট করতে গেলেন কেন? ইচ্ছে করলে তো আপনি আমার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারতেন।'

'অন্যকে বিয়ে করার ইচ্ছে থাকলে আমি বাড়ি ছেড়ে বনে যেতাম কেন? আমার মনে জিদ চেপেছিল যেকোনো ভাবে তোমার মনের পরিবর্তন করতে হবে। এখানে থেকে আমি অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি। তাই নিজের উপর বিরক্তি জেগেছিল। চলে গিয়েছিলাম বনে। তারপর যা ঘটল সব তো বলেছি।' বলল বিশ্বমিত্র।

এর পর থেকে বিশ্বমিত্র ও মিত্রবিন্দু বাকি জীবন একসঙ্গে সুখে কাটাল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, এই বিশ্বসংসারে অনেক জীব আছে। বিশ্বমিত্র অন্য কোনো রূপ ধারণ না করে একটি নারীর রূপ ধারণ করল কেন? নারীর রূপ ধারণ করে একেবারে নিজের বাড়ির কাছে গেল কেন? অন্য পুরুষের সাহচর্য না পেয়েই মিত্রবিন্দুর মনে পুরুষের প্রতি মতের পরিবর্তন দেখা দিল কেন? এই সব প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তবে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। পুরুষকে ছেড়ে নারী, নারীকে ছেড়ে পুরুষ যদি থাকে তাহলে তাদের জীবন পূর্ণ হয় না। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত জীবনযাপনের ফলেই সৃষ্টির অনুবর্তন। মিত্রবিন্দুর মনে শুধু যে পুরুষের প্রতি হিংসা বা দ্বেষ ছিল তা নয়। নারীর প্রতিও ছিল। নারীর জীবন তার কাছে একটি বিরক্তিকর জীবন ছিল। তাই সে বিয়ে করতে চায়নি। আর এই কারণেই তার মধ্যে স্ত্রীর জীবনের রোমাঞ্চ অথবা মাতৃত্বের অনুভূতি জাগেনি। বিশ্বমিত্র জানত না যে মিত্রবিন্দু যেকোনো পুরুষের মতো যেকোনো নারীকেও ঘৃণা করে। তাই সে নারীর রূপ ধারণ করে মিত্রবিন্দুর মনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি। তারপর সে বাচ্চাদের মায়ের মতো স্নেহ করল, সবসময় মিত্রবিন্দুর কাছে তার স্বামীর গল্প করতে লাগল। এইভাবে আস্তে আস্তে সে মিত্রবিন্দুর মনে নিজের সন্তান ও স্বামীর প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা জাগাতে পারল। দিনের পর দিন চেষ্টা করে সে মিত্রবিন্দুর মন থেকে নারীর প্রতি ও পুরুষের প্রতি ঘৃণার বীজ উৎপাটিত করতে সফল হল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ওই গাছে চলে গেল।

২২. পরিবেশের প্রভাব

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে এসে, গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাধে ফেলে আগের মতো নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি সত্যি সত্যি প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করতে বদ্ধপরিকর দেখছি। কারো কাছ থেকে সাহায্য না নিয়ে তুমি নিজেই একাজ করতে এগিয়ে এলে। নীলদত্তও একা এগিয়েছিল। কিন্তু বাধা পেয়ে হতাশ হল। সে ভারি মজার কাহিনি। শোনো তবে। শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রমও কমে যাবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীন কালে বিজয়পুরী নামক নগরে সোমনাথ নামে একজন নৌকা ব্যবসায়ী ছিল। সে বহু বিদেশিদের সঙ্গে ব্যাবসা করে কোটি কোটি টাকা করেছিল। তার ছিল নীলদত্ত নামে একটি মাত্র ছেলে। নীলদত্ত যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিল তখন তার বাবা নৌকা বোঝাই জাহাজ নিয়ে দূরদেশে যাত্রা করল। পথে প্রচণ্ড ঝড় তুফানের মুখে তার নৌকা পড়ে অতল জলে ডুবে গেল। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস নষ্ট হল এবং সোমনাথের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

দু-বছর কেটে গেল। কিন্তু সোমনাথ আর ফেরেনি। ফলে সোমনাথের স্ত্রী স্বামীর প্রতীক্ষায় দিন গুনতে গুনতে কঠিন অসুখে পড়ে গেল। তারপর সে আর বেশি দিন বাঁচল না।

সোমনাথকে যারা ব্যাবসার ক্ষেত্রে সাহায্য করত এবং যারা তার কাছ থেকে সাহায্য নিত, তারা নীলদত্তকে ঠকিয়ে বহু টাকা মেরে দিল।

তখন নীলদত্ত যুবক। তাকে সহজেই অন্যান্য পেশায় পেয়ে বসেছিল। টাকাপয়সার হিসাব রাখার ভার সে কর্মচারীদের উপর দিয়ে দিয়েছিল। নীলদত্তের এই খেয়ালি ও অকর্মণ্যতার ফলে তার কর্মচারীরা তাকে দিনের পর দিন ঠকিয়ে অল্পসময়ের মধ্যেই ফতুর করে দিয়েছিল।

ফলে দেখতে দেখতে নীলদত্তকে সব হারিয়ে পথে দাঁড়াতে হল। কোনো আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। সোমনাথের এক বন্ধু নীলদত্তকে থাকার আশ্রয় দিল। সোমনাথের সেই বন্ধুর নাম নবকুবের।

নবকুবেরের সঙ্গে সেই দেশের রাজার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সে যখন-তখন রাজার কাছে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারত। একবার নবকুবের নীলদত্তকে। সঙ্গে করে রাজমহলে গেল। তখন রাজকুমারী লাবণ্যবতী নীলদকে আড়াল থেকে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হল। রাজকুমারী মনে মনে ভাবল এহেন রূপবান যুবক যদি তার স্বামী হত তাহলে তার জীবন ধন্য হত।

পরে নীলদত্ত সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে রাজকুমারী তার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারল। নীলদত্ত অন্যের আশ্রয়ে আছে জেনেও তার প্রতি তার আকর্ষণ একরত্তি কমল না।

কিন্তু নবকুবেরের আশ্রয়ে থাকার ফলে নীলদত্তের নিজের উপর ঘৃণা জাগতে লাগল। সে ভাবল এভাবে যদি সে দিন কাটায় তাহলে তার জীবনে আর কোনো পরিবর্তন দেখা দেবে না। নিজে নিজে যে ব্যাবসা করবে তার টাকাও জুটবে না। আবার অন্যের আশ্রয়ে থেকে ব্যাবসা করাও অনুচিত নানা কথা ভেবে একদিন নীলদত্ত নবকুবেরের খাজানা থেকে কিছু টাকা ও কিছু হিরে চুরি করে পালাল। সে ভেবেছিল হিরে চুরি করে অন্য কোথাও কিছু একটা করে জীবন কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তার সঙ্গে যা ঘটে তার কতটুকুই বা মিল থাকে?

নীলদত্ত যা ভাবল তা হল না। সে নগররক্ষীর হাতে ধরা পড়ল। নগররক্ষককে সে কিছুতেই নিজের পরিচয় দিল না। এই না জানানোর ফলে নগররক্ষী বাকি রাতটা কারাগারে রেখে পরের দিন রাজদরবারে

এনে রাজার সামনে তাকে হাজির করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল যে তার নাম নীলদত্ত এবং সে যা নিয়ে পালাচ্ছে তা নবকুবেরের। রাজা তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। রাজা তাকে কঠোর শাস্তি দিত। কিন্তু নবকুবেরের অনুরোধে রাজা তাকে শাস্তি দিল না। ছেড়ে দিল। তবে তাকে সেই দেশে থাকার অনুমতি রাজা দিল না।

নবকুবের নীলদত্তের হাতে টাকা ও হিরের থলি দিয়ে বলল, 'বাবা, তুমি অন্য কোনো দেশে কিছু একটা করে বাঁচার চেষ্টা কর।'

নীলদত্ত চুরি করেছে জেনেও রাজকুমারীর মনে ঘৃণা জাগল না। রাজা তাকে দেশ থেকে দূর করে দিচ্ছে জেনে সে খুব দুঃখ পেল।

নীলদত্ত বিজয়পুরী থেকে বেরিয়ে অবন্তীপুরে গেল। কী করবে কী না করবে ভাবতে ভাবতে কিছুদিন কেটে গেল। বসে বসে খরচ করে কাটানোর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তার হাতখালি হয়ে গেল। কাজ না করে বসে কাটানোর ফলে একদিকে যেমন তার টাকাপয়সা খরচ হয়ে গেল অন্যদিকে তেমনি নানা কু-চিন্তা দানা বাঁধতে লাগল। দেখতে দেখতে সে চুরি করা শুরু করে দিল। অল্পদিনের মধ্যেই হাত পাকিয়ে সে একজন পাকা চোর হয়ে গেল।

চোর হওয়ার পর তার মনে বিচিত্র এক ইচ্ছা জাগল। দেশে ফেরার ইচ্ছে জাগল তার মনে। একদিন রাত্রে সে পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে বিজয়পুরীতে ঢুকল। সেখানে সে দিনের পর দিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে চুরি করতে লাগল। মন টানে মনের মানুষ। নীলদত্তের মনে রাজকুমারীকে দেখার ইচ্ছে জাগল। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে রাজকুমারীর ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় সে ধরা পড়ল প্রহরীর হাতে।

পরের দিন যথারীতি নীলদত্তকে হাজির করা হল রাজার কাছে। দেশের বাইরে থাকার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার অপরাধে ও রাজমহলে চুরি করার উদ্দেশ্যে ঢোকার অপরাধে নীলদত্তকে আজীবন কারাভোগের শাস্তি দেওয়া হল। রাজা যদি জানত যে নীলদত্ত অনেকদিন আগেই তার রাজ্যে ঢুকে অনেকের বাড়িতে চুরি করেছে তাহলে তার ফাঁসি দিত।

গোপনে নীলদত্ত সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে রাজকুমারী লাবণ্যবতী একদিন গোপন পথে কারাগারে ঢুকে নীলদত্তের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলল, ‘নীলদত্ত, আমি যেকোনো ভাবে আপনাকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারি। মুক্ত হয়ে আপনি কি দেশ ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত আছেন?’

‘রাজকুমারী, কোথাও গিয়ে আমি কী করব? আমি তো কোনো কাজই পারি না। আমি তো অক্ষম, কাজের অনুপযুক্ত। আমি কারাগারে এখন ভালোই আছি।' নীলদত্ত বলল।

রাজকুমারী কারাগারের অধিকারীকে ঘুষ দিয়ে যখন-তখন নীলদত্তের সঙ্গে দেখা করত। তার যখন যা দরকার হত দিত। এইভাবে ওদের দুজনের মধ্যে ঝুঁকি ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে দিনকে দিন ভালোবাসা গভীরতর হতে লাগল।

এক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে অবন্তীপুরের রাজা রামসিংহের বড়ো রানি মারা গেল। রামসিংহ লাবণ্যবতীর সৌন্দর্যের কথা অনেক আগেই শুনেছিল। সে ঠিক করল লাবণ্যবতীকে বিয়ে করে বড়ো রানির সম্মান তাকে দেবে। তার দূত এসে বিজয়পুরীর রাজাকে বলল, 'মহারাজ, অবন্তীপুরের মহারাজ আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চান। আপনি বিয়ে দিতে রাজি না হলে উনি আপনার দেশ আক্রমণ করবেন।'
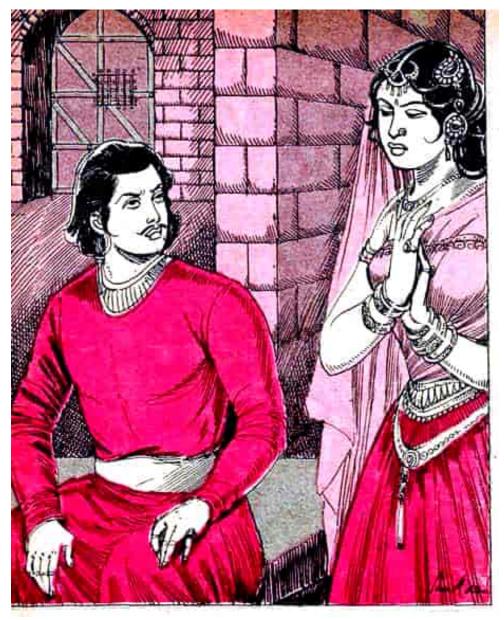
অবন্তীর রাজা ক্ষমতাবান ছিল। তাকে পরাজিত করার ক্ষমতা বিজয়পুরীর রাজার ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে বিজয়পুরীর রাজা নিজের কন্যা লাবণ্যবতীর সঙ্গে রাজা রামসিংহের বিয়েতে রাজি হলেন।

এই খবর কানে যেতেই লাবণ্যবতীর মনে হল যেন তার মাথায় বাজ পড়েছে। রামসিংহের মতো বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে বিয়ে করার চেয়ে তার কাছে মৃত্যু শ্রেয় মনে হল। সেই রাত্রে লাবণ্যবতী গোপনে কারাগারে নীলদত্তের সঙ্গে দেখা করে বলল সব কথা। তারপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে বলল, 'তাই ভাবছি, আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলুন আমরা দুজনে কোথাও পালাই। বলুন, আপনার কোনো আপত্তি আছে?'

নীলদত্ত সেই রাত্রে রাজকুমারী লাবণ্যবতীকে নিয়ে অন্য দেশে পাড়ি দিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ, রাজকুমারী লাবণ্যবতী এত ধনসম্পত্তি প্রাচুর্য, সুখ সব ছেড়ে কেন গেল নীলদত্তের সঙ্গে? সে কি জানত না যে নীলদত্ত বেকার যুবক ? কোনো কাজের যোগ্যতা তার মধ্যে যে নেই তা কি সে জানত না? আর নীলদত্তও এর আগে পালানোর সুযোগ পেয়ে না পালিয়ে পরে পালাতে রাজি হল কেন? নীলদত্ত কি এক বারও ভেবেছে রাজকুমারীকে কোথায় রাখবে? কী খাওয়াবে?

নাকি ভালোবাসা তাদের বিচারবুদ্ধি লোপ করে ফেলেছিল? আমার এসব প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে এই মুহূর্তে চৌচির হয়ে যাবে।'

এ-কথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, 'নীলদত্ত নিজেকে ঘোষণা করেছিল বটে অকর্মণ্য বলে তাই বলে রাজকুমারী তাকে ভুল বোঝেনি। সে সত্যি যদি অকর্মণ্য হত তাহলে দেশত্যাগের শাস্তি উপেক্ষা করে সে আবার দেশে ফিরে আসত না। দেশে ঢুকলেও রাজমহলে ঢুকত না। আর তার চুরি করার ইচ্ছে থাকলে খাজানা ঘরে গিয়ে ঢুকত। রাজকুমারীর ঘরে ঢুকতে যেত না। রাজকুমারী লাবণ্যবতীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের আশাতেই সে কারাজীবন কাটাতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে রাজকুমারী ভালো ভাবেই বুঝেছিল যে বৃদ্ধ রাজার স্ত্রী হওয়ার চেয়ে যুবক নীলদত্তের হাত ধরে পাড়ি দেওয়া অনেক আনন্দের। জীবনের দুঃখদুর্দশা অনাহার সম্পর্কে রাজকুমারীর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই সে-বিষয়ে তার আতঙ্কেরও কোনো কারণ ছিল না। বাকি থাকে ভরণ-পোষণের প্রশ্ন। নীলদত্ত চুরি করে কোনোদিন ধরা পড়েনি। অতএব সে যেকোনো দেশে চুরি করতে পারবে।

বিক্রমাদিত্যের এভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে সেই গাছে গিয়ে উঠল।

২৩. মনের পরিবর্তন

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য যথারীতি গাছে উঠে গাছ থেকে শব নাবিয়ে আগের মতোই কাধে ফেলে হাঁটতে লাগলেন নীরবে। কিছুক্ষণ পরে শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার কাজে তোমার কঠোর পরিশ্রম সত্যি প্রশংসার। তবে ভয় হয় পাছে তুমিও বদলে যাও। ভাবি অবন্তী নগরের যুবরাজ অমরধ্বজের মতো তোমারও মনের পরিবর্তন হবে কি না। অমরধ্বজের কাহিনি বলছি। শুনতে শুনতে হাঁটলে হাঁটার পরিশ্রম কমে যাবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীন কালে অবন্তী নগরের প্রান্তে বিরাট এক অরণ্য ছিল। বিরাট বিরাট ভয়ংকর জীবের লঙ্গে লড়াই করে সেই অরণ্যে থাকত ভীল জাতের কয়েকটি পরিবার। অন্য অঞ্চলের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। নিজেদের খাবার নিজেদেরই একরকম যুদ্ধ করে জোগাড় করে নিতে হত। প্রাণ রাখতে তাদের প্রাণান্ত হতে হত। নিজেদের অঞ্চলে ওরা সীমাবদ্ধ থাকত। বাকি পৃথিবীর খবর তাদের কাছে ছিল অজানা। অরণ্যের জন্তুজানোয়ারদের হাত থেকে ওরা বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করত। ওদের হাত থেকে জন্তুজানোয়ারগুলোও বাঁচার চেষ্টা করত। ওদের এক পক্ষের আঘাতে অন্য পক্ষের মৃত্যুও ঘটত। ভীল অঞ্চলের সবাই একজনকে নেতা হিসেবে মানত। তার কথামতো ওরা প্রত্যেকে চলত।

অবন্তী নগরের যুবরাজ ছিল খুব সাহসী এবং শক্তিশালী। বহু বার সে কোনো অস্ত্র ব্যবহার না করে হিংস্র জন্তুকে খালি হতে মেরে ফেলেছিল। বড়ো বড়ো বাঘ বা সিংহকে খালি হাতে ধরা বা মেরে ফেলা তার পক্ষে এমন কোনো শক্ত কাজ ছিল না।

একবার এক বাঘ মারতে গিয়ে ব্যর্থ হল। বাঘ তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে লাগল। অমরধ্বজের মনে জিদ চাপল। সে-ও ছাড়ার পাত্র নয়। বাঘের পিছনে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে সে ভীল অঞ্চলে পৌঁছে গেল। অরণ্যের ওই অঞ্চলে যে জনমানব ছিল সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। এদিকে সেদিকে তাকাতে তাকাতে তার নজরে পড়ল এক অপূর্ব সুন্দরী জীবন্ত দৃশ্য। দেখল এক সুন্দরী যুবতী বাঘের বাচ্চার সঙ্গে খেলা করছে। এই ধরনের একটি ঘটনা অমরধ্বজ দেখা তো দুরের কথা কোনোদিন ভাবতেও পারেনি। ভীল কন্যা ও অমরধ্বজ একে অন্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোনো গয়নাগাটি না পরা অবস্থায়ও যে কোনো রমণীকে এত সুন্দর দেখায় তা যেন যুবরাজ ভেবেও ভাবতে পারল না। ভীল ছাড়া অন্য কোনো জাতের মানুষকে ভীল কন্যা দেখেনি কোনোদিন। তাই তার কাছে যুবরাজ এক বিস্ময়। গায়ের রঙে রূপে এ যেন তাদের মতো নয়। অন্য এক জগতের মানুষ। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল হয়তো এ কোনো দেবতা। তাই সে ছুটে গেল সবাইকে খবরটা দিতে। যুবরাজও তাকে অনুসরণ করল। অল্পক্ষণের মধ্যে ভীলেরা যুবরাজ অমরধ্বজকে ঘিরে ফেলল। যুবরাজ ঠিক এই অবস্থার জন্য যেন প্রস্তুত ছিল না। পরমুহূর্তে সে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'আমি অবন্তী নগরের যুবরাজ। কারো আপত্তি যদি না থাকে তো আমি এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

এ-কথা শুনে ভীলেরা অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর তাদের ভিতর থেকে এক বৃদ্ধ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে অমরধ্বজকে তাদের নেতার কাছে নিয়ে গেল। ভীল নেতা যুবরাজের বক্তব্য শুনে বলল, 'এই মেয়েকে বিয়ে করতে হলে তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। রাজি আছ?'

সাহসী যুবরাজ পরীক্ষা দিতে রাজি হয়ে গেল।

'তাহলে চল।' বলে ভীল নেতা তাকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে গেল। পরে ভীলেরা সবাই এসে সারি বেঁধে দাঁড়াল। সেই সারিতে বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতী সবাই ছিল। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে

লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে এল এক বিরাটাকায় শক্তিশালী মানুষ। হাতির শরীরের মতো বিরাট শরীর তার। তাকে দেখে অমরধ্বজের ঈর্ষা জাগল। তাকে দেখে অসহ্য লাগল যুবরাজের।

ওই লোকটাকে দেখিয়ে ভীল নেতা অমরধ্বজকে বলল, 'আমাদের মধ্যে এর চেয়ে শক্তিশালী লোক আর নেই। এই মেয়েকে বিয়ে করতে হলে তোমাকে এর সঙ্গে লড়তে হবে। একে হারিয়ে দিলে তাবেই বিয়ে করতে পারবে। তা না হলে পারবে না।'
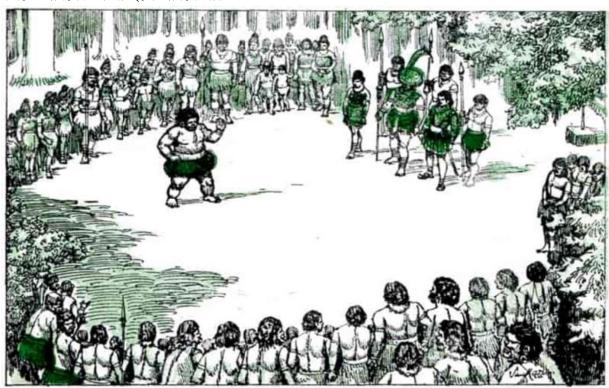
অমরধ্বজ ভীল নায়ককে বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে এই ধরনের পরীক্ষা নেওয়া অনুচিত। তোমাদের এই আচার অত্যন্ত খারাপ। এই লোকটাকে হারানোর জন্য দরকার পশুশক্তি। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে দেখা উচিত পাত্রের গুণ আর রূপ।'

'আমরা অরণ্যের বাসিন্দা। আমরা তোমাদের রীতিনীতি জানি না। আমাদের মত অনুযায়ী এর সঙ্গে লড়তে রাজি না হলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পার।' ভীল নায়ক বলল।

এ-কথা শুনে অন্যেরা হাসল।

'আমি ওর সঙ্গে লড়তে রাজি আছি।'

বলল অমরধ্বজ। মুহূর্তে সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কঠিন নীরবতা বিরাজ করতে লাগল চারদিকে।

শুরু হল দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি। বেশিক্ষণ হল না। হটাৎ লোকটা অমরধ্বজকে ধরে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। সবাই হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। গোটা অঞ্চল আনন্দমুখর হয়ে গেল। ভীল কন্যাও আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

লড়তে গিয়ে অমরধ্বজ টের পেল যে ভীলদের ওই লোকটাকে যত বড়ো ওস্তাদ ভেবেছিল তত বড়ো সে নয়। তার গায়ে হাতির শক্তি ছিল বটে তবে বুদ্ধিতে সে ছিল খাটো। কুস্তির মারপ্যাচ সে কিছুই জানত না। যার ফলে গায়ের জোরে অমরধ্বজকে কাবু করে ছুঁড়ে ফেলতে পারল। প্রচণ্ড শক্তিতে অমরধ্বজের উপর ঝাপিয়ে পড়তে এলে যুবরাজ চট করে সরে গেল। ফলে নীচে পড়ে গেল লোকটা। তৎক্ষণাৎ অমরধ্বজ

শক্তি এবং চমৎকার প্যাচের মাধ্যমে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারল। সেখান থেকে। কোনোরকমে উঠে এসে আবার সে অমরধ্বজকে আক্রমণ করল। এবারে আর পারল না। অমরধ্বজ আর এক প্যাচ কষে তাকে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল। সবাই আর একবার হাসতে হাসতে হাততালি দিতে লাগল। ওই ভীল কন্যাও আনন্দে হাততালি দিল। ওদিকে লোকটা মুখ দিয়ে রক্ত তুলে মারা গেল।

ভীল নায়ক তখন অমরধ্বজের কাঁধ চাপড়ে বলল, 'তুমি সত্যিকারের যোদ্ধা। আমাদের মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পার। এখন তোমাদের দুজনের বিয়ে হতে পারে।'

'আমি আর এই মেয়েকে বিয়ে করব না। আমাকে ফিরে যেতে দাও।' অমরধ্বজ বলল ভীল নেতাকে।

অমরধ্বজের কিছু দূর যাওয়ার পর আবার ওরা সবাই তাকে ঘিরে ফেলল। ওদের নায়ক বলল, 'দেখ ভাই, তুমি যাকে ছুঁড়ে মেরে ফেললে সেই লোকটাই এই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। অন্য যারা চেয়েছিল তাদের অনেককেই সে হয় শোচনীয়ভাবে মারধোর করেছে নয় মেরে ফেলেছে। এই কথা তোমাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করছি। আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার।' বলল ভীল নায়ক।

ভীল নায়কের কথার পরে ওরা সবাই সরে গিয়ে তার যাওয়ার পথ ছেড়ে দিল। তখন অমরধ্বজ বলল, 'আমি এখন যাব না। আমি এই মেয়েকেই বিয়ে করব।'

ভীল নায়ক ওদের দুজনের বিয়ে দিয়ে ওই মেয়েকে অমরধ্বজের সঙ্গে তার দেশে পাঠিয়ে দিল।

বেতাল এই কাহিনি বলে বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'রাজা, অমরধ্বজ একবার বিয়ে করতে চাইল আবার বিয়ে করতে গররাজি হল কেন? সে কি ভেবেছিল যে তাকে যেতে দিয়ে পিছন দিক থেকে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে? মৃত্যুভয়ে সে বিয়ে করতে রাজি হল? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বিক্রমাদিত্য জবাবে বললেন, 'ওই ভীল কন্যাকে বিয়ে করতে হলে এক পশুশক্তির মোকাবিলা করতে হবে জেনেই অমরধ্বজের মনে তাদের আক্ষ্ম চারবিচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জেগেছিল। তখনই সে ঠিক করে ফেলেছিল বিয়ে করবে না। মেয়েটির ভাবী বরের মৃত্যুতেও হাসতে হাসতে হাততালি দেওয়া তার ভালো

লাগল না। তবু অমরধ্বজ তাকে বিয়ে করতে রাজি হওয়ার কারণ হল মেয়েটার ভাবী বরকে সে হত্যা করেছে। বীরকে ওই মেয়েটা বিয়ে করতে চায়। তার কপালে আর বীর নাও জুটতে পারে। তাই যুবরাজ আর একবার ভেবে নিজের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করল এবং ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

২৪. পরিশ্রমের ফল

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ওই গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছের উপর উঠে সেখান থেকে শব নিয়ে গাছ থেকে নেমে সোজা শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি এত পরিশ্রম করছ যে বলার নয়। কিন্তু হয়তো জানো না, এই জগতে পরিশ্রম করে একজন তার ফল ভোগ করে অন্য জন। এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটি কাহিনি বলছি, শোন। এতে তোমার পরিশ্রম লাঘব হতে পারে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল : প্রাচীন কালে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। বহু বছর পরে তার একটি মেয়ে হল। রাজার একমাত্র মেয়ে আদরে লালিতপালিত হল। সবরকমের শিক্ষা যাতে তার হয় সে-বিষয়ে রাজার চেষ্টার অন্ত ছিল না। রাজকন্যা যথাসময়ে বড়ো হলে রাজার মনে তার বিয়ের চিন্তা ঢুকল।

রাজা তার মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্রের খোঁজ করতে শুরু করবেন এমন সময় রাজকুমারীর এক বিচিত্র রোগ ধরল। খেত না, ঘুমোত না। সবসময় বিড়বিড় করে কী যে বকত তা সে নিজেই জানে না। কত বৈদ্য এল কত ওষুধ দেওয়া হল কিন্তু রাজকুমারীর রোগ সারল না। রাজার অশান্তি দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল। তারও ঘুম খাওয়া ডকে উঠল।

কিছুতেই যখন রাজকুমারীকে সারানো গেল না তখন রাজা নিজের দেশে এবং অন্য দেশে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করল। যে তার মেয়ের রোগ সারিয়ে দেবে সে রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পারবে এবং তার পরে ওই দেশের রাজা হতে পারবে।

এই ঘোষণা শুনে দেশ-বিদেশ থেকে কত বৈদ্য এল কিন্তু কেউ রাজকুমারীর রোগ ধরতেই পারল না, সারানো তো দূরের কথা।

এমন সময়ে দেশের শেষ প্রান্তের এক মন্দিরে এক সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গাড়ল। ওই সন্ন্যাসী দেশের বিভিন্ন লোকের নানান ধরনের রোগ সারাতে লাগল। এই কথা খুব তাড়াতাড়ি রাজার কানে গেল। রাজা জানতে পারল যে ওই সন্ন্যাসী ওই মন্দির ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চায় না। তাকে অন্য কোনো জায়গায় কেউ নিয়ে যেতে পারে না। তখন বাধ্য হয়ে রাজা সপরিবারে ওই সন্ন্যাসীর কাছে গেল।

সন্ন্যাসী রাজকুমারীকে দেখে বলল যে তার কোনো অসুখ নেই। শুধু এক ব্রহ্মরাক্ষসী তাকে জ্বালাচ্ছে। সেই তার উপর ভর করে রাজকুমারীকে দিনের পর দিন কষ্ট দিচ্ছে এবং ভীষণ ভোগাচ্ছে।

'ওই ব্রহ্মরাক্ষসীর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় কী?' রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল।

'মহারাজ, কাল থেকে আপনার মেয়ের হাত দিয়ে ব্রাহ্মণদের দানধর্ম করান। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা যা চাইবে তাই মেয়ের হাত দিয়ে দান করুন। সে যে ব্রাহ্মণকে দান করতে রাজি হবে না সেই ব্রহ্মরাক্ষসীকে তাড়াতে পারবে।' সন্ন্যাসী বুঝিয়ে বলল।

রাজা তার পরের দিন মেয়ের হাত দিয়ে দানধর্ম আরম্ভ করালেন। কাতারে কাতারে ব্রাহ্মণ আসতে লাগল। রাজকুমারী কোনো ব্রাহ্মণকেই দান করতে গররাজি হল না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ অনেক দান নিয়ে ফিরতে লাগল।

এ ভাবে এক বছর কেটে গেল। একদিন এক ব্রাহ্মণ দান নেবার আশায়। এল। তাকে অনেক দূর থেকে দেখতে পেয়েই রাজকুমারী চিৎকার করে বলল 'ওকে যেতে বল, ওকে আমি দেব না। যেতে বল।' বলতে বলতে রাজকুমারী অন্দরমহলে চলে গেল।

রাজা ওই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আপনি কি মন্ত্র জানেন? আমার মেয়েকে এক ব্রহ্মরাক্ষসী বহু বছর ধরে জ্বালাচ্ছে। আপনি কি তাকে ছাড়াতে পারেন?'

ওই ব্রাহ্মণ রাজকুমারীর ঘাড় থেকে ব্রহ্মরাক্ষসীকে নাবাল। রাজকুমারী সেরে উঠল। রাজা ভাবল ওই ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দেবে। ঠিক সেইসময় ওই সন্ন্যাসী এসে রাজাকে বলল, 'রাজা, আপনার মেয়ের সঙ্গে আমারই বিয়ে দেওয়া উচিত। ন্যায় বিচারে আপনার পরে আমারই এই দেশের রাজা হওয়া উচিত।'

রাজা ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দিল এবং ওই ব্রাহ্মণকে হাজার মুদ্রা দিয়ে বিদেয় করল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, ওই রাজা এত বড়ো অন্যায় কাজ করল কেন? ঘোষণা মতো কাজ করল না কেন? ব্রাহ্মণের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিল কেন? রাজা

কি সন্ন্যাসী অভিশাপ দিতে পারে ভাবল? সন্ন্যাসীকে জামাই বানাতে রাজার ভালো লাগল ? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বেতালের কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'ঘোষণা অনুযায়ী রাজা ব্রাহ্মণের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিত। কিন্তু সন্ন্যাসী এসে তার ভুল ভেঙে দিল। ঘোষণার মর্মার্থ রাজা বুঝতে পারল। রাজকুমারীর ঘাড় থেকে যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মরাক্ষসীকে নাবাল সে কিন্তু রাজকুমারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে আসেনি। দান নিতে এসেছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর ব্যাপার আলাদা। সেই জানিয়েছিল কীভাবে কী করলে রাজকুমারী সেরে উঠবে। টানা একবছর ধরে রাজকুমারীকে বিয়ে করার আশায় অপেক্ষা করেছিল সন্ন্যাসী। এবং ঠিক সময়ে হাজির হয়ে রাজাকে নিজের মত জানাল। রাজা বুঝল যে রাজকুমারীর রোগ সেরে ওঠার ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীরই অবদান বেশি আছে। ব্রাহ্মণ নিমিত্ত মাত্র।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে গায়েব হয়ে আবার সেই গাছে উঠে পড়ল।

২৫. বন্ধুবিচ্ছেদ

বিক্রমাদিত্য প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন। যা একবার বলেছেন তা কার্যকরী না করে ছাড়ার পাত্র তিনি নন। তাই প্রত্যেক বারের মতো এবারও বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে গিয়ে গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতো নীরবে পথ চলতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি হয়তো কোনো বন্ধুকে খুশি করার জন্য এত কষ্ট করছ। কিন্তু মনে রেখো কোন বন্ধুত্ব যে আজীবন টিকবে তা কেউ বলতে পারে না। তোমাকে এক বন্ধুবিচ্ছেদের কাহিনি বলব। শুনে তোমার পরিশ্রম কমবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল :

প্রাচীন কালে শংকর ও কেশব নামে দু-জন বন্ধু ছিল। ওরা তেমন ধনী ছিল না। ওরা যখন বড়ো হল তখন তাদের কাঁধে সংসারের দায়িত্বভার পড়ল। তখন দু-জনে ঠিক করল সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে ব্যাবসা করবে।

অল্পদিনের মধ্যেই তাদের ব্যাবসা বেশ জমে উঠেছিল। ওরা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ব্যাবসার প্রসার করতে লাগল। শংকরের ছিল এক ছেলে আর কেশবের ছিল এক মেয়ে। ওরা দুজনে একসঙ্গে খেলা করত। দু-জনে একে অন্যকে ভালোবাসত। একে অন্যের খেলার সাথী ছিল। এসব লক্ষ করে শংকর তার ছেলের সঙ্গে কেশবের মেয়ের বিয়ে দেবে ঠিক করল। কেশব এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হল। তারপর ওদের বিয়ের বয়স হওয়ায় বিয়ের দিনক্ষণ দেখবে ঠিক করছে এমন সময় সমুদ্রে শংকরের মাল বোঝাই জাহাজ ডুবে গেল। শংকরের যত জাহাজ ছিল সব ডুবে গেল।

এই খবর শুনে শংকর হতাশায় ভেঙে পড়ল। যারা তার কাছে যত টাকা পেত তারা সব টাকা তার কাছে থেকে চেয়ে নিল। ফলে শংকরের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেল। তার অবস্থা এত পড়ে গেল যে সেই গ্রামে আর মাথা উঁচু করে চলা তার পক্ষে সম্ভব হল না। শেষে সে একদিন স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে গ্রামের বাইরে চলে গেল।
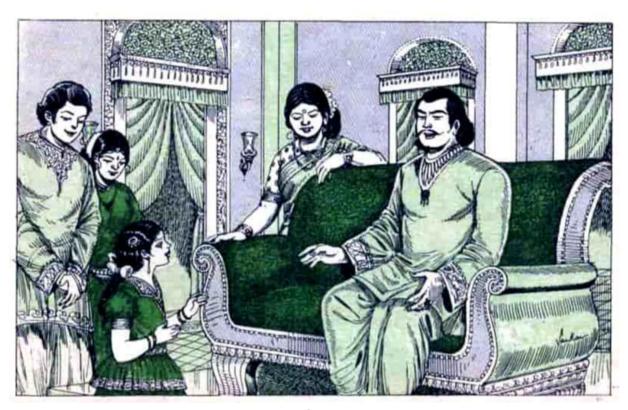
ওর চলে যাওয়া লক্ষ করে কেশব তাকে বলল, 'কী হল? কথা ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে। যাবে যখন ঠিক করেছ আমি বাধা দেব না, তবে ছেলে-মেয়ের বিয়ের শুভ কাজটা সেরে গেলেই পারতে।'

'আমার এখন ধান ফেলতে ভাঙা কুলো অবস্থা। আমার মনে হয় সম্পত্তির দিক থেকে তোমার সমকক্ষ পরিবারের ছেলের সঙ্গেই তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত।' বলল শংকর।

'তা কেন? তোমার সম্পত্তি জলে ডুবে গেছে তো হয়েছেটা কি? আমার তো আছে! আমরা কি ধনী হিসেবে জন্মেছি। এখন আমাদের ছেলে-মেয়েরা ভালোভাবে থাকলে তাতেই আমাদের আনন্দ।' কেশব বলল।

কিন্তু শংকর কোনোক্রমেই এই প্রস্তাবে রাজি হল না। শত অনুরোধ করলেও কোনো মতেই শংকর রাজি হল না।

শংকর দক্ষিণ দেশের মানিক্য নগরে পৌঁছাল। এক রত্ন ব্যবসায়ীর কাছে বাপ আর ছেলে চাকরি নিল। দুজনে ঐকান্তিকতার সঙ্গে তার অধীনে কাজ করতে লাগল। ব্যাবসার ক্ষেত্রে থাকার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ভদ্র ব্যবহারের ফলে শংকর ও তার ছেলের পরিচিতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুদিন পরে তারা দুজনে নিজেরাই একটা ব্যাবসা করতে শুরু করল। তাদের ব্যাবসা ভালো জমে উঠল।

শংকর তার সমকক্ষ এক পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিল। অল্প কয়েক মাস পরে নাতনির মুখও দেখল শংকর। নাতনির নাম রাখল মালতী। মালতী জন্মের পর শংকরের ব্যাবসা যেন আরও সমৃদ্ধ হতে লাগল। খুব তাড়াতাড়ি সে আগের মতো ধনী হয়ে গেল।

শংকরের চলে যাওয়ার পর কেশব নিজের মেয়েকে অন্য এক ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিল। ওই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তাদের এক ছেলে হল। ছেলের নাম রাখল বসন্ত।

বসন্ত বড়ো হলে একবার বসন্তের বাবা কেশবকে বলল, 'শ্বশুর মশাই, আরব দেশে আমাদের এখানকার জিনিসের ভালো দাম পাওয়া যায় শুনেছি। আর ফেরার সময় আরবের খেজুর ও শিলাজিত আনা যাবে।

ওগুলো ওখানে খুব সস্তা, এখানে অনেক দামে বিক্রি করে আমরা কোটিপতি হতে পারব।'

কেশব তাতে রাজি হল। প্রয়োজনীয় উট জোগাড় করে আরবে বিক্রি করার যোগ্য জিনিসপত্র কিনে উটের পিঠে চাপাল কেশব ও বসন্তের বাবা। ওরা দু-জনে সপরিবারে রওনা হল আরব দেশের দিকে।

মরুযাত্রা কিছুদিন ধরে ভালোই চলল। একদিন গভীর রাত্রে একদল ডাকাত এসে তাদের মেরে উটসহ সমস্ত জিনিস নিয়ে পালিয়ে গেল। কেশবের নাতি বসন্ত ছাড়া বাকি সবাই ডাকাতদের আক্রমণের কবলে পড়ল। প্রত্যেকেই ডাকাতদের ছোরা আর তরবারির আঘাতে মারা গেল। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে কোনোরকমে বসন্ত মরুভূমির বাইরে এল। বসন্তের ইচ্ছে করল না দেশে ফিরে যেতে। সেখানে তার আপনজন কেউ নেই। সে আপন খেয়ালে যেখানে যা পেত খেত, যেখানে জায়গা পেত রাত্রে ঘুমোত। যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াত।

বসন্ত কয়েক বছর এইভাবে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়িয়ে শেষে সে মাণিক্য নগরে পৌঁছাল। সে শংকরের দোকানের সামনে এসে, 'বাবু, আপনার দোকানের কোনো কাজ করতে দেবেন? একটা চাকরি দেবেন বাবু?'

না খেতে পাওয়া ওই রোগা দুর্বল শরীরের বসন্তকে কাছে ডেকে শংকর লক্ষ করল ছেলেটার আদলে কেশবের ছাপ আছে। সে বসন্তকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তুমি কোত্থেকে এসেছ? তোমার বাবার নাম কী? কী হয়েছে তোমাদের?' অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে শংকর বসন্তকে অনেকক্ষণ ধরে নানা প্রশ্ন করল।

বসন্ত তাদের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলল।

সব কথা শুনে দুঃখে শংকর বিহ্বল হয়ে বলল, 'বাবা, তোমার দাদু আমার বন্ধু ছিল। আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তুমি আমার কাছেই থেকে যাও। তোমাকে ব্যাবসা শেখাব।'

বসন্তের কথা শুনে শংকর বুঝতে পারল ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান এবং চালাক চতুর। তার এবং কেশবের পরিবারের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যাতে একটা সম্পর্ক থাকে তারজন্য বসন্তের সঙ্গে নিজের নাতনি মালতীর বিয়ে দিল। ওরা দুজনে সুখে শান্তিতে দিনযাপন করতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, শংকরের এ কোন বিচিত্র ব্যবহার। সে নিজে যখন নিঃস্ব ছিল তখন কেশবের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিল না অথচ কপর্দকহীন বসন্তের সঙ্গে নাতনির বিয়ে দিল! এ কী ধরনের ব্যাপার? কেশবের মেয়েকে বউমা করে বাড়িতে আনলে কেশবের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের বন্ধন কি আরও দৃঢ় হত না? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও তুমি সমাধান না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।' জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, শংকর সবসময় কেশবকে গভীরভাবে ভালোবাসত। তবে শংকর ছিল খুব অভিমানী। তাই কেশবের প্রস্তাব তার কাছে মনে হল তার দয়া। বন্ধুত্বের মধ্যে আর্থিক

সম্পর্কের কোনো স্থান শংকরের পছন্দ নয়। এক পর্যায়ে থাকলে কেশবের মেয়েকে সে নিশ্চয়ই ঘরে বউমা করে আনত। কিন্তু তা হল না। কেশব যখন সব হারাল তখন তার নাতির সঙ্গে নিজের নাতনির বিয়ে দিয়ে হারানো বন্ধুত্বের কিছুটা ফিরে পেল শংকর।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

২৬. রাজকুমার

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ওই গাছের কাছে এসে, গাছের উপরে উঠে, শব নাবিয়ে, কাঁধে ফেলে আগের মতো নীরবে হাঁটতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শবেস্থিত বেতাল বলল, ‘রাজা, তোমাকে কি কোনো রাজকুমারী পরীক্ষা করেছ? তা তো নয়। আর যদি করেও তাহলে সেই পরীক্ষায় যোগ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। কত লোক যোগ দেয়। কে যে কোন কারণে জয়ী হয় তা কেউ বলতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তোমাকে হিমবাহুর কন্যা হিমানীর স্বয়ংবর সভার কাহিনি বলছি। শুনলে তোমার এই পথ চলার কঠিন পরিশ্রম কমে যাবে।' বেতাল বলল :

অনেকদিন আগে হিমালয়ের এক দুর্গম অঞ্চলে হিমগড় নামে এক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের চারদিকে ছিল উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি। একটি মাত্র সরু গিরিপথ দিয়ে সেই রাজ্যে ঢোকার পথ ছিল। ফলে কারও পক্ষে সেই রাজ্যে ঢোকা সহজ ছিল না। জীবন বিপন্ন করে ঢুকতে হত।

হিমগড় রাজ্যের রাজা ছিল হিমবাহু। তার হিমানী নামে এক মেয়ে ছিল। রাজার আর কোনো সন্তান না হওয়ায় রাজার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল হিমানী। রাজার মৃত্যুর পর সেই পাবে দেশের সমস্ত কিছুর ভার।

ষোলো বছর পূর্ণ হতেই হিমবাহু মেয়ের বিয়ের চিন্তা করতে লাগল। হিমানীর জন্য যোগ্য পাত্রের খোঁজ করা তার কাছে এক বিরাট সমস্যার মতো লাগল। হিমানীকে যে বিয়ে করবে সে রাজকুমার না হলে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে হিমানীকে সাহায্য করতে পারবে না। হিমগড় এমন একটা দেশ যেখানে অন্য দেশের লোকের যাতায়াত নেই বললেই চলে। অন্য দেশের মানুষ অত কষ্ট করে হিমগড়ে আসতেও চায় না।

তবে হিমবাহুর কাছে পায়রা ছিল। তারা চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে পারত। যোগ্য বরের যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বহু চিঠি পায়রার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল চারদিকে। পায়রাগুলো নানান দেশের দিকে উড়ে গেল সেই চিঠি নিয়ে। যাকে যাকে চিঠি দিয়ে আসার তাকে তাকে দিয়ে এল।

সেই কালে সমুদ্রতীরে সমতাত নামে এক দেশ ছিল। একদিন রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বন্যার তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে যায়। রাতারাতি সমস্ত দেশের চেহারা বদলে গেল রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়ে গেল। ঘরবাড়ি সব ভেঙেচুরে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। সেই বিপর্যয়ের মুখে পড়েও সমতাত রাজার রাজকুমার সমুদ্রসেন তীরে আছাড় খেয়ে পড়ে রইল। তার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর।

সমুদ্রসেন বৌদ্ধ মঠে থেকে লেখাপড়া করতে লাগল। এক বন্যায় সমতাত দেশের সব কিছু ধুয়ে-মুছে যাওয়ায় সে সেই মঠেই লালিতপালিত হতে লাগল। তার অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। বৌদ্ধ মঠে যারা আসত তারা নানা বিদ্যায় দক্ষ ছিল। প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু না কিছু শেখার সুযোগ পেত সমুদ্রসেন। অনেক কিছু তার জানা হয়ে গেল। এমনকী জাদুও তার অজানা ছিল না।

এইভাবে নানা বিদ্যা অর্জনের মধ্য দিয়ে ভালো পরিবেশে সে বাড়তে লাগল।

সমুদ্রসেনের অন্য কোনো দিকে নজর ছিল না। তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। ছিল বিদ্যা অর্জনের দিকে। সে সবসময় সেই চিন্তা নিয়েই থাকত।

তার বয়স হল কুড়ি। সেইসময় হিমানীর বিয়ের খবর দেশে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক রাজকুমার হিমগড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হয়ে ফিরে গেল। সে কথা প্রচার হয়ে গেল। কীভাবে কীভাবে যেন খবরটা বৌদ্ধ মঠেও পৌছাল। সমুদ্রসেন শুনে ঠিক করল হিমগড়ে যাবে। হিমানীকে বিয়ে করবে। মঠাধিপতির কাছে গিয়ে সে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করল। শুনে মঠাধিপতি বলল, ‘যাও। অবশ্যই যাও। কেন যাবে না? তুমি তো রাজকুমার। এক রাজকুমারের যত রকমের গুণ থাকে আমরা তোমাকে তার প্রত্যেকটা শিখিয়েছি। কিন্তু মনে

রেখো, দুর্গম পথ। দুস্তর অঞ্চল। একটি মাত্র পথ আছে। তাও আছে। বিপদের পাহাড় মাথায় নিয়ে। হিংস্র জন্তুদের আক্রমণের ভয়ও আছে। এত অসুবিধা থাকাতেই কেউ সহজে হিমগড় পৌঁছাতে পারে না। একমাত্র গণ্ডার নাকি সেই পথে যেতে পারে।'

পরদিন জাল পেতে এক গণ্ডার ধরল সমুদ্রসেন। কয়েক দিনের চেষ্টায় তাকে পোষ মানালো। এক সপ্তাহ পরে সমুদ্রসেন মঠের প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গণ্ডারে চড়ে রওনা হল।

তিন সপ্তাহের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে সে হিমগড়ে পৌঁছাল। সে গিয়ে দেখে তার আগেই রত্ন দেশের রাজার ছেলে হীরককুমার পৌঁছে গেছে। দু-জনের মধ্যে রাজার অতিথিশালায় আলাপ-পরিচয় ও কথাবার্তা হল।

'আপিন এখানে কীভাবে পৌঁছাতে পারলেন? কবে এলেন?' সমুদ্রসেন হীরককুমারকে জিজ্ঞেস করল।

'বিমানে এসেছি। আমার দেশে এক নাম করা শিল্পী আছে। সেই বানিয়ে দিয়েছে। কুড়িটি হংস আমাকে বিমানে করে এখানে এনেছে।' বেশ অহংকারের সঙ্গে বলল হিরককুমার।

'দুটো রাজকুমার এসে গেছে, এখন কী করা যায় মন্ত্রী ?' হিমবাহু জিজ্ঞেস করল মন্ত্রীকে।

আড়াল থেকে হিমানী বলল, 'যা করতে হবে আমি করব। ব্যাপারটা, বাবা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিতে পারেন।'

'তুমি কী করবে মা? রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল।

'একটা পরীক্ষা নেব। কী ধরনের পরীক্ষা নেব তা তুমিও দেখতে পাবে।' বলল রাজকুমারী হিমানী।

রাজা ওই দুই রাজকুমারকে দিন কয়েক বিশ্রাম করতে বলল ওই অতিথিশালায়। রাজকুমারী নিজেই নিজের বর বাছাই করে নেবে এবং তারজন্য তাদের প্রস্তুত থাকতেও বলে দিল রাজা হিমবাহু।

হিরককুমার ও সমুদ্রসেন রাজকুমারী হিমানীকে তখনও দেখেনি।

একদিন সকালে রাজকুমারীর পরিচারিকা এসে হিরককুমারকে রাজার উদ্যানে নিয়ে গেল। আড়াল থেকে সে হিমানীকে দেখে নিল। রাজকুমারী একটি গাছের নীচে বসে ফল খাচ্ছিল। গাছটা ছিল বাতাবি নেবুর। গাছ

বাতাবি নেবুর ভারে নুয়ে পড়েছিল। হিমানী বাতাবি নেবুই খাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সে একটি বাতাবি নেবু অমৃত ফলের গাছের দিকে ছুঁড়ে মারল। তৎক্ষণাৎ পরিচারিকারা তাকে অমৃত ফলের গাছের নীচে তার শোওয়ার ব্যবস্থা করল। হিমানী সেখানে শুলো। তারপর যে পরিচারিকা হিরককুমারকে এনেছিল সেই তাকে নিয়ে অতিথিশালায় ফিরে গেল।

পরের দিন সেই পরিচারিকা এসে সমুদ্রসেনকে নিয়ে গেল। হিরককুমার যা যা দেখল সমুদ্রসেনও একই দৃশ্য ও কাজকর্ম দেখতে পেল। তারপর ফিরেও এল।

'রাজকুমারী হিমানী বাতাবি নেবু খুব পছন্দ করে।' বলল হিরককুমার। 'হতে পারে।' সমুদ্রসেন বলল। ইতিমধ্যে রাজকুমারীর পরিচারিকা ঘুরে এসে বলল, 'কাল সকালে রাজকুমারী প্রত্যেককে আলাদা আলাদা দেখবেন। আপনারা কে কোন উপহার দেবেন তা ঠিক করে রাখুন। কারণ দেয় উপহারের ভিত্তিতেই বর বাছাই নির্ভর করছে।' বলে অন্য কোনো কথা না বলে পরিচারিকা চলে গেল।

ওর চলে যাওয়ার পর দুই রাজকুমার চিন্তায় পড়ে গেল। দুজনের মধ্যে কোনো কথা হল না। সোজা যে-যার ঘরে চলে গেল। ভাবতে ভাবতে তারা কুলকিনারা পেল না। সারারাত ভাবতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও তারা ঘুমোতে পারল না।

সকালে পরিচারিকা এসে হিরককুমারকে নিয়ে রাজকুমারীর মন্দিরে নিয়ে গেল। হিরককুমার নিজের পোশাকের ভিতরে একটা বাতবি নেবু লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে সেটাই রাজকুমারীকে উপহার দিল। রাজকুমারী সাদরে তা গ্রহণ করে হিরককুমারের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে তাকে বিদায় দিল। হিরককুমারের নিশ্চিত ধারণা হল যে রাজকুমারীর মনের মতো জিনিসই সে দিতে পেরেছে। সে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অতিথিশালায় ফিরে এল।

তারপর সমুদ্রসেনের পালা। সে-ও একটা বাতাবি নেবু বের করল। সেটা একটা কাঠের উপর রেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে বাতাবি নেবুটাকে ঢাকল। কিছুক্ষণ পরে সে ওই রুমাল তুলে নিতেই দেখা গেল সেখানে বাতাবি নেবুর পরিবর্তে অমৃত ফল আছে। হিমানী চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল।

হাসিখুশি ভাব দেখে সমুদ্রসেন বুঝল যে রাজকুমারী সহজসরল মনে সব বিশ্বাস করেছে। তাই সে বলল, 'একটু জাদুর সাহায্য নিয়েছি।'

হিমানী ঘোষণা করে দিলে যে সে সমুদ্রসেনকেই বরণ করে নিয়েছে। তারপর হিরককুমার হতাশ হয়ে ফেরার মুখে সমুদ্রসেনকে জিজ্ঞেস করল, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা কাণ্ড করে বাতাবি নেবুকে অমৃত ফলে রূপান্তরিত করেছ। কী করে করলে বল না ভাই?'

'কীভাবে কী করেছি, বলছি। বাতাবি নেবুকে চিরে তার ভেতরের কোওয়া বের করে তাতে অমৃত ফল ঢুকিয়ে দিয়েছি। এক হাতে ওটাকে হিমানীকে দেখিয়ে অন্য হাতে ঢেকে দিলাম সেটা রুমাল দিয়ে। পরে রুমাল তোলার সময় বাঁ-হাতে অমৃত ফল ধরে চোকলাটাকে রুমাল দিয়ে এমনভাবে তুললাম যাতে রাজকুমারীর চোখে চোকলাটা না পড়ে।'

শুনে, 'এই তোমার জাদু', বলে সোজা বিমানে উঠে চলে গেল হিরককুমার। তারপর হিমানীর সঙ্গে সমুদ্রসেনের বিয়ে হল।

বেতাল এই কাহিনি বলে রাজাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজা, রাজকুমারী হিমানীর বর বাছাই সম্পর্কে তোমার মত কী? রাজার কাছে পরীক্ষা করে বর বাছাই করার কথা বলে শেষে কিনা সামান্য জাদু খেলা দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল। আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাজকুমারী পরীক্ষা নিয়েছে বই কী। তার বাতাবি নেবু খাওয়া এবং তা অমৃত ফলের গাছের দিকে ছুঁড়ে সেখানে বিশ্রাম করা দুটো রাজকুমারেরই নজরে পড়েছিল। কিন্তু তার অর্থ হীরককুমার বুঝতে পারেনি। সমুদ্রসেন বুঝতে পেরেছিল। সে এমনি একটা অমৃত ফল দিলেও হিমানী

তাকেই বর হিসেবে গ্রহণ করত। কারণ হিমানী বোঝাতে চেয়েছিল যে তার বর্তমান জীবন বাতাবি নেবুর মতো। সে অমৃত ফলের মতো হতে চায়। এই ছিল তার বাসনা। তার ইচ্ছাকে জাদুর মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশ করায় হিমানী সমুদ্রসেনকেই বর হিসেবে বরণ করে নিল।

রাজার এভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল পালাল। আবার গিয়ে উঠল সেই গাছে।

২৭. সোনার অলংকার

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য আবার এলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নাবিয়ে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, এত যে পরিশ্রম করছ শেষে তোমার অবস্থা মধুসূদনের মতো না হয়ে যায়। সেও বেচারা পরিশ্রম করে গেছে কিন্তু ফল ভোগ করতে পারেনি। আমি এখন তার কাহিনি শোনাচ্ছি। শুনলে তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল :

সেকালে অমরাবতী গ্রামে মধুসূদন নামে এক চাষি ছিল। তার পরিবারে ছিল তার স্ত্রী ও দুটি ছেলে। চার জনে রাতদিন খেটে-খুটে পেট চালাত।

একদিন বারান্দায় বসে বসে ভাবছিল এইভাবে আমরা সারাজীবন খেটে গেলেও যা পাব তাতে আমাদের শুধু খাওয়া-পরাই জুটবে। এক পয়সা জমানো যাবে না। একটুও জমি কেনা যাবে না। কোনো জায়গা থেকে হঠাৎ দুসের সোনা পেয়ে গেলে খুব ভালো হত। আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটানো যেত। আমরা খুব সুখে জীবন কাটাতে পারতাম।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে সে একদিন তার বাড়ির ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসল। ঠাকুরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে মনে মনে ঠাকুরকে বলতে লাগল, 'ঠাকুর আমাদের অবস্থা কি আর কোনোদিন ফিরবে না ! আমরা কি চিরকালই দিন এনে দিন খাব?'

সে যখন চোখ বন্ধ করে ঠাকুরের সামনে বসে এসব কথা ভাবছিল ঠিক তখনই কোথা থেকে হঠাৎ তার সামনে একটা পোঁটলা পড়ল। সে চমকে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে পোঁটলাটা খুলে ফেলল। তাতে দু-সের ওজনের সোনার অলংকার ছিল। মধুসূদন অবাক হয়ে গেল। এত সোনা! এত অলংকার! তার ধারণা হল তার বাড়ির জাগ্রত দেবতাই ওই সোনার পোঁটলা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে।
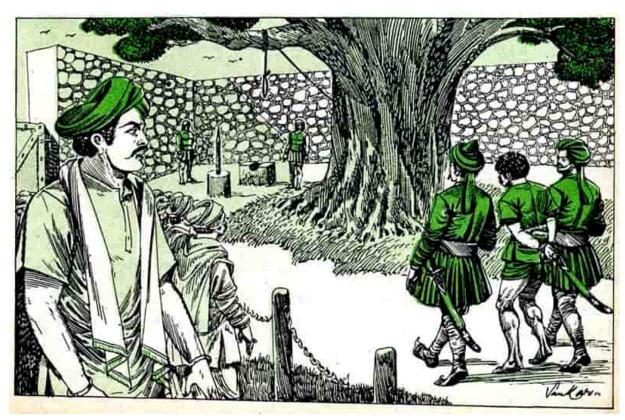
মধুসূদন চারদিকে তাকাল কেউ আছে কি না। কেউ নেই। কেউ দেখেনি। বউ রান্নাঘরে। ছেলেরা নেই। সে ওই পোঁটলা নিয়ে নিজেদের নিম গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিল ওই পোঁটলা। তারপর ভাবতে লাগল ওই সোনা দিয়ে কী করবে। ছেলে বউকে সোনার ব্যাপারটা বলবে কি না। অলংকার নিয়ে কোথায় বিক্রি করবে, কীভাবে খরচ করবে, কতটা জমি কিনবে, ব্যাবসা করবে কি না, কত সোনা জমিয়ে রাখবে। এক-একটা জিনিস করার কথা ভাবে। সে কাজের সুফল কুফলের কথাও ভাবে। শেষে ওই কুফল বেশি আছে ভেবে সে কাজ বাতিল করে। ঠিক করল যতদিন না ওই সোনা কীভাবে খরচ করবে ঠিক করছে ততদিন অলংকারের কথা ছেলে বউকে জানাবে না।

মধুসূদন মনে মনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে পাড়ায় বেরুল। কিছুটা যেতেই সে দেখতে পেল পাড়ায় বহু লোক জড়ো হয়ে দুটো লোককে ধরে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করছে। কয়কে জনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে তারা চুরি করেছে। একজন বলল, 'আরে মশাই, দু-সের ওজনের সোনার অলংকার চুরি করেছে এরা মার খাবে না তো কি রসগোল্লা খাবে? যেমন কর্ম তেমনি ফল।'

কথাটা কানে যেতেই মধুসূদনের বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে উঠল। তাহলে, সে যে অলংকার দেবীর কাছ থেকে পেয়েছে সেগুলি কি চুরি করা? তাই যদি হয় তাহলে সে ওই অলংকার কোথায় বিক্রি করবে? খুঁজতে খুঁজতে ওরা যদি নিম গাছের তলা থেকে ওই সোনার অলংকার পেয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ। অলংকার তো যাবেই আর সেইসঙ্গে আমার মানসম্মানও যাবে। ভাবতে ভাবতে সে বিষন্ন মনে বাড়ি গিয়ে বিছানায় বসে পড়ল। সোনা পাওয়ার ব্যাপারটা তার কাছে স্বপ্নের মতো লাগল। সে ছুটে গিয়ে নিম গাছতলা খুঁড়ে পোঁটলা আছে কি না দেখে নিল। না স্বপ্ন নয়। এই তো অলংকার। তারপর থেকে মধুসূদনের মাথায় সবসময় দুশ্চিন্তা জাকিয়ে বসেছিল। রাত্রে ঘুম হত না। সারারাত স্বপ্ন দেখত। স্বপ্নে সে চমকে উঠত, চিৎকার করে উঠত। রাত্রে ঘুম না হওয়ায় তার। খিদে হত না। সারাদিন সে মনমরা হয়ে থাকত। কারও সঙ্গে সে

ভালো করে কথা বলত না। কেউ কোনো কথা বলতে এলে সে দাঁত মুখ খিচিয়ে উঠত। রাত নেই দিন নেই তার মনের মধ্যে শুধু এক চিন্তা।

কিছুদিনের মধ্যে তার শরীর ভীষণ ভেঙে গেল। তার চালচলনে কথাবার্তায় পরিবর্তন দেখা দিল। তার বউ তাকে এরজন্য প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু মধুসূদন তেমন কোনো জবাব দিত না। তার ছেলেরা মাকে বাবার শরীর ভেঙে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করত। কোনো সদুত্তর পেত না।

মধুসূদন শেষে শয্যাশায়ী হল। কী যে রোগ বোঝা গেল না। কেন যে তার এত চিন্তা তা কেউ বুঝতে পারল না। তার চোখে ঘুম নেই, পেটে খিদে নেই। দিনরাত চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। বউ আর ছেলেরা অনেক চেষ্টা করেও তার কারণ বুঝে উঠতে পারল না। শেষে তারা হতাশ হয়ে পড়ল।

একদিন বউ এবং ছেলেরা যখন কাছে ছিল তখন সে ঘুমের ঘোরে 'সোনা, অলংকার' বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

এই কথা শুনে তার বউ মনে মনে ভাবল, নিশ্চয়ই তার জন্য কিছু সোনা লুকিয়ে রাখা আছে। ছেলেরা ভাবল, বাবা নিশ্চয়ই তাদের জন্য সোনা জমিয়ে রেখেছেন। তারা সকলেই মনে মনে ঠিক করে রাখল যে বাবার জ্ঞান ফিরলেই তারা জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে কোথায় সেই সোনা লুকানো আছে। তাদের যেন আর তর সইছিল না। তারা বাবার জ্ঞান ফেরানোর জন্য সেব শুশ্রুষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল।

জ্ঞান ফিরে আসার পর মধুসূদনের কানের কাছে মুখ রেখে ছেলেরা জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, সোনা অলংকার কীসব বলছিলেন, কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ওসব?'

মধুসূদন আস্তে আস্তে চোখ খুলে একবার তাকিয়ে মৃদু হেসে বড়ো ছেলেকে কাছে ডেকে আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা, যা বলছি, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবি। তোর ভাইকে, তোর মাকে রেখে গেলাম। ওদের দেখবি।' পরক্ষণেই মধুসূদন মারা গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, মারা যাওয়ার আগে মধুসূদন হাসল কেন? যে সোনার অলংকার নিজে বিক্রি করতে পারল না সেই সোনার সন্ধান বউ ছেলেদের দিল না কেন? কেন সে আজীবন গোপন রেখে গেল। এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মধুসূদন ছিল এক সাধারণ চাষি। তার কাছে দু-সের সোনার অলংকার এক কল্পনাতীত ঘটনা, একটি স্বপ্ন। গরিবের বড়োলোক হওয়ার কয়েকটা পথ সমাজে আছে। কিছু লোক সমাজে চুরি-ডাকাতি। করে বড়োলোক হয়। কোনো কোনো ভাগ্যবান কোনো আত্মীয়ের

উত্তরাধিকারী হিসেবে সোনা পেতে পারে। সম্পত্তির মালিক হতে পারে। কিন্তু মধুসূদন চুরি করে অথবা উত্তরাধিকারী হয়ে সোনা পায়নি। সে নিজেও জানত না কীভাবে সোনা পেয়েছে। ওই অলংকার নিয়ে বিক্রি করতে বেরুলে সে ধরা পড়ে মারধোর খাবে ভেবেছিল। ওই সোনা সে রাখতেও পারছিল না বিক্রিও করতে পারছিল না। সোনা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই সে অসুখে পড়ল। মৃত্যুর আগে ছেলে বউদের দেখে হাসল। কারণ যেহেতু ওরা সোনা পায়নি সেইহেতু ওরা বেশ শান্তিতেই জীবনযাপন করতে পারবে। মধুসূদনও সোনা পাওয়ার আগে শান্তিতেই তো ছিল।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গেল ওই গাছে।

২৮. পর্দার আড়ালে

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার গেলেন ওই গাছের কাছে, গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা তোমার কাছে এটা হয়তো একটা বিরাট পরীক্ষার মতো লাগছে। কিন্তু মনে রেখো, পরীক্ষা দিলেই যে তুমি সুফল পাবে তার কোনো মানে নেই। উদাহরণস্বরূপ তোমাকে নারায়ণ ভট্টের কাহিনি শোনাচ্ছি। এই কাহিনি শুনলে তোমার পরিশ্রম অনেকখানি কমে যাবে।' বলে বেতাল তার কাহিনি শুরু করল :

প্রাচীন কালে কাশ্মীর দেশে নারায়ণভট্ট নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রে তার পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। তার একবার ইচ্ছে জেগেছিল নানান দেশে ঘুরে সমস্ত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করে বিজয়ী হওয়ার।

একের-পর-এক দেশে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। প্রত্যেক দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করে জয়ী হয়ে বহু উপহার সংগ্রহ করেছিলেন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি কলিঙ্গ দেশে এলেন।

কলিঙ্গ দেশের এক অঞ্চলে কমলামণি নামে এক বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনিও সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বিদুষী মহিলা ঘোষণা করেছিলেন, যিনি তাঁকে পরাজিত করবেন, তাঁকেই তিনি বিয়ে করবেন। আর যদি কোনো পণ্ডিত ওই মহিলার কাছে পরাজিত হন তাহলে তাকে ওই মহিলার পায়ে প্রণাম করে যেতে হবে।

এর আগে বহু যুবক পণ্ডিত কমলামণির সঙ্গে তর্কে পরাজিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেছে।

কলিঙ্গ দেশে পা রেখেই নারায়ণ ভট্ট কমলামণির নাম শুনেছিলেন। কমলামণি যে অঞ্চলে থাকতেন, সে অঞ্চলের এক প্রান্তে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন নারায়ণ ভট্ট।

সেদিন স্নান সেরে খেতে বসে ওই ব্রাহ্মণের কাছে নারায়ণ ভট্ট কমলামণির কথা তুললেন। ব্রাহ্মণ তাকে জানালেন 'আমি কমলামণিকে খুব অল্পবয়সে দেখেছি। বড়ো হয়ে কমলামণি পথে বেরিয়েছেন কি না জানি না। তার সঙ্গে যাঁরা তর্ক করতে আসেন তারাও নাকি কমলামণিকে দেখেননি। তিনি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নাকি তর্ক করে থাকেন।'

খেয়ে উঠে নারায়ণ ভট্ট কমলামণির বাড়িতে গিয়ে তাকে খবর দিলেন। তিনি যে তাঁর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হতে এসেছেন সে ইচ্ছাও তিনি লোক মারফত জানিয়ে দিলেন। খবর পেয়েই কমলামণি নারায়ণ ভট্টকে আহ্বান জানিয়ে, তাকে অন্য ঘরে সুসজ্জিত আসনে বসিয়ে নিজে পাশের ঘরের পর্দার আড়ালে বসলেন।

নারায়ণ ভট্ট নিজের আসনে বসার পর কমলামণি পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি আমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছেন?'

'আপনার মুখেই শুনতে চাই।' নারায়ণ ভট্ট বললেন।

'আপনি পরাজিত হলে আমার পায়ে প্রণাম করে যেতে হবে। আর আমি পরাজিত হলে আপনি আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য থাকবেন। এই শর্তে রাজি থাকলে আমি আপনার সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হতে পারি।' কমলামণি বললেন।

'আমি পরাজিত হলে নিশ্চয়ই আপনার পায়ে প্রণাম করব। আর আপনি পরাজিত হলে, আপনাকে বিয়ে করার বিষয়ে আমাকে একাধিক কারণে বিচার করে দেখতে হবে। আমি আপনার পায়ে অতি সহজেই প্রণাম করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কিন্তু বিয়ে করার ব্যাপারে আমাকে ভেবে দেখতে হবে।' নারায়ণ ভট্ট বললেন।

কমলামণি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হোক।'

কমলামণি ও নারায়ণ ভট্টের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তর্ক চলতে লাগল। তারপর শুরু হল বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তরের পালা। কমলামণির প্রশ্নের জবাব দেন নারায় ভট্ট। নারায়ণ ভট্টের প্রশ্নের জবাব দেন কমলামণি। নারায়ণ ভট্ট বহু জটিল প্রশ্ন করলেও কমলামণি খুব সহজেই সেইসব প্রশ্নের জবাব পর পর দিয়ে যেতে লাগলেন। এইভাবে অনেকক্ষণ প্রশ্ন ও উত্তরের পালা কেটে যাওয়ার পর নারায়ণ ভট্ট জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কার কাছে শিক্ষালাভ করেছেন?'

'আমার বাবার কাছেই শিখেছি।' কমলামণি বললেন।

'আপনার বয়স কত?' নারায়ণ ভট্ট প্রশ্ন করলেন।

'বাইশ।' কমলামণি বললেন।

'আপনি এভাবে পর্দার আড়াল থেকে জবাব দেন কেন?' নারায়ণ ভট্ট বললেন।

'এটা আমার পদ্ধতি।' কমলামণি বললেন।

নারায়ণ ভট্ট কিছুক্ষণ ভেবে তালপাতায় একটি শ্লোক লিখে পর্দার ওপারে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'এই শ্লোকের অর্থ বলুন।'
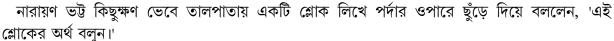
কমলামণি পরক্ষণেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কয়েক মুহর্ত পরে কমলামণি বললেন, 'আমি হেরে গেছি। আমাকে বিয়ে করুন।'

নারায়ণ ভট্ট নিজের আসন থেকে উঠতে উঠতে বললেন, 'তা অসম্ভব। আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

তারপর নারায়ণ ভট্ট চলে গেলেন।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, কমলামণি পরাজিত হওয়াতে নারায়ণ ভট্ট তাকে বিয়ে না করে চলে গেল কেন? আমার এ প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বিক্রমাদিত্য জবাবে বললেন, 'নারায়ণ ভট্ট কমলামণিকে পরাজিত করতে পারেননি। উনি শুধু তাঁর পর্দার আড়ালে থাকার কারণ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কমলামণি অন্ধ। যিনি মুখে মুখে প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, তিনি একটি শ্লোকের অর্থ জানেন না। এ হতে পারে না। এর কারণ আবিষ্কারের জন্যই তিনি কমলামণির বয়স ও শিক্ষক সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। বাবাই গুরু হওয়াতে মেয়ে যে অন্ধ তা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ পায়নি। নারায়ণ ভট্টের চলে যাওয়ার কারণ দুটো হতে পারে। প্রথম, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, কমলামণিকে পরাজিত করা যাবে না। দ্বিতীয়, তিনি হয়তো অন্ধ মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাননি।'

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সাথে সাথে বেতাল শব নিয়ে আবার ওই গাছে গিয়ে উঠল।
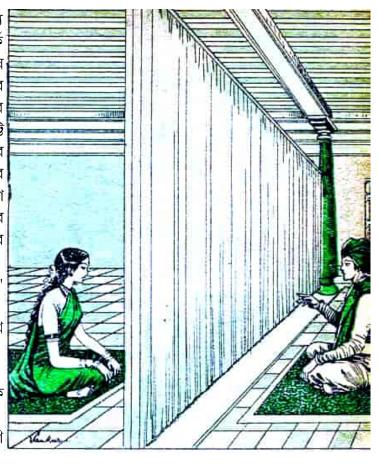
২৯. বাপের ব্যাটা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য ওই গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছের উপর থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, 'রাজা, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করছ বটে, তবে মনে রেখ, অনেক সময় শত চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ আমি তোমাকে অমরধ্বজের কাহিনি শোনাব। শুনে আনন্দ পাবে এবং পথা চলার শ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল তার কাহিনি শুরু করল :

অমরাবতী নগরের যুবরাজ একবার শিকার করতে করতে গভীর অরণ্যে চলে গেল। শিকারি হিসেবে যুবরাজ অমরধ্বজের খুব নাম ছিল। কিন্তু সেদিন তার শিকার করা হয়ে উঠল না। এক অরণ্যকন্যার অপরূপ রূপ দেখে সে অবাক হয়ে গেল। তার মন পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল। তার মন যখন পেল তখন বাধা দিল এক অরণ্যযুবক। তাকে পরাজিত করে, একরকম জোর করে, ওই অরণ্যকন্যাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরল যুবরাজ অমরধ্বজ।

অরণ্যকন্যাকে যুবরাজ অমরধ্বজ বিয়ে করল।

কিন্তু অরণ্যকন্যা রাজ পরিবারের কোনো কিছুর সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তাই কোনো মানুষ অথবা জিনিসের সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। সে যে পরিবেশে বড়ো হয়েছে তার সঙ্গে রাজ পরিবারের কোনো মিল নেই। তাই পদে পদে তাকে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছিল। ফলে বাইরের কারও সঙ্গে তার আলাপ হত না। তার এই বন্দি জীবনের একমাত্র সাথী তার স্বামী যুবরাজ অমরধ্বজ। তাই, অরণ্যকন্যা চাইত যুবরাজ যেন সবসময় তার কাছে থাকে। সে সহজে অমরধ্বজকে কোথাও যেতে দিতে চাইত না।

যুবরাজ অমরধ্বজ রাজা হল। রাজা হয়ে সবসময় অরণ্যকন্যার কাছে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না। তার ফলে অরণ্যকন্যার সঙ্গে তার সূক্ষ্ম বিরোধ দেখা দিল। তবু অমরধ্বজ ধৈর্য ধরে আশা করত, অরণ্যকন্যা একদিন-না-একদিন রানি হিসেবে চলবে। তার আচার-আচরণে রানির ভূমিকা ফুটে উঠবেই।

সবসময় রানীর কাছে রাজা অমরধবজকে বাধ্য হয়ে থাকতে হত। ফলে অমরধ্বজ কাজ করে উঠতে পারত না। তখন পাশের দেশের রাজা এই দেশ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করল। এই খবর পেয়ে রাজা অমরধ্বজ উদবিগ্ন হল। কী করবে ভেবে না পেয়ে রাজা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা সেরে সেনাপতির সঙ্গে গোপনে আলোচনা করতে লাগল।

এমন সময় অরণ্যকন্যা আলোচনার ঘরে ঢুকে রাজার হাত ধরে টানল।

এই অবস্থা দেখে মন্ত্রী ও সেনাপতি অবাক হয়ে গেল। কিন্তু রাজার সামনে কেউ কোনো কথা বলল না। রাজা খুব অপমান বোধ করল। কিন্তু নিরুপায়। ওই সভা ছেড়ে রাজাকে উঠতেই হল। সেদিন রাজা অমরধবজ মনের রাগ আর চেপে রাখতে পারল না। অরণ্যকন্যাকেও রেগে গিয়ে বলল, 'এতদিন আমি চেষ্টা করছিলাম তোমাকে বদলানোর। তোমার মধ্যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আজ তুমি যা করলে তাতে আমার সমস্ত আশা ধুলোয় মিশে গেছে। তোমাকে অরণ্য থেকে ভালোবেসে এই রাজপ্রাসাদে এনে খুব ভুল করেছি। তোমাকে পরিবর্তন করার, তোমার মধ্যে রানির গাম্ভীর্য আনার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি পারিনি। বিফল হয়েছি।'

অরণ্যকন্যা রাজার কথাগুলো হাঁ করে শুনছিল। সব কথা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। সে বুঝতেই পারল না তার উপর রাজা কেন এত রেগে গেল। রাজার এত রাগ সে কোনোদিন দেখেনি।

তারপর থেকে রাজা অমরধ্বজ সারাদিন রাজ কাজে জড়িয়ে থাকত। শুধু রাত্রে অন্দরমহলে রাজা আসত। রাত্রেও রাজার ভালোভাবে ঘুম হত না । সবসময় শত্রুকে কীভাবে পরাজিত করা যায় সেই চিন্তা করত।
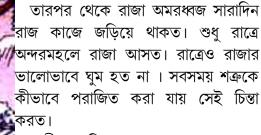
স্বামী সারাদিন রাজ কাজে থাকার ফলে, আগের মতো তাকে ভালোবাসে না দেখে অরণ্যকন্যার খুব খারাপ লাগত। তার কাছে আরও বেশি করে অন্দরমহলের জীবন বন্দি জীবনের মতো লাগতে লাগল। তার জীবনের এই দুঃখজনক অবস্থা দেখে রাজা অমরধ্বজেরও খারাপ লাগছিল কিন্তু রাজা নিরুপায়। আগে শত্রুকে পরাজিত করতে হবে তারপর অন্য কথা।

রাজা অমরধ্বজ শত্রুকে পরাজিত করল। যুদ্ধ শেষ করার পর রাজার নজর পড়ল রানির উপর। লক্ষ করল রানির শরীর ভীষণ ভেঙে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই অমরধ্বজ জানতে পারল যে রানি গর্ভবতী।

প্রত্যেক বছর অমরাবতীতে দুর্গা পূজার সময় সারা দেশে ঘটা করে উৎসব হত। এই উৎসবের সময় নানা ধরনের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী হত। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল অমরধ্বজের হাতি মারা। অমরধ্বজ মস্ত বড়ো পাথরের গদা দিয়ে হাতিকে আক্রমণ করত এবং মেরে ফেলত। যে পাথরের গদা তুলে অমরধবজ হাতিকে মেরে ফেলত সে গদাটা ছিল খুব ভারী। অমরধ্বজ ছাড়া আর কেউ ওই পাথরের গদা তুলতে পারত না।

সে বছর অমরধ্বজ প্রদর্শনীর জায়গায় রানিকে নিয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ লোক ওই প্রদর্শনী দেখার জন্য এসেছিল। অত লোক দেখে অরণ্যকন্যা রাজাকে বলল, 'আমরাও এই ধরনের প্রদর্শনী করে থাকি তবে এত লোক হয় না।'

'এত লোক যে এসেছে তার একটা কারণ আছে। ওরা সব আমার প্রদর্শনী দেখতে এসেছে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে এমন এক কাণ্ড করব যা তুমি কোনোদিন দেখোনি।' অমরধ্বজ বলল।

রাজা অমরধ্বজ আসরে নাবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ জয়ধ্বনি করে উঠল। রাজা মস্তবড়ো এক পাথরের গদা তুলল। গদা দিয়ে রাজা অমরধ্বজ হাতিটাকে মেরে ফেলল। সমস্ত দর্শক আনন্দে অনেকক্ষণ ধরে হাততালি দিতে লাগল। লক্ষ লক্ষ মানুষের হাততালি ও হর্ষধ্বনিতে গোটা অঞ্চল গম গম করতে লাগল। চারদিক থেকে রাজা অমরধ্বজের উপর অজস্র ফুল ঝরে পড়তে লাগল। ঠিক সেইসময় রাজা অমরধ্বজ একবার রানির দিকে তাকাল। দেখল রানি শুধু হাসছে। রাজা কিছুটা অবাক হয়ে তার কাছে এসে বলল, 'হাসছ কেন?'

'ভাবছি তুমি এমন কোন বড়ো কাজ করেছ যে এত লোক হাততালি দিচ্ছে আর ফুল ছুঁড়ছে?' অরণ্যকন্যা বলল। 'ওই পাথরের গদা আমি ছাড়া এখানকার কেউ তুলতে পারে না। আমি যে ওটাকে সহজেই তুলতে পেরেছি তাই নয় অতবড়ো হাতিটাকে গদা দিয়ে মেরে ফেলেছি।

‘ওই পাথরের গদা কেউ তুলতে পারে না বলছ? যদি পারে কী হবে তাহলে?’ অরণ্যকন্যা বলল।

‘যে ওই পাথরের গদা তুলতে পারবে তাকে আমি আমার রাজ্য দিয়ে দেব।' বলল রাজা।

অরণ্যকন্যা হাসতে হাসতে বলল, 'এই পাথরের গদা তো আমার বাপের বাড়ির দেশের যেকোনো লোকই তুলতে পারে।'

'তাই নাকি? তাই যদি হয় তাহলে তুমি এক্ষুনি তোমার বাপের বাড়ি ফিরে গিয়ে তাকে নিয়ে এসো। আমার সামনে ওই পাথরের গদা যদি তুলতে পারে তাহলে আমি তাকে আমার রাজ্য দিয়ে দেব। আর একটা কথা, যদি না আনতে পার তাহলে তুমিও আর আসবে না।' অমরধ্বজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

রাজা লোকলস্কর দিয়ে রানিকে সোজা অরণ্যে, তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

পরের বছর দুর্গা পূজার সময় রাজা ভেবেছিল অরণ্যকন্যা লোক নিয়ে আসবে কিন্তু এল না। এইভাবে প্রত্যেক বছর দুর্গা পূজার সময় প্রদর্শনী হত, রাজ ভাবত অরণ্যকন্যা লোক নিয়ে আসবে কিন্তু কাউকে দেখতে পেত না। এক বছর দু-বছর করে পনেরোটি বছর কেটে গেল। পনেরো বছর পরে সে বছরও যথারীতি প্রদর্শনী হল। রাজার গদা দিয়ে হাতিকে মেরে ফেলার পর এক তরুণ হঠাৎ বেরিয়ে এসে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “মহারাজ ওই গদাটাকে আমি তুলে দেখাব?’
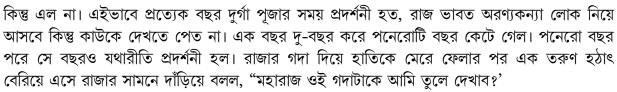
অমরধ্বজ বলল, 'দেখ, তুলতে পারলে তোমাকে আমার রাজ্য দিয়ে দেব।'

হঠাৎ ওই অরণ্যযুবক পাথরের গদাটা ধরে তুলে ঘোরাতে লাগল। ছেলেটার শক্তি দেখে রাজা অবাক হয়ে গেল। তখন ওই অরণ্যকন্যা ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে এসে বলল, বলেছিলাম না আমার বাপের বাড়িতে এই গদা তোলার মতো লোক আছে, তার প্রমাণ দিলাম।' তখন রাজা অমরধ্বজ অরণ্যকন্যাকে চিনতে পেরে তাকে ও পুত্রকে নিয়ে অন্দরমহলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, অরণ্যকন্যা তো বলেছিল, ওই গদা তার বাপের বাড়ির সবাই তুলতে পারে। তাহলে পনেরো বছর দেরি করল কেন? তাহলে কি অরণ্যকন্যা মিথ্যা কথা বলেছিল? আর রাজাই-বা। পনেরো বছর যার খোঁজ করল না তাকে আবার রানি হিসেবে গ্রহণ করল কেন? রাজা কি এত বছর রানির অপেক্ষা করছিল ? এইসব প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নগুলোর জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, ‘অরণ্যবাসীরা মিথ্যা কথা বলে না। অন্যদের শক্তির প্রশংসা করার ক্ষমতা তাদের থাকে। তাই অরণ্যকন্যা মিথ্যা কথা বলেনি। বাপের বাড়ি গিয়ে সে ভেবে দেখল যেকোনো লোককে নিয়ে গেলে সে পাথর তুলতে পারবে বটে তবে তার স্বামী রাজা থাকবে না। তাকে রাজত্ব হারাতে হবে। বাপের বাড়ির লোক রাজা হবে আর তার নিজের স্বামী রাজা থাকবে না এটা তার
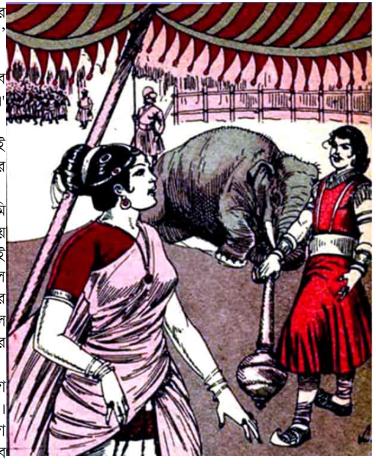
কাম্য ছিল না, তাই সে নিজের ছেলে যতদিন না বড়ো হয়েছে ততদিন অপেক্ষা করেছে। উদ্দেশ্য তার স্বামীর পরে যেন তার ছেলেই রাজা হয়। অন্যদিকে রাজা অমরধ্বজও খুশি। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন রাজত্ব করে যেতে পারবেন আর তার পরে তারই ছেলে রাজা হবে। সিংহাসনে অন্য কারও বসার সুযোগ নেই। এই আনন্দে রাজা অমরধ্বজ স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে গেলেন।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গেল ওই গাছে।

৩০. চোর ধরা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে আবার গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতো নীরবে হাঁটতে লাগলেন শ্মশানের দিকে। শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে কাকে কথা দিয়ে এত পরিশ্রম করছ আমি তা জানি না। কথা রাখার জন্য মাঝে মাঝে অধর্মের পথে চলতে হয়। প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে বিক্রমসেনের কাহিনি শোনাচ্ছি। শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম কমে যাবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে ভবন দেশের রাজা ছিলেন বিক্রমসেন। তিনি সেকালের খুব ভালো রাজা ছিলেন। কোনোদিন যুদ্ধে পরাজিত হননি। তাঁর দেশের আশেপাশে যত দেশ ছিল তার শাসকরা রাজা বিক্রমসেনের কাছে অবনত থাকত। বিক্রমসেনকে ওরা প্রত্যেক বছর সেলামি দিত।

কয়েক বছর পরে রাজা লক্ষ করলেন, কোষাগারের অর্থ দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। রাজা বুঝতে পারলেন যে কোনো লোক তার চোখে ধুলো দিয়ে দিনের পর দিন অর্থ সরাচ্ছে। তিনি অনেক চেষ্টা করেও চোর ধরতে পারেননি। দিনে রাত্রেও চোর ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন।

শেষে রাজা বিক্রমসেন চারদিকে ঘোষণা করলেন যে, যে চোর ধরাতে পারবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব দেবেন এবং তার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিয়ে দেবেন। এই ঘোষণা শুনে বহু লোক চোর ধরার চেষ্টা করল কিন্তু কেউ চোর ধরতে পারল না। শেষে এক যুবক রাজার কাছে এল। যুবকটির চেহারা যেমন সুন্দর তেমনি বলিষ্ঠ। সে রাজাকে বলল, 'মহারাজ আমি আপনার ঘোষণা শুনে এসেছি। চোর ধরার ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'তোমার যত লোক দরকার, চোর ধরার জন্য, তত লোক তুমি নিয়ে যেতে পার। চোর ধরে আনলে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে। যথাসময়ে তুমি অর্ধেক রাজত্ব পাবে।' রাজা বিক্রমসেন বললেন।

'মহারাজ, আমি কারও সাহায্য চাই না; শুধু চাই আপনার সাহায্য। আমার যখন দরকার হবে তখন আপনি একটু সাহায্য করলেই আমি চোর ধরতে পারব বলে আমার ধারণা। আপনার যদি কোনো অসুবিধা এই ব্যাপারে না থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে বলুন। তবে মহারাজ, আমার সঙ্গে আপনাকে যেখানে যেতে বলব সেখানে একা যেতে হবে। রাজি থাকলে বলুন।' যুবক বলল।

রাজা বিক্রমসেন কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে চল, এক্ষুনি আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।'

'এক্ষুনি যেতে হবে না মহারাজ। আমি আবার আপনার কাছে এসে জানাব।' বলে যুবকটি ফিরে গেল।

দু-দিন পরে ওই যুবক এক রাত্রে এসে রাজার সাথে গোপনে দেখা করে বলল, 'মহারাজ আজ রাত্রেই ছদ্মবেশে আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। চলুন, দেরি করলে হয়তো চোর ধরা যাবে না।'

রাজা বিক্রমসেন ওই যুবকের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এসে এক ঘন বনে ঢুকলেন। যুবকটি রাজাকে বনের মাঝের একটি পাহাড়ের উপরে নিয়ে গেল। আস্তে আস্তে রাজাকে বলল, 'মহারাজ আর একটু এগিয়ে গেলেই আমরা একটি বড়ো গুহা দেখতে পাব। ওই গুহায় চোর থাকে। ওরা ওই গুহার ভেতরে নাচ-গান করে। মদ খেয়ে হইচই করে কিন্তু আমি আপনাকে ওসব দেখাব না।'

ঠিক সেইসময় ঘুঙুরের শব্দ শোনা গেল। যুবক মুখের উপর তর্জনি রেখে রাজাকে চুপ করার ইশারা করল। কিছুক্ষণ পরে যুবকটি নিজেই ফিসফিস করে বলল, 'মহারাজ ঘুঙুরের শব্দ শুনছেন, ওটা এক যুবতীর। যুবতীটিকে লক্ষ করবেন। ওই চোরদের মধ্যমণি।

রাজা দেখলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ষোলো বছরের যুবতী গুহার ভিতরে ঢুকল। তার পেছনে ও দু-দিকে ছিল দু-জন মশাল ও অস্ত্রধারী। পেছনে যারা ছিল তাদের কাঁধে ছিল কয়েকটি থলে ভরতি। রাজা ও যুবকটির চোখের সামনে দিয়ে যেন ওরা এল আর ভেতরে ঢুকে গেল। রাজা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেননি।

রাজার নীরবতা দেখে যুবকটি রাজাকে বলল, 'মহারাজ কী ভাবছেন?'

রাজা বিক্রমসেন বললেন, 'ভাবছি কী করে তুমি এদের সন্ধান পেলে। ভাবছি, কে তোমাকে এখানে নিয়ে এল।'

যুবক রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আমি বাচ্ছা বয়স থেকেই মা-বাবার অবাধ্য ছিলাম। আমি কোনো কিছু ভয় করতাম না। যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন রাত্রে ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছিলাম। বাইরে খুব হইচই শুনে পা টিপে টিপে এসে উঁকি মারলাম। দেখি গুহার ভেতরে চোর আছে। ওরা তখন মা কালীর পুজো করছিল আর কিছু লোক মদ খাচ্ছিল। ওদের নেতা ছিল এক যুবক। ওই যুবকের কাছে বসেছিল এই যুবতী। তাদের সামনে পড়েছিল অনেক অর্থ। অত অর্থ দেখে আমার কৌতূহল জাগল। এত অর্থ এল কোথা থেকে? এরা কি কোনো ধনীর বাড়িতে চুরি করে এনেছে? এই ঘটনার কিছুদিন পরে আপনার ঘোষণা শুনলাম। তখন আমার ধারণা হল ওরা আপনার কোষাগার থেকেই চুরি করেছে। তাই আপনাকে নিয়ে এখানে এসেছি, মহারাজ।'

রাজা বিক্রমসেন কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে পরে বললেন, 'যে যুবতীকে আমরা এখন দেখেছি সে কে জানো? আমার একমাত্র মেয়ে। এখন বুঝতে পারছ আমি কেন নীরব ছিলাম?'

যুবকটি উদবিগ্ন হয়ে বলল, 'মহারাজ কি বলছেন আপনি? এ কি সত্য না স্বপ্ন? এ যদি আমি জানতাম তাহলে আপনাকে এখানে এনে এতটা বিব্রত করতাম না। আমার এই অপরাধের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ।'

'পাগল ছেলে! তুমি অত ভাবছ কেন? আমার মেয়েই হোক আর অন্য কেউ হোক, অন্যায় করলে শাস্তি পাবেই। আমার মেয়ে বলে ক্ষমা করব না।'
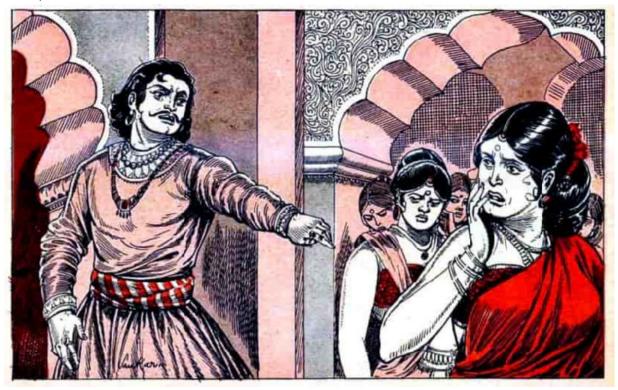
রাজা অন্দরমহলে গিয়ে সোজা রাজকুমারীর ঘরে গেলেন। পরিচারিকারা রাজাকে অত রাত্রে দেখে অবাক হয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। রাজা ওদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে কোথায়? আমার মেয়ে কোথায়?' প্রত্যেকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা ওই ঘরে রাত্রের বাকি সময়টা মেয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ভোরে রাজকুমারী পা টিপে টিপে রাজমহলে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে নিজের ঘরে ঢুকেই পাথর প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সারারাত কোথায় ছিলে? জবাব দাও। কোথায় ছিলে সারারাত?' রাজকুমারী কোনো জবাব দিল না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

পরের দিন রাজদরবারে রাজা ঘোষণা করলেন, 'আমি ঘোষণা করেছিলাম চোরকে শাস্তি দেব। আমি ঘোষণা করছি, রাজকোষাগার থেকে যে চুরি করেছে তাকে আমি কঠোরতম শাস্তি দেব। এক্ষেত্রে চোর আমার নিজের মেয়ে বলে রেহাই পাবে না। ক্ষমা করব না।'

ঠিক সেইসময়ে রাজপ্রাসাদে দর্শকদের মধ্য থেকে ওই যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মহারাজ আপনার ঘোষণা অনুযায়ী চোরের সন্ধান যে দেবে তার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হবার কথা। আপনি কি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন?'

রাজা সবদিক ভেবে ওই যুবকের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, বিক্রমসেন নিজের মেয়েকে কঠোরতম শাস্তি দিল না কেন? প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে? নাকি নিজের মেয়েকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যুবকটির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন? রাজা ওই যুবকটিকে পরের দিনই রাজপ্রাসাদে এসে দেখা করতে বললেন কেন? আমার এ প্রশ্নগুলোর জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'সমস্যাটি অত সহজ ছিল না। আমরা যুবকের জীবনী তত ভালো জানতে পারিনি। একটা চোরের শৈশব কৈশোর যেভাবে কাটে যুবকটিও সেভাবে কাটিয়েছে তার শৈশব এবং কৈশোর জীবন। শুধু চোর ধরা তার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহলে তো সে সহজেই রাজার কাছ থেকে কিছু লোক নিয়ে ওই গুহায় গিয়ে চোরের দলকে ধরে নিয়ে আসতে পারত কিন্তু সে তা করল না। সে দু-দিন সময় নিল। তারপর রাজাকে নিয়ে গিয়ে একটি দৃশ্য দেখাল। রাজার মনে যুবকের প্রতি সন্দেহ জেগেছিল। রাজা নিজের মেয়েকে দেখল কিন্তু তাঁর মেয়ে যে যুবকের সঙ্গে ওই গুহায় ঢোকে, যে যুবক ওই চোরদের নেতা সেই যুবককে রাজা বিক্রমসেন দেখতে পাননি। আবার রাজপ্রাসাদে এসে সঠিক সময়ে ওই যুবকটি যেভাবে তার মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করল তাতে বোঝা যায় যে ওই যুবকটি চোরদের নেতা। রাজাও বুঝেছিলেন। তাই ওই যুবকের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন। এর ফলে রাজা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন এবং নিজের মেয়ের প্রাণও বাঁচাতে পারলেন।'

রাজা মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ওই গাছে উঠল।

৩১. যার ভাগ্যে যা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন বিধি খণ্ডানোর ক্ষমতা কারও নেই। আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে একটি কাহিনি বলছি। এই কাহিনি শোনার ফলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে। শোন বলছি।

বেতাল কাহিনি শুরু করল

সিন্ধু নদীর তীরে ব্রহ্মস্থলী নামক গ্রামে বেদশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। চারটি বেদই তার জানা ছিল। তার ছিল এক বিশেষ শিষ্য। অত্যন্ত পরিশ্রম করে সে বেদ অধ্যয়ন করেছিল। উত্তরকালে তার নাম হয়েছিল দৃঢ়োদ্যম। দৃঢ়োদ্যমের খাওয়া-পরার খরচের ব্যাপারে তার মাথাব্যথা ছিল না। রাতদিন পরিশ্রম করে মাত্র দশ বছরের মধ্যে সে চারটি বেদেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল। দৃঢ়োদ্যম ভিন্নতমস নামে এক ধনী লোকের বাড়িতে থাকত।

একদিন রাত্রে ভিন্নতমস দৃঢ়োদ্যমকে বলল, 'আমার এখন অনেক বয়স হয়েছে। আমি আমার এই বিরাট বাড়ি, অসংখ্য গোরু, মোষ, চাষের অগাধ জমি, স্ত্রী, চাকর ইত্যাদি তোমার হাতে দিয়ে চলে যেতে চাই। ঋষিদের কথামতো এই বয়সে আমার তীর্থে যাওয়া উচিত। তীর্থে তীর্থে ঘুরে অবশেষে আমি মুক্তির জন্য কাশীতে চলে যাব। তুমি এখন থেকে এসব পরিচালনা করার ভার নেবে, দেখাশোনা করবে।'

এই কথায় খুশি হয়ে দৃঢ়োদ্যম ভিন্নতমসের কাছ থেকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বুঝে নিল। তারপর গুরুর কাছে গিয়ে, বিদায় নিয়ে ভিন্নতমসের বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করবে বলে তাকে কথা দিয়ে গুরুর কাছে চলে গেল।

পরের দিন দৃঢ়োদ্যম ফিরছে না দেখে ভিন্নতমস দৃঢ়োদ্যমের খোঁজে তার গুরুর বাড়িতে গেল। সেখানে গিয়ে দৃঢ়োদ্যমকে দেখে তাকে না ফেরার কারণ জিজ্ঞেস করল। তখন দৃঢ়োদ্যম ভিন্নতমসকে বলল, 'এখনও আমি গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিতে পারিনি। গুরুর অনুমতির অপেক্ষায় আছি। গুরু ভীষণ ব্যস্ত রয়েছেন। কারণ বুঝতে পারছি না।'

ভিন্নতমস একটু হেসে বলল, 'তোমার গুরু তমোভেদের স্ত্রীর পেটে ব্যথা উঠেছে। তাঁর বাচ্চা হবে। আমি জানি তাঁর একটি মেয়ে হবে। আমি এও জানি যে সেই মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। আর ওই মেয়ে কুলত্যাগী হবে। এখন তোমাদের দিকে তাকানোর সময় তোমাদের গুরুর নেই। স্ত্রীর বাচ্চা হবে বলেই তোমার গুরু এত ব্যস্ত আছেন।'

এ-কথা শুনে দৃঢ়োদ্যম খুব অবাক হল। পরক্ষণেই ভিন্নতমস চলে গেল। তার যাওয়ার পর তমোভেদের সত্যি সত্যি কন্যা হল। ভিন্নতমসের বাকি দুটো কথাও ফলে যেতে পারে ভাবল দৃঢ়োদ্যম। আর এইভাবে চিন্তা করতে করতে বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। দৃঢ়োদ্যম মনে মনে ভাবতে লাগল সে যদি সেখান থেকে পালিয়ে যায় তাহলে আর তাকে বিয়ে করতে হবে না। সে গুরুকে না বলে, ভিন্নতমসের সঙ্গে দেখা না করে, সিন্ধু নদীর তীর থেকে পালিয়ে নানা দেশ ঘুরতে লাগল। দশ বছর ঘুরে বেড়াল।

ঘুরতে ঘুরতে একবার গঙ্গা নদীর তীরে এসে এক ব্রাহ্মণ পল্লিতে ঢুকল। সেখানে এক বুড়িকে বলল দৃঢ়োদ্যম, 'মা কাশীর ভালো জল একটু আছে?'

ওই বুড়ি হেঁকে বলল, 'ও মা, তমালিকা একটা পিঁড়ি দিয়ে এক ঘটি কাশীর জল নিয়ে আয় তো মা।'

ভেতর থেকে কালো পোশাক পরে একটি ট্যারা চোখের মেয়ে এসে এক হাতে পিঁড়ি ও অন্য হাতে জল নিয়ে দাঁড়াল। পিঁড়ি পেতে 'বসুন' বলতে যাবে এমন সময় তার হাত থেকে ঘটিটা পড়ে গেল।

'কী করলি? জল ফেলে দিলি? যা আর এক ঘটি জল নিয়ে আয়।' বলল বৃদ্ধা।

দৃঢ়োদ্যম বসে বিশ্রাম করছিল এমন সময় বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল, 'কোন দেশ থেকে আসছ বাবা? কোথায় যাবে?'

'কোন দেশ থেকে যে আসছি তা কী করে বলব? সব দেশই তো ঘোরা হল। এখন আর দেশে দেশে ঘোরাঘুরি ভালো লাগছে না। ভাবছি কোনো এক ব্রাহ্মণ পল্লিতে বাচ্চাদের পড়িয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।' দৃঢ়োদ্যম বলল।

'তাহলে আর তুমি কোথাও যেয়ো না বাবা। এখানেই লেখাপড়া শিখিয়ে থেকে যাও। আমার হাতেই দু-জন আছে তাদের তুমি লেখাপড়া শেখাবে।' বৃদ্ধা বলল।

রাজি হয়ে দৃঢ়োদ্যম সেখানেই থেকে গেল। তমালিকাসহ ওই বাড়িতেই দু-জনকে পড়িয়ে দু-বছর কাটিয়ে দিল। পরে একদিন বৃদ্ধা ভাবল তমালিকার বিয়ের বয়স হয়েছে। মনে মনে সে ভাবল তমালিকার সঙ্গে দৃঢ়োদ্যমের বিয়ে হলে ভালোই হবে। বুড়ি সুযোগ মতো দৃঢ়োদ্যমকে মনের কথাটি বলল। দৃঢ়োদ্যম কিছুক্ষণ ভেবে তমালিকাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। মনে মনে দৃঢ়োদ্যম ভাবল, 'একে বিয়ে করে নিলে ভবিষ্যতে কোনোদিন আর তমোভেদের কুলত্যাগী মেয়েকে বিয়ে করার আশঙ্কা একেবারেই থাকবে না।' এক ভালো দিনক্ষণ দেখে তমালিকার সঙ্গে দৃঢ়োদ্যমের বিয়ে দিয়ে দিল বৃদ্ধা।

এক বছর পরে ভোর বেলায় তমালিকার ঘুম ভেঙে গেলে দৃঢ়োদ্যম জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বৃদ্ধা তোমার কে হন? হঠাৎ আমার কাছে লেখাপড়া শেখাতে তোমাদের পাঠালেন কেন?'

তমালিকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের কাহিনি শুরু করল, 'এই বুড়ির স্বামী খুব ধনী লোক। দানধর্ম করতেন। ওর একটি মেয়ে হল। মেয়েকে তিনি তার এক শিষ্যকে দিয়েছিলেন। ওই শিষ্য এই ভদ্রমহিলা এবং তার স্বামীকে বাবা-মার মতো দেখত। কিছুকাল পরে শ্যালকদের সঙ্গে বিরোধ হল। তখন ওই শিষ্য স্ত্রীকে নিয়ে সোজা সিন্ধুনদীর তীরে ব্রহ্মস্থলী নামক গ্রামে গিয়ে থাকতে লাগল। ওই শিষ্য চারটি বেদেই দক্ষ ছিল। কিছুকাল পরে ওই শিষ্যের একটি কুলত্যাগী কন্যা হল এবং পরে যমজ পুত্র হল। আমিই সেই কুলত্যাগী কন্যা। আর ওই ছেলেরা হল আমার ছোটো ভাই। আমার মা-বাবাকে আমরা চিনি না। ওদের মুখ আমাদের চোখের সামনে ভাসে না। সিন্ধু নদীর

জলে আমরা হয়তো যেকোনো দিন ভেসে যেতাম। আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা দিদিমার কাছে স্থান পেলাম।'

দৃঢ়োদ্যমের মনে হল যেন তার বুকে কেউ তির বিঁধে দিয়েছে। ভিন্নতমসের তিনটি কথার মধ্যে দুটো ফলে গেল। আর একটি কথা যাতে না ফলে যায় তারজন্য সে সোজা কাশীর পথ ধরল। সেখানে ফুলের মালা বিক্রি করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করল।

বারো বছর পরে কাশীতে পৌঁছানোর মুখে হঠাৎ এক কাপালিক উন্মত্তভাবে দৃঢ়োদ্যমের সামনে হাজির হয়ে দাপাদাপি করতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে তার পেছনে চিৎকার করছিল এক কাপালিনী। ইতিমধ্যে কাপালিনী দৃঢ়োদ্যমকে চিনতে পেরে তার পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। ভিন্নতমসের কথা যাতে না ফলে যায় তার ভয়ে একদিন দৃঢ়োদ্যম তার বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচবে ভেবেছিল। বাঁচতে পারল না। এক বৃদ্ধার কাছে ছেলে পড়িয়ে কাটাতে হল। তারপর সেই ট্যারা মেয়েকে বিয়ে করতে হল। আর এখন যে কাপালিনীকে কাপালিকের সঙ্গে আসতে দেখেছে সেও ট্যারা। কে জানে কে এই কাপালিনী। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে বহু লোক জমে গেল।

তমালিকা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি যে এত বেদ অধ্যয়ন করলে, এত দেশে দেশে ঘুরলে তার ফলে কি এই জ্ঞান হল? তুমি আমাকে ছেড়ে হঠাৎ পালিয়ে গেলে কেন? তুমি আমাকে ছেড়ে পালিয়েছ বলেই আজ আমার এই অবস্থা? আমি পথে পথে এর ওর হাত ধরে ঘুরছি। আমাকে এভাবে পথে পথে ঘুরতে তুমিই বাধ্য করেছ। তুমি এত বড়ো পণ্ডিত হলে কী হবে, তুমি জানো না তোমার স্ত্রীর প্রতি কী কর্তব্য।' সব কথা বুঝে ওখানে যারা জমেছিল তারা তমালিকাকে জিজ্ঞেস করল, 'যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে এখন তুমি বল তুমি ওই কাপালিকের সঙ্গে থাকবে না নিজের স্বামীর কাছে ফিরে আসবে?' তমালিকা সেই মুহূর্তে স্বামীর কাছে ফিরেই আসতে চাইল।

তখন সেখানকার লোক দৃঢ়োদ্যমকে বলল, 'তমালিকার জীবনে যেটুকু পতন হয়েছে তারজন্য তুমিই দায়ী। যে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ছিল তার বিধান আমরা দেব। এখন তুমি তমালিকাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর।'

দৃঢ়োদ্যম তাদের কথামতো তমালিকাকে গ্রহণ করল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, দৃঢ়োদ্যমের জীবনে বার বার যে পরিবর্তন দেখা দিল তার জন্য দায়ী কে? এই কি তার বিধির বিধান ছিল? সে কি সত্যিই ভিন্নতমসের ভবিষ্যদবাণী বিশ্বাস করেছিল? এবং ওই বিশ্বাসের ফলেই কি সে বার বার ঘোরাঘুরি করছিল? আমার এইসব প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও জবাব না দিলে মাথা এই মুহূর্তে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বিক্রমাদিত্য প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'তিন্নতমসের ভবিষ্যদবাণী বিশ্বাস করেছিল বলেই দৃঢ়োদ্যম নিজেকে বাঁচিয়ে চলার জন্য পথে পথে ঘুরছিল। বিশ্বাস না করলে সে সেখানেই থাকত। ভিন্নতমসের ভবিষ্যদবাণী যদি বিধির বিধান হয়ে থাকে তবে সে বিধান হয়েছিল দৃঢ়োদ্যমের বিধান অনুসারে। একে অন্যকে অনুসরণ করেছিল। তমালিকাকে বিয়ে না করার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে তার উচিত ছিল তমালিকার কাছাকাছি অঞ্চলেই থাকা। তমালিকার সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনে তাকে বিয়ে করাও দৃঢ়োদ্যমের বোকামি হয়েছে। কারণ এক বছর পরে জেনে তাকে অতটা দুঃখ পেতে হত না। ওভাবে রাতারাতি পালাতে হত না। তার ফলে অত লোকের মধ্যে দৃঢ়োদ্যমকে তার স্ত্রী অপদস্থ করতে পেরেছিল এবং পরিশেষে তমালিকা যে কাপালিকের সঙ্গে না গিয়ে দৃঢ়োদ্যমের সঙ্গে থাকতে চাইল তা তার স্বামী ভক্তিই প্রমাণ করে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ওই গাছে চলে গেল।

৩২. জ্যান্ত পিশাচ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে এগোতে লাগলেন। তখন শব থেকে বেতাল বলল, 'রাজা, অতীতের ক্ষমতা ভিত্তিতে মানুষের অহংকার বেড়ে যায়। প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে একটি কাহিনি বলব। এই কাহিনি শুনে তুমি বুঝতে পারবে যে আমার কথা সত্য। পথ চলতে চলতে প্রবীণের এই কাহিনি শুনলে তোমার পরিশ্রমও লাঘব হতে পারে।' বলে বেতাল প্রবীণের কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে সুবর্ণগিরির শাসক রাজসিংহ অত্যন্ত অযোগ্য রাজা ছিল। রাজার যা করা উচিত, যেসব কাজ নিজের দেখা উচিত তার কোনোটাই সে করত না। সব কাজ বড়ো বড়ো রাজকর্মচারীদের উপর চাপিয়ে নিজে আনন্দে ডুবে থাকত। ফলে সেইসব কর্মচারীরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করে নিজেদের অর্থ বাড়াত। নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের রাজকর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করত। দেখতে দেখতে সুবর্ণগিরির অবস্থা এমন হয়ে গেল যে রাজার ঝাড়ুদার থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত প্রত্যেকে প্রজাদের পীড়ন ও শোষণ করত। অর্ধমও মাথাচাড়া দিয়েছিল। কিন্তু দেশে যে এত অত্যাচার, এত অধর্ম হচ্ছে সে বিষয় রাজা কিছুই জানত না। বড়ো বড়ো রাজকর্মচারীরা যা বোঝাত রাজা তাই বিশ্বাস করত। ওরা দিন বললে রাজা দিন মনে করত। ওরা রাত বললে রাজাও রাত মনে করত।

সুবর্ণগিরিতে এক গরিব ব্রাহ্মণের প্রবীণ নামে এক ছেলে ছিল। অল্পবয়স থেকে প্রবীণের জ্ঞান অর্জনের প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাই প্রবীণের বাবা সমস্ত শাস্ত্রে বিজ্ঞ করে তুলেছিল। বড়ো হয়ে প্রবীণ দেশে দেশে ঘুরে বিভিন্ন বিদ্যানিকেতনে ঘুরে যতটা পারল শিক্ষালাভ করে সুবর্ণগিরিতে ফিরে এল। বিরাট পাণ্ডিত্য অর্জন করে ছেলে যখন ফিরে এল তখন প্রবীণের বাবা ভাবল দেশে ছেলে কদর পাবে। পাণ্ডিত্যের মর্যাদা পাবে। কিন্তু চারদিকের অবস্থা দেখে প্রবীণের বাবা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে একদিন ছেলেকে বলল, 'বাবা আমরা খুব গরিব লোক। এত জ্ঞান অর্জন করলে, দেশে দেশে ঘুরে এত পাণ্ডিত্য অর্জন করলে এই পোড়া দেশে তার কি যে মর্যাদা পাবে ভেবে পাচ্ছি না। মর্যাদা না পেলে অর্থ আসবে না। অর্থ না এলে আমাদের এই দারিদ্র ঘুচবে না।'

'কী বলছ বাবা, যত দিন যাচ্ছে, দেশের অবস্থা যত দেখছি তত আমার মন ভেঙে যাচ্ছে। আমি কার কাছে সম্মান পাব। আমাকে সম্মানিত করার লোক কি এই দেশে আছে? তুমি বলছ পোড়া দেশ। কিন্তু আমি দেখছি এটা জ্ঞানহীনদের দেশ। বোকাদের দেশ।' প্রবীণ বলল।

ছেলের কথা শুনে প্রবীণের বাবা ক্ষুণ্ণ হল। বুঝল, প্রবীণের মধ্যে অহংকার ঢুকেছে। তার সেই অহংকার দূর করার জন্য প্রবীণের বাবা বেছে বেছে ভালো ভালো পণ্ডিতদের আনিয়ে তাদের সঙ্গে ছেলেকে তর্ক করতে বসাল। ওরা প্রবীণের সঙ্গে তর্ক করে যাওয়ার সময় তার বাবাকে বলে যেত, 'আপনার গর্বিত হওয়া উচিত। আপনার পুত্র একটি রত্নের সমান। তার পাণ্ডিত্য সীমাহীন।' এইভাবে বিভিন্ন পণ্ডিতের মুখে ছেলের প্রশংসা শুনতে লাগল প্রবীণের বাবা।

গুণীর গুণ চাপা থাকে না। আগুন কখনো ছাই চাপা থাকতে পারে না। তাই প্রবীণের নাম, তার গুণের কথা, তার শিক্ষার কথা, লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে লাগল।

কথাটা ঘুরে ঘুরে রাজার কানেও প্রবীণের বিষয় গেল। রাজা প্রবীণকে ডেকে পাঠাল। তাতে প্রবীণের বাবা খুব আনন্দিত হল কিন্তু প্রবীণ রাজার কাছে যেতে আগ্রহী ছিল না। শেষে একরকম জোর করে ছেলেকে নিয়ে রাজার কাছে গেল প্রবীণের বাবা। প্রবীণের বাবা যে আশঙ্কা এতক্ষণ করছিল তাই শেষপর্যন্ত হয়ে

গেল। অত বোঝানোর পরেও প্রবীণ রাজপ্রাসাদের নিয়মকানুন মানতে পারল না। প্রবীণ রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন?'

রাজাকে এভাবে প্রশ্ন করা রীতিবিরুদ্ধ। তাই প্রবীণের বাবা এবং রাজসভার প্রত্যেকে অবাক হয়ে গেল।

রাজা কিন্তু রাগ করল না। বলল, 'তোমার পাণ্ডিত্যের খবর পেয়ে তোমাকে সম্মান দানের জন্য ডেকে পাঠিয়েছি।'

প্রবীণ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। রাজা মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি ওভাবে হাসছ কেন? এতে হাসির কী হল?'

'আপনার দেশের প্রজারা খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে। আপনার কর্মচারীরা ওদের রক্ত চুষে চুষে খাচ্ছে। অক্ষম এক কুশাসক রাজার কাছ থেকে সম্মান পাওয়া কি আনন্দের কথা? আসলে আমার কাঁদা উচিত ছিল, কিন্তু হেসে ফেললাম।' রাজার ভীষণ রাগ হল। বলল, 'মূর্খ কোথাকার। তুমি জানো কার সঙ্গে কথা বলছ? স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান যার নেই তাকে আমি পণ্ডিত মনে করি না। আমি যদি অক্ষম রাজা হই তোমার মতো পণ্ডিত কি ঘাস কাটছে! কোথায় কী হচ্ছে, কীভাবে কী করা যায়, কী করলে কুশাসন দূর হয় তা কোনোদিন আমাকে জানিয়েছ? অবিলম্বে আমাকে জানাতে হবে। তা না হলে তোমাকে দেশ থেকে দূর করে দেব। কি জানাবে?'

প্রবীণ এ-কথার কোনো জবাব দেয়নি।

তাকে নীরব থাকতে দেখে রাজা বলল, 'এই কে আছিস, এর পিঠে পঞ্চাশটি ঘা মেরে দেশ থেকে দূর করে দে।'

চাবুক খেয়ে প্রবীণ দেশ ছেড়ে চলে গেল। মনের দুঃখে ভেঙে পড়ল প্রবীণ। এত কষ্ট করে যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে তার প্রতি অশ্রদ্ধা জাগল। শেষে মারা যাবে ঠিক করল।

যেতে যেতে অনেকখানি পথ চলার পর তার সামনে পড়ল একটি শ্মশান। চিতা জ্বলছে। আস্ত একটি মানুষের দেহ পুড়ছে দেখে তার ইচ্ছে করল ওই আগুনে ঝাঁপ দিতে। চিতার কাছে যেতেই নজরে পড়ল পিশাচরা কী যেন করছে!

প্রবীণ পিছনের দিকে সরে গিয়ে ওদের কাজ লক্ষ করল। ওরা বিয়ে বিয়ে খেলছে। কয়েকটা পিশাচ সানাই বাজাচ্ছে। কয়েকটা পিশাচ মাটির হাঁড়ি বইছে। বাকি পিশাচগুলো নাচছে। ওদের কাণ্ড দেখে প্রবীণের হাসি পেল। তার নিজের অবস্থার চেয়েও পিশাচদের অবস্থা অনেক ভালো মনে হল। আরও বিরক্তি জাগল নিজের উপর। আবার সে এগিয়ে গেল চিতায় ঝাঁপ দিতে। কোত্থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দুই পিশাচ প্রবীণকে জিজ্ঞেস করল, 'আগুনে ঝাঁপ দিতে চাইছ কেন?'

'আমি এই আগুনে পুড়ে মরতে চাই। তোমাদের মতো পিশাচ হতে চাই। আনন্দে নাচতে চাই।' প্রবীণ বলল।

'পাগল কোথাকার। তুমি ভাবছ এই আগুনে পুড়ে মরলেই আমাদের মতো পিশাচ হতে পারবে। তুমি জানো না, সবার উপরে মানুষ। মানুষের জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম। তুমি কেন মরতে চাইছ বিস্তারিত বল। তোমার মরতে চাওয়ার পেছনে যদি সঠিক কারণ থাকে তাহলে আমরা তোমাকে মরতে দেব।' ওদের মধ্যে একটি পিশাচ বলল।

'মানুষের চেয়ে হীন জন্ম আর নেই। মানুষের চেয়ে জঘন্য জীব আর নেই। কোনো প্রাণী স্বজাতিকে খায় না। একমাত্র মানুষ মানুষের রক্ত খায়। মানুষের কোনো নীতি নেই। চুরি থেকে শুরু করে যত রকমের অপকীর্তি সে করতে পারে। রাজা প্রজাদের রক্ত শোষণ করে। ধর্ম চাপা পড়ে যায় মানুষের অত্যাচারের দাপটে। পণ্ডিতরা নিজেদের পাণ্ডিত্য রাজাদের কাছে বিক্রি করে। নারী তার ইজ্জত বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

বৈদ্য আজেবাজে ওষুধ দিয়ে রুগিকে সারায় না, মারেও না। ওর কাছ থেকে অর্থ নেয় প্রত্যেক দিন। ওষুধেও আজকাল ভেজাল দেয়। এমনকী শিশুও ভালো ওষুধ পায় না।

এসব দেখে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এবং এইজন্যই আমি চিতার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে শেষ করে তোমাদের মতো পিশাচ হতে চাই।' প্রবীণ বলল।

পিশাচ হেসে বলল, 'তুমি যে অত্যাচারীদের কথা বলছ ওরাই তো মরে পিশাচ হয়। তোমার মতো লোকের তো পিশাচ হওয়ার কোনো উপায় নেই। আমরা বেঁচে থাকতে অনেক পাপ কাজ করেছি। সেইজন্যই পিশাচ হয়েছি। এই দেখ, এ ছিল সুদের কারবারি। লোকের সোনাদানা অল্প টাকায় হাতিয়ে নিত। এর সঙ্গে রাজকর্মচারীদের যোগাযোগ ছিল। আর এই যে পিশাচ তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এ ছিল বৈদ্য। আজেবাজে জিনিস ওষুধ বলে চালাত। এর হাতে অনেক লোক মারা গেছে। এখন আমরা সব পিশাচ হয়ে এক হয়ে গেছি। এখন আমাদের মধ্যে আর ভেদবুদ্ধি নেই। একে অন্যকে ছোটো করা, নষ্ট করার ইচ্ছা নাই। সব যখন ছিল হারানোর ভয় ছিল। এখন আমাদের কিছুই নেই, অতএব হারাবারও ভয় নেই।'

'তাহলে তো আরও ভালোই হল, আমাকেও তোমাদের মধ্যে এক করে নাও।' প্রবীণ বলল।

একটি পিশাচ তার কথার জবাবে বলল, 'তুমি কখনোই পিশাচ হতে পারবে না। ওই দু-জনের দিকে তাকিয়ে দেখ ওরা জাতিভেদ না মেনে একে অন্যকে ভালোবেসেছিল। ওদের বিয়েতে বাবা-মার আপত্তি ছিল। টাকার লোভে পড়ে এক বৈদ্য ওদের বিষ দিল। বিষ দিয়ে সে অনেক অর্থ পেল। যে বৈদ্য অর্থের লোভে এই দু-জনকে বিষ দিয়েছিল তার দেহ এখন ওই চিতায় পুড়ছে। আর যাদের বিয়ে আমরা দিচ্ছিলাম তারাই সেই প্রেমিক যুগল।'

'আমি যদি মরে পিশাচ নাও হই তবুও আমার কাছে মৃত্যুই শ্রেয়। আর আমার বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।' বলে প্রবীণ চিতায় উঠতে গেলেই চিতার ওই দেহ পুড়ে পিশাচ হয়ে প্রবীণকে বাইরে ঠেলে ফেলে দিল।

প্রবীণ রেগে গিয়ে ওই বৈদ্য-পিশাচকে বলল, 'দুটি প্রেমিকের প্রাণ তোমরা নিতে পারলে আর আমাকে তোমরা মরতে দিচ্ছ না কেন? আমি মরতে চাই, আমাকে মরতে দাও।'

'দেখ এখন আমার মধ্যে কোনো পাপবুদ্ধি নেই। তোমার বয়স কম। তুমি একজন বিরাট পণ্ডিত। তুমি লোভী নও। তুমি চরিত্রবান। তোমার পক্ষে আত্মহত্যা করা উচিত নয়।' বৈদ্য-পিশাচ বলল। কিছুক্ষণ ভেবে প্রবীণ বলল, 'এক শর্তে আমি আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকতে পারি। আমি যে কাজ করতে যাব সেই কাজে আমি তোমাদের সাহায্য চাই।'

'কী বল, করতে রাজি আছি।' পিশাচ সানন্দে বলল।

'দেশে যত পিশাচ আছে সবাইকে এখানে ডেকে পাঠাও। ওদের সামনে বলব।' প্রবীণ বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা দেশের পিশাচ ওই শ্মশানে জমা হল। ওদের সামনে প্রবীণ
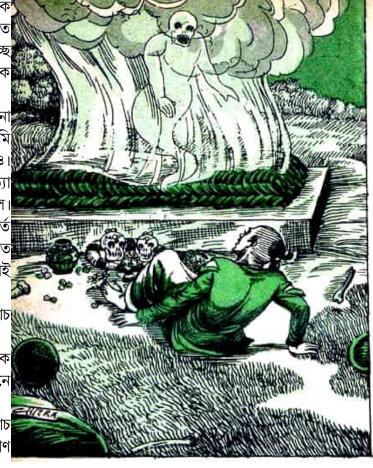
জোরে জোরে বলল, 'তোমরা প্রজাদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার করেছ। এখন তোমরা প্রত্যেকে আমার সঙ্গে রাজার কাছে চল। যা যা করেছ প্রত্যেকে রাজার কাছে সত্য কথা বল। যে মিথ্যা কথা বলবে তাকে এখানকার পিশাচরা কঠিন শাস্তি দেবে।'

প্রবীণের কথামতো প্রত্যেকটি পিশাচ রাজসভায় হাজির হল। শত শত পিশাচকে রাজসভায় ঢুকতে দেখে রাজা ভয়ে কাঁপতে লাগল। রাজার বড়ো বড়ো কর্মচারীরা ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেল। এত পিশাচদের দেখে রাজসভার প্রত্যেকে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

মন্ত্রী ভাবতে লাগল, পিশাচরা কী করতে এসেছে রাজপ্রাসাদে! কোতোয়াল ভাবতে লাগল পণ্ডিত প্রবীণ এতদিন ডুব দিয়ে থেকে শেষে এদের নিয়ে এল কোন উদ্দেশ্যে!

প্রবীণ রাজসভায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলল, 'আপনারা যে অপকর্ম করেছেন তা বিস্তারিতভাবে রাজার সামনে বলুন। যে মিথ্যা কথা বলবে তাকে এই পিশাচরা ধরে নিয়ে যাবে।' তখন একে একে উঠে রাজার সামনে নিজেদের অপকীর্তির কথা কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল। রাজা ওইসব পাপীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করল। তারপর প্রবীণকে বলল, 'প্রবীণ, এখন থেকে তুমি যদি আমার কাছে থাক তাহলে আমি ভালোভাবে দেশ শাসন করতে পারব।'

প্রবীণ তাতে রাজি হয়ে গেল।

প্রবীণ পণ্ডিত যে এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। মন্ত্রী ও সেনাপতি ভাবতে লাগল, এরকম লোক রাজার কাছে থাকলে তো বিপদ। যখন-তখন পিশাচদের নিয়ে আসবে। আর পিশাচদের ক্ষমতার তো কোনো সীমা পরিসীমা নেই। ওদের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। সবাই আতঙ্কিত হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, যে প্রবীণ মরে পিশাচ হতে চাইল সেই প্রবীণ আবার পিশাচদের সাহায্য নিয়ে নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টা করল কেন? যে প্রবীণ রাজার সম্মান গ্রহণ করল না সেই প্রবীণ রাজার কাছে থেকে গেল কেন? শেষে কি সে নিজের পাণ্ডিত্য রাজার কাছে বিক্রি করল? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'প্রবীণ সত্যিকারের একজন পণ্ডিত। বিক্রি করার ইচ্ছা থাকলে আগেই করতে পারত। কিন্তু তখন করলে উপযুক্ত মর্যাদা পেত না। কারণ কুশাসনের ফলে চরম অরাজকতা দেশে বিরাজ করছিল। পাণ্ডিত্যের প্রতি অপমান সহ্য করতে না পেরে প্রবীণ একদিন আত্মহত্যা করতে গেল। কিন্তু পিশাচদের সাহায্য নিয়ে সে সারা দেশের অপরাধীদের রাজার সামনে হাজির করিয়ে তাদের অপরাধ স্বীকার করাল। দেশ থেকে ওই পাপী অত্যাচারী দুরাত্মাদের বিতাড়িত হওয়ার পর প্রবীণ রাজার কাছে থেকে দেশে সুশাসনের কাজে সাহায্য করতে রাজি হল। প্রবীণ এক মুহূর্তের জন্যও নিজের পাণ্ডিত্য রাজার কাছে বিক্রি করেনি। প্রবীণ প্রথম থেকেই চেয়েছিল দেশবাসীর কাছে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে। বিক্রি করতে সে কোনোদিন চায়নি।'

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার সেই গাছে উঠল।

৩৩. কর্তব্য

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে এলেন সেই গাছের কাছে। শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে কাজ করছ তা যতই ছোটো কাজ হোক তুমিও নিশ্চয় বিজয়ের মতো জগতের কল্যাণ কামনা কর। তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব করার জন্য বিজয়ের কাহিনি শোনাচ্ছি। শোনো।'

বেতাল বিজয়ের কাহিনি শুরু করল

বিজয় ছিল মালবের রাজা মার্তণ্ডবর্মার একমাত্র পুত্র। উপনয়নের পর সে লেখাপড়া করার জন্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক গুরু ধরে যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি শিখে যুবাবস্থায় পৌঁছাল। একদিন গুরু বিজয়কে ডেকে বলল, 'শিষ্য, তোমার সমস্ত বিদ্যা অর্জনের পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। তুমি এখন যুবক হয়েছ। যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার সময় হয়েছে। এখন দেশে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন কীভাবে করতে হয় সে অভিজ্ঞতা অর্জন কর। আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবন লাভ কর।'

বিজয় গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একা ঘোড়ায় চড়ে নিজের দেশে ফিরছিল। নিজের দেশের সীমানায় পা দিয়ে যত এগোতে লাগল একটি বিষয়ে ততই তার জ্ঞান বৃদ্ধি হতে লাগল। বিশেষ করে তারা ধারণা হল, তার বাবা নিজের দেশ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পরিচালনা করছে। সে বুঝতে পারল প্রজারা তার অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ। তারা তার বাবাকে এবেলা-ওবেলা অভিশাপ দিচ্ছে। ছোটো ছোটো দলে ওরা রাজার বিরুদ্ধে নানা আলোচনা করছে। বিভিন্ন গ্রামের উপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সে যখন আসছিল তাকে দেখে গ্রামবাসীরা কৌতূহলী হল না।

আরও এগিয়ে বিজয় টের পেল, অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বহু লোক পথে-ঘাটে মরে পড়ে রয়েছে। ওই সব পথ দিয়ে বিজয় ঘোড়ায় চড়ে এসে অন্য এক গ্রামে এল। লক্ষ করল সে গ্রামের লোকও তাকে দেখছে না।

শেষে বিজয় পথের সামনে যে পড়তে লাগল তাকেই বলল, 'আমি রাজার কাছে যাচ্ছি। রাজপ্রাসাদে যুবরাজের মতো একটা বড়ো পদে চাকরি পেয়েছি।'

বিজয়ের কথা শুনে এক বৃদ্ধ বলল, 'বাবা, মালব দেশের রাজপ্রসাদের প্রতি একদিন আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। এখন আমাদের আর ওসব নেই। তোমার বয়সি যুবকেরা চম্পারণ্যে সেনাদের মতো তৈরি হচ্ছে। আজ না হোক কাল ওই যুবকদের নেতা সুধীর মালব দেশের সিংহাসনে বসবেই। মালব রাজাকে উৎখাত করার শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে সুধীর। সুধীরের লোক ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদেও আত্মগোপন করে আছে। সুধীরের নির্দেশ পেলে ওরা যেকোনো মুহূর্তে রাজপ্রাসাদটাকে উড়িয়ে দিতে পারে। রাজপ্রাসাদ ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। একবার যদি সুধীর সিংহাসনে বসতে পারে তাহলে আর প্রজাদের দুঃখদুর্দশা থাকবে না। প্রজারা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারবে।'

বুড়োর কথা শুনে দেশের অবস্থার একটা ছবি পরিষ্কার দেখতে পেয়ে বিজয় হতবাক হয়ে গেল। তারপর সে আর রাজপ্রাসাদের দিকে না গিয়ে সোজা রওনা দিল চম্পারণ্যের দিকে। ওই ঘন বনের মাঝখানে সে দেখল একটি নগর গড়ে উঠেছে। নগরের মতো সেখানে ঘন বসতি রয়েছে। কিন্তু নগরের মতো কোঠাবাড়ি নেই। নানা বয়সের লোক নেই। আছে শুধু যুবক। দু-এক-শো নয়, এক লক্ষেরও বেশি। ওরা পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে ওদের যুদ্ধ করার শিক্ষা দিচ্ছে। রাজা খবর পেয়ে আজ পর্যন্ত যত লোককে ওই অঞ্চলে পাঠিয়েছিল তারা কেউ রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে পারেনি। সেখানকার যুবকদের কাছে
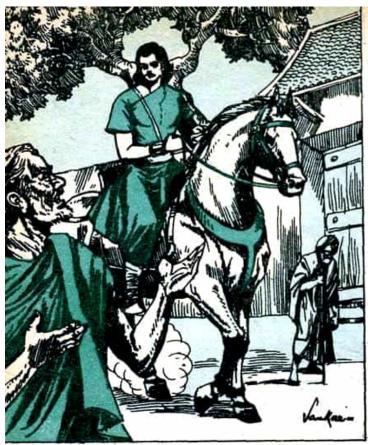
ধরা পড়ে হয় প্রাণ হারিয়েছে আর না হয় যুবকদের কথামতো চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রাণে বেঁচেছে। একজনও প্রাসাদে ফিরে আসতে পারেনি। শেষে রাজা এক সেনাবাহিনীকে ওই অঞ্চলে পাঠাল। ওই সেনাদল চম্পারণ্যে ঢোকার মুখে পাহাড়ের উপর থেকে পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বিরাট বিরাট পাথর অনেক উঁচু থেকে তাদের গায়ে পড়ায় সেই সৈনিকদলের প্রত্যেকে সেখানেই মারা গেল।

বিজয় চম্পারণ্যে ঢোকার মুখে হঠাৎ চার জন তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করল।

'আমার নাম বিনয়। আমি যোদ্ধা। অনেক রকমের যুদ্ধবিদ্যা আমার জানা আছে। আমি সুধীরের অধীনে সেনা হিসেবে থাকার উদ্দেশ্যে চম্পারণ্যে ঢুকছি।' বলল বিজয়।

যুবকেরা বিজয়কে এক বড়ো গুহার ভিতরে নিয়ে গেল। সেখানে সুধীর অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিল। কাছাকাছি বসে বহু যুবক তার কথা মন দিয়ে শুনছিল। বিজয়ও তাদের পাশে বসে শুনতে লাগল। সুধীর বলল, 'রাজা মানে কী? রাজা কীভাবে হয়? যার ক্ষমতা বেশি সেই রাজা হয়ে যায়। যে রাজা প্রজাদের কাজ দেয়, খেতে দেয়, পরতে দেয়, শিক্ষা দেয় সেই রাজা টিকে যায়। যে রাজা শুধু ক্ষমতা দেখায়, খেতে দিতে পারে না, সে রাজা আসলে ক্ষমতাবান রাজা নয়। মার্তণ্ডবর্মা শুধু যে ক্ষমতাহীন রাজা তাই নয় তার বিবেকও নেই। তার বাবা এবং ঠাকুরদা যেহেতু রাজা ছিলেন অতএব তিনিও রাজা হয়ে গেলেন। মার্তণ্ডবর্মার ঠাকুরদাই ওদের বংশের প্রথম রাজা হন। প্রথমে তিনি সাধারণ দলপতি ছিলেন। তাঁর আমলের দুর্বল ও অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করে তিনি রাজা হয়েছিলেন। মার্তণ্ডবর্মার বাবা বুদ্ধি এবং বল দুটোই প্রয়োগ করে দেশ শাসন করতেন। আজ আমরা যে মার্তণ্ডবর্মার অধীনে আছি উনি একদিকে যেমন আমাদের খেতে না দিয়ে মারছেন আবার অন্যদিকে আমাদের উপর অত্যাচারের নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। তাই এই অবস্থায় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। বহু প্রজাকে রাজা মেরে ফেলেছে। এখন আমরা রাজাকে মেরে ফেলব। রাজাকে মেরে ফেলার পর যারা খুশি হবেন, যারা উৎসব করবেন তারা ঠিক করবেন দেশের শাসন কীভাবে হবে, কারা করবে।'

সুধীর এই ধরনের কথা অনেকক্ষণ ধরে বলল। ওর প্রত্যেকটি কথা যুবকরা যেন কান খাড়া করে শুনছিল। ওরা যেন তার কথাকে গিলছিল। ওই যুবকেরা বিজয়কে সুধীরের কাছে নিয়ে গেল। সুধীরের কাছে বিজয় নিজের পরিচয় গোপন করে নিজের নাম বিনয় বলে জানাল। সে জানাল যে মালব দেশের রাজার অধীনে রাজপ্রাসাদে একটি বড়ো পদে চাকরি করার জন্য সে যাচ্ছিল। কিন্তু পথে সুধীরের কথা শুনে সুধীরের উদ্দেশ্য জেনে সে সোজা চম্পারণ্যে এসেছে সুধীরের অধীনে থাকার জন্য।

সুধীর বিজয়ের যুদ্ধবিদ্যার পরিচয় পেয়ে পরীক্ষা করে দেখে খুব খুশি হয়ে বলল, 'আমাদের সেনাদলে নানা রকমের যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ বহু যোদ্ধা আছেন। কিন্তু তোমার মতন নিপুণ যোদ্ধা বেশি নেই। রাজার

বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন কিন্তু আমরা তোমাকে বিরাট দায়িত্ব দিতে চাই।'

বিজয় খুব খুশি হয়ে কী যেন বলতে গেল। এমন সময় দূর থেকে সুধীর সংকেত পেল। সঙ্গেসঙ্গে কোনো কিছু মোকাবিলার জন্য অনেকগুলো দলে নিজের সেনাদের ভাগ করে নিল। একটি দলের নেতৃত্ব দিল বিজয়কে। বিজয় রাজি হল।

রাজার সেনাদের মোকাবিলার জন্য সুধীরের সেনাও তৈরি ছিল। গভীর অন্ধকারে বিজয় বিভিন্ন শিবিরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে রাজপ্রাসাদে এসে দরজায় টোকা মারল।

'কে?' ভেতর থেকে আওয়াজ এল।

'আমি যুবরাজ। বিজয় বর্মা।' বলল বিজয়।

দরজা খুলে গেল। দেখা গেল তরবারি উঁচিয়ে একটা সেনা দাঁড়িয়ে আছে।

'তরবারি নামাও। আমি শিক্ষালাভ করার জন্য বহু বছর বিদেশে ছিলাম। ফেরা পথে শত্রু সেনাদের মধ্যে পড়ে গেছি। রাজার কাছে যাচ্ছি। একটি সেনাকে পাঠাও।' বলল বিজয়।

দরজার কাছে অন্য এক সৈনিককে রেখে যে সৈনিক দরজা খুলেছিল সেই বিজয়কে এগিয়ে দিতে গেল। রাজার কাছে যে পাহারাদার ছিল সে বিজয়কে চিনতে পেরে নমস্কার করে বলল, 'কবে এলেন প্রভু?'

ছেলে এসেছে শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মার্তণ্ডবর্মা উঠে এগিয়ে এল।

বিজয় বলল, 'বাবা, তোমার সঙ্গে আমার অত্যন্ত জরুরি কথা আছে। এখানে আর কারোর থাকার দরকার নেই। শুধু আমি আর তুমি থাকব।'

গোপন কক্ষে বসে মার্তণ্ডবর্মা বলল, 'যে কথা কালকে বললেও চলবে সে-কথা তুমি কালকে বল। এই মুহূর্তে যে কথা না বললেই নয় সে-কথা বল।'

'তুমি এই মুহূর্তে সিংহাসন ছেড়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাও। তা যদি না যাও তাহলে তোমার বাঁচার কোনো পথ নেই।' বিজয় বলল।

রাজা মার্তণ্ড ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি আমার মৃত্যুকামনা করছ? আমি বেঁচে থাকতেই সিংহাসনে বসতে চাও? এত বছরে এই শিক্ষালাভ করেছ?'

'যদি তাই তোমার মনে হয় তবে তাই হোক। তুমি তো সরবে না, আমাকেই তোমায় সরাতে হবে।' বলে বিজয় তরবারি দিয়ে বাবাকে মেরে ফেলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্তঃপুরের সবাই জেনে গেল যে রাজা মারা গেছে। ছোটাছুটি পড়ে গেল মন্ত্রী ও সেনাদের। আশ্চর্য রাজার মৃত্যুতে কেউ দুঃখপ্রকাশ করল না। কিছু লোক প্রশংসা করল।

সকাল পর্যন্ত নানারকম আলোচনা চলতে লাগল। সাতসকালে বিজয়কে রাজসিংহাসনে সাড়ম্বরে বসানো হল। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের সেনাদের মধ্যে দ্বিধা দেখা গেল। রাজা বিজয়বর্মা সাদরে সুধীরকে ডেকে পাঠাল। সুধীর প্রাসাদে এসে বুঝতে পারল যে বিজয় নিজের পিতাকে হত্যা করে রাজা হয়েছে। বিজয় ও বিনয় একই ব্যক্তি। এই অবস্থায় সুধীর বিজয়ের ওপর খুব খুশি হল। সুধীর বিজয়কে বলল, 'তুমি রাজা হয়েছ এটা আমাদের কাছে আনন্দের খবর। আশা করি তোমার অধীনে প্রজারা সুখে থাকতে পারবে।'

রাজা বিজয়বর্মা তৎক্ষণাৎ বলল, 'সে কাজ তোমাকে ছাড়া কিছুতেই করা যাবে না। তোমাকে এই দেশের সেনাপতি হতে হবে। তুমি আমাকে উপদেশ দেবে দেশের মঙ্গলের জন্য আমার কী করা উচিত?' সুধীর সম্মত হল।

গুরুর কাছে বিজয় দীর্ঘকাল ধরে যে অধ্যয়ন করেছিল তা বৃথা যায়নি। ন্যায় এবং ধর্ম রক্ষা করে বিজয় বহুকাল দেশ শাসন করে প্রজাদের আশীর্বাদ পেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, দেশ শাসনের মূল মন্ত্র কী? কীসের জোরে রাজা দেশ শাসন করতে পারে? গুরুর আশীর্বাদের জোরে? সুধীরের মতো লোকের সাহায্যের জোরে? প্রজাদের প্রতি প্রীতি

ও ভালোবাসার জন্যে? নাকি পিতার প্রতি বিদ্বেষের ফলে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে মাথা ফেটে চৌচির হবে।'

এই কথার জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'প্রত্যেক রাজাই প্রজাদের ভালোবাসা চায়। ভালোবাসা কীভাবে পেতে হয় তাও জানে। কিন্তু প্রজাদের কীভাবে দীর্ঘদিন ভালো রাখতে হয় তারজন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তা বহু রাজার থাকে না। বিজয় শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরল। সুধীরের কাছে গিয়ে তার চোখ ফুটে গেল। বুঝতে পারল দেশের মানুষের সত্যিকারের প্রতিনিধি সুধীর। তাকে ছাড়া দেশ শাসন করতে গেলে দেশের নাড়ির খবর জানা যাবে না। বিজয় তার বাবাকে মেরে ফেলত না। সে রাত্রে তার বাবা তার উপদেশ শুনল না। তার বাবাকে সুধীরের দল মেরে ফেললে রাজা হয়ে যেত সুধীর। তাই বাবাকে মেরে ফেলে সে রাজা হল এবং সুধীরকে সেনাপতি করল।

রাজা এভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে আবার সেই গাছে উঠল।

৩৪. তিন জন তিরন্দাজ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছে উঠে শবদেহ নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'মহারাজ, তোমার প্রতিভার তুলনা নেই। তবে তোমার প্রতিভাই শেষ নয়। তুমি শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান নাও হতে পার। মনে রেখো, জগতে সব্যসাচীর মতো লোকও আছে। তুমি হয়তো তার কাহিনি শোনোনি। শোনো, বলছি। এই কাহিনি শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রমও কমে যাবে।' তারপর বেতাল কাহিনি শুরু করল

এক দেশে এক তিরন্দাজ ছিল। সে ডান হাতে এবং বাঁ-হাতে তির চালাতে পারত। উড়ন্ত পাখিকে যে-কোনো হাতে তির চালিয়ে মেরে ফেলত। তার এই গুণ থাকায় সে সব্যসাচী উপাধি পেল। প্রত্যেকে তার তির চালানোর দক্ষতার প্রশংসা করতে লাগল। সব্যসাচী বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে লাগল তার চেয়ে দক্ষ তিরন্দাজ আছে কি না খোঁজ করতে।

বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় সে বহু লোককে আনন্দ উৎসব করতে দেখল। ওদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে সেখানে দুর্গা পূজা হচ্ছে। এবং এই দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে তির চালানোর প্রদর্শনীও হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গার নামকরা ও পটু তিরন্দাজরা সেখানে উপস্থিত হয়েছে। সব্যসাচী ঠিক করল সেও এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করবে। বহু লোক সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। একজন অন্ধ তিরন্দাজকেও সব্যসাচী দেখতে পেল।

তির চালানো শুরু হল। একের-পর-এক তিরন্দাজ আসছে। তির চালাচ্ছে। একবার করে ঘণ্টা পড়ে নতুন নতুন তিরন্দাজ আসে। তির চালায়। দূরে একটি ঘণ্টা রাখা আছে। সেই ঘণ্টা বেজে উঠল। মুহূর্তে অন্ধের চালানো তির সেই ঘণ্টায় গিয়ে লাগল। দর্শকরা মহানন্দে হাততালি দিল। এই দৃশ্য দেখে সব্যসাচী হতবাক হয়ে গেল।

সব্যসাচী অন্ধ তিরন্দাজের কাছে গিয়ে বলল, 'দাদা, আমি উড়ন্ত পাখিকে ডান হাতে অথবা বাঁ-হাতে তির চালিয়ে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু তোমার ক্ষমতা দেখে আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমি তো ধ্বনি শুনে লক্ষ্যভেদ করতে পারি না। অনেক পেছিয়ে আছি।'

তার কথা শুনে অন্ধ তিরন্দাজ বলল, 'তুমি হয়তো ঠিক কথাই বলেছ। আমি শব্দ শুনে তির চালাই বলে আমাকে শব্দভেদী বলে লোকে জানে। যারা আমার মতো অন্ধ তাদের তো প্রশ্নই ওঠে না। যাদের চোখ আছে তারা চোখে কাপড় বেঁধে তির চালায়। জন্মান্ধ শব্দভেদী তিরন্দাজ পৃথিবীতে আর নেই বলেই জানি।

'তোমার মতো দক্ষ তিরন্দাজের খোঁজেই আমি বেরিয়েছি। তির চালানোর যত রকম কৌশল আছে সবগুলি আমার শেখার ইচ্ছে আছে।' সব্যসাচী বলল।

'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।' অন্ধ তিরন্দাজ বলল।

দু-জনে রওনা হল। যেতে যেতে ওরা ধর্মপুরের অরণ্যে পৌঁছাল। সেখানে পৌঁছে ওরা যা জানল তাতে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। গাছের আড়ালে হাত বিহীন একটি লোক চুপচাপ বসে আছে। সে বাঁ-পায়ে ধরেছিল ধনুক। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিরটাকে মুখে ধরে ছুড়ে দিল। চোখের পলকে একটি গাছ থেকে এক জোড়া পায়রা মাটিতে পড়ে গেল। সব্যসাচী যা দেখল তাতে তার আশ্চর্যের সীমা রইল না। সে ব্যাপারটা অন্ধ তিরন্দাজকেও বলল।

অন্ধ তিরন্দাজ বলল, 'তাহলে তো এই তিরন্দাজ আমাদের দু-জনের চেয়ে অনেক বেশি পটু।'

ওরা দু-জনে ওই হাত বিহীন তিরন্দাজের কাছে গিয়ে তার প্রশংসা করে বলল, 'তোমার মতো হাত বিহীন পাকা তিরন্দাজকে আমরা কোথাও দেখিনি। তা ছাড়া তোমার লক্ষ অভ্রান্ত।' তারপর ওরা নিজেদের পরিচয় দিল।

'আমি শুনেছি আমার মতো দক্ষ পায়ে ধনুক আর তির চালানোর লোক আর নাকি কেউ নেই। সেইজন্যই আপনারা হয়তো দেখেননি আমার মতো তিরন্দাজ।' হাত বিহীন তিরন্দাজ বলল।

তারপর সব্যসাচী অন্ধ ও হাত বিহীন তিরন্দাজকে বলল, 'আমরা তিন জনেই তির চালানোর ব্যাপারে যথেষ্ট কুশলী। রাজাকে বলে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারি এবং সেই প্রদর্শনীতে আমরা আমাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারি। তার ফলে বহু পুরস্কারও পেতে পারি।'

'তা তো ঠিক। কিন্তু রাজা যদি তিন জনকে পুরস্কার দেন তখন সেই পুরস্কার আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব কী করে?' বলল হাত বিহীন লোকটা।

'কেন তিন জনের মধ্যে সমান ভাগ হয়ে যাবে। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন উঠবে কেন?' সব্যসাচী বলল।

এই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বলল হাত বিহীন তিরন্দাজ, 'আমাদের তিন জনকে যদি রাজা আলাদা আলাদা পুরস্কার দিতেন তাহলে রাজা নিশ্চয়ই আমাকে বেশি পুরস্কার দিতেন। তোমরা দু-জন তো হাত দিয়ে তির চালিয়ে দিতে পার। আমার অবস্থা রাজার নজরে পড়বে না?'

'কী যে বললে বুঝলাম না। চোখটাই তো আসল। চোখ থাকলে লক্ষ্যভেদ করার অসুবিধা কোথায়? আমি জন্ম থেকেই অন্ধ। রাজা আমার তির চালানো দেখেই আমাকে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার দিতেন। অন্ধ তিরন্দাজ বলল।

এসব তর্কবিতর্ক সব্যসাচীর ভালো লাগল না। সে বলল, 'আগে যাই তো রাজার কাছে। বিচারের ভার না হয় আমরা রাজার উপরেই ছেড়ে দেব।'

অদূর থেকে ওদের কথাবার্তা শুনে এক পাহাড়ি মেয়ে বলল, 'ধর্মপুরের রাজা তোমাদের পুরস্কার আলাদা আলাদা ভাবে দেবেন না। একসঙ্গেই দেবেন। তোমরা কীভাবে ভাগ করে নেবে সে কৌশল আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সব্যসাচী বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমাদের মধ্যে তোমার নাক গলানোর কোনো দরকার নেই। তুমি এমনভাবে বলছ যেন রাজা আমাদের উপহার দিয়ে দিয়েছেন।'

তাতে সে খিলখিল করে হাসল।

'অমন করে হাসছ কেন?' শব্দভেদী তাকে জিজ্ঞেস করল। তখন সে হাসতে হাসতে বলল, 'কেন আবার। তুমি তো অন্ধ। আর ওর তো হাত নেই। তোমাদের দু-জনকে ঠকিয়ে এই লোকটা রাজার সব পুরস্কার মেরে দেওয়ার তালে আছে।'

তার কথায় হাত বিহীন লোকটা বলল, 'ঠিক বলেছ। আমাদের দোষ-গুণের বিচার আমরা এতক্ষণ করতে পারিনি। তুমি ঠিক সময়ে ধরিয়ে দিয়েছ। এতই যখন উপকার করলে তখন কার কত পাওয়া উচিত ঠিক করে দাও।'

'তার আগে তোমাদের তিন জনের ক্ষমতা আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।' পাহাড়ি মেয়ে বলল।

তার এই প্রস্তাবে তিন জনই রাজি হল। প্রথমে হাত বিহীন লোকটা তির ছুড়ে গাছের ডালে বসা একটা পাখিকে মেরে ফেলল। অন্ধ তিরন্দাজ অদূরে যে পাখি ডাকছিল তাকে তিরবিদ্ধ করল। আর সব্যসাচী উড়ন্ত দুই পাখিকে দুই হাতে মেরে ফেলে দিল।

সব দেখে-শুনে সে সব্যসাচীকেই সবচেয়ে বড়ো তিরন্দাজ বলে ঘোষণা করল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দিল যথাক্রমে শব্দভেদী এবং হাত বিহীন তিরন্দাজকে।

তৎক্ষণাৎ রেগে গিয়ে হাত বিহীন লোকটা চিৎকার করে বলল, 'তির চালানোর ব্যাপারে তোমার কি জ্ঞান আছে? তুমি বনে-বাদাড়ে থাক? তির-ধনুকের মর্ম তুমি কী করে বুঝলে? তোমার মতো অজ্ঞের বিচার মানবে কে?'

'আমার বিচার না মানলে আমার কিছু যাবে আসবে না। তোমরাই আমার কাছে বিচার চেয়েছ। আমি বিচার করে দিলাম। আর তির-ধনুকের ব্যাপার বলছ? তোমার হাতের তির-ধনুক আমাকে দাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' বলে হাত বিহীন তিরন্দাজের তির-ধনুক নিয়ে নিল।

একটি গাছে এক জোড়া পাখি বসেছিল। ওদের দিকে তির ধরে সে বলল, 'ওই এক জোড়া পাখির দিকে তাকাও। ওদের দু-জনের মধ্যে কতটুকু ফাঁক আছে।'

'আহা পাখি দুটো বুঝি স্বামী-স্ত্রী। ওদের একটিকে মেরে অন্যটির অভিশাপ কুড়োবে?' হাত বিহীন তিরন্দাজ বলল।
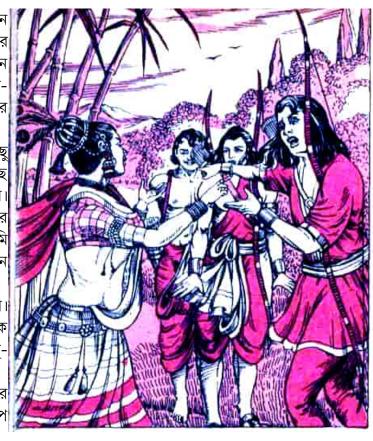
'দেখ, কী করি!' বলতে বলতে সে তির ছুড়ল। মুহূর্তে তির বসে থাকা এক জোড়া পাখির মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। পাখি দুটো নড়লও না। তা দেখে হাত বিহীন লোকটা অবাক হয়ে গেল।

যা ঘটল তা শুনে শব্দভেদী অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল। ওরা রাজার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, পাহাড়ি যুবতী নিজেই তির ছোড়ার ব্যাপারে অতখানি দক্ষ হয়ে ওদের মধ্যে সব্যসাচীকেই প্রণাম করল কেন? আর ওরাই বা শেষে রাজার কাছে যাবার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'পাহাড়ি কন্যার বিচারে কোনো ভুল ছিল না। ওদের মধ্যে সব্যসাচী যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ইচ্ছে করলে সে বাকি দু-জনের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু ওরা সব্যসাচীর মতো দু-হাতে তির চালাতে পারবে না। অন্ধ তিরন্দাজ শব্দ না শুনে তির চালাতে পারে না। হাত বিহীন লোকটা পা এবং মুখ দিয়ে তির চালানো ছাড়া অন্য কোনোভাবে তির চালাতে পারে না। সব্যসাচী বাদে অন্য দু-জন লক্ষ্যভেদকারী হলেও পাকা তিরন্দাজ হতে পারে না। ওরা কাজের তিরন্দাজ নয়। ওরা রাজার কাছে যে গেল না তার একটা কারণ অছে। যে তির-ধনুক না নিয়ে বেড়াচ্ছিল তার যদি এতটা ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে আশেপাশে ওদের স্বজাতি যেসব ব্যাটাছেলেরা তির-ধনুক নিয়ে ঘুরছে তারা যে কত বড়ো দক্ষ তিরন্দাজ সেটা অনুমান করা যায়। তাই সব্যসাচী এবং অন্য দু-জনের সন্দেহ জাগল যে ওরা আদৌ রাজাকে খুশি করে পুরস্কার আনতে পারবে কি না।' রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গিয়ে গাছে উঠল।

৩৫. যখন যা হওয়ার

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ওই গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছের উপরে উঠে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'মহারাজ, কপালের লিখন মুছে ফেলার জন্য অনেকে অনেক রকমের চেষ্টা করে থাকে। তাদের চেষ্টায় ফাঁকিও থাকে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে সেই লিখন মুছে ফেলার চেষ্টা ফলবতী হয় না। অতএব চেষ্টা করারও কোনো মানে হয় না। নিরর্থক প্রয়াস। আমার কথা যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ স্বরূপ আমি একটি কাহিনি বলছি। শুনলে বুঝতে পারবে যে তোমার মতো অতীতেও কোনে কোনো লোক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি।' বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে চন্দনপুরের রাজা ছিলেন নন্দনবর্মা। অনেক বছর পরে, হয় না, হয় না, শেষে তাঁর একটি ছেলে হল। রাজা নিজের জ্যোতিষীকে ডেকে ছেলের ঠিকুজি তৈরি করালেন।

জ্যোতিষী রাজার কাছ থেকে বাড়ি ফিরে আসতেই দেখে তার স্ত্রীও আঁতুড়ঘরে। তার একটি ছেলে হল। জ্যোতিষী রাজার ছেলের ভবিষ্যৎ এবং নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ গণনা করে ঠিকুজি লিখে পাশাপাশি রেখে বিচার করতে লাগল। ঠিকুজি অনুসারে তার ছেলের কুড়ি বছর বয়সে রাজযোগ আছে। সেইসময় রাজার ছেলের দুটো সাংঘাতিক ফাঁড়া আছে।

প্রথমে জ্যোতষী ভাবল, যা সত্য তাই বলে দেবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখল, তা করা ঠিক হবে না। অপ্রিয় সত্য কথা বলার বিপদ আছে। নিজের ছেলে রাজা হবে আর ঠিক সেইসময় রাজার ছেলের দুটো ফাঁড়া আছে। বিষয়টি রাজা যখন খতিয়ে বিচার করবেন তখন কী ভাববেন কে জানে! আবার রাজা সত্য ঘটনা জেনে কুড়ি বছরের আগেই যজ্ঞ করে ফাঁড়া কাটিয়ে দিতে পারেন। কুড়ি বছরের আগেই ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারেন।

অনেক ভেবে জ্যোতিষী ঠিক করল রাজাকে মিথ্যা কথাই বলবে। সে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আপনার পুত্রের ভাগ্য খুব ভালো। তবে কুড়ি বছর বয়সের আগে তাকে কোনোক্রমেই সিংহাসনে বসানো উচিত হবে না।'

রাজা নিজের ছেলের নাম রাখল আনন্দবর্মা। জ্যোতিষীর ছেলের নাম হল সুন্দরসেন। দু-জনে একই শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শুরু করল। দু-জনের গুরু এক। দু-জনেই একই সময় কুড়ি বছর বয়সে পা রাখল। একদিন জ্যোতিষীর ছেলে সুন্দরসেন বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি যা শিখেছি তা সম্পূর্ণ করতে হলে দেশে দেশে ঘুরতে হবে। তাই দেশান্তরে যাওয়ার অনুমতি চাইছি।'

'অনুমতি আমি দিতে পারি। তবে একটা শর্তে। ছ-মাসের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। আর তা যদি না পার যেতে দেব না।' জ্যোতিষী বলল।

সুন্দরসেন বাবার কথামতো ছ-মাসের মধ্যে ফিরে আসতে রাজি হল। রওনা হয়ে গেল সেই দিনেই।

ছ-মাস হয়ে গেল। কিন্তু সুন্দরসেন ফিরে এল না। জ্যোতিষী খুব দুর্ভাবনায় পড়ল। ছ-মাস পরে প্রতিটি দিন ছেলের আসার অপেক্ষায় কাটাতে লাগল জ্যোতিষী। একমাস দু-মাস করে পাঁচ মাস কেটে গেল। কিন্তু সুন্দরসেন আসেনি। এদিকে রাজার ছেলের যে দুটো ফাঁড়া ছিল তারও কোনো হদিশ পেল না। ছেলের কিছুই হল না। তার দু-মাসের মধ্যে আনন্দবর্মাকে সিংহাসনে বসানোর কথা। রাজা নন্দনবর্মা ঘোষণা করে দিলেন। ঘোষণার পর জ্যোতিষীর মনে আরও চাঞ্চল্য দেখা দিল।

কিছুতেই কিছু যখন হল না জ্যোতিষী ঠিক করল, রাজার ছেলে সন্ধের সময় যখন গাছের নীচে বসবে তখন তার মাথায় একটি পাথর ফেলে দেবে। সে একটি বড়ো পাথর এমনভাবে গাছে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল যাতে দূর থেকে দড়ি টেনে পাথরটা আনন্দবর্মার মাথায় ফেলা যায়।

সব ঠিকঠাক। আনন্দবর্মা যথাসময়ে সেই গাছের নীচে এল। বসল। জ্যোতিষী দূর থেকে দড়িতে টান দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে অদূরের একটি ফুল তুলে আনার জন্য আনন্দবর্মা উঠে গেল। তার উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড়ো পাথর পড়ার শব্দ হল। আনন্দবর্মা ফিরে দেখে, সে যেখানে বসেছিল সেখানেই পাথরটা পড়ে আছে। অবস্থা দেখে আনন্দবর্মা অবাক হল। কাছে গিয়ে দেখে, পাথরের সঙ্গে একটি দড়ি বাঁধা আছে। বুঝল, তাকে মেরে ফেলার জন্য কেউ এসব করেছে। কিন্তু সে কাউকে বলল না। সে ভাবতেও পারল না।

এদিকে জ্যোতিষীর মনে ধিক্কার জাগল। তার মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি তার এত বছরের শিক্ষা সব মিথ্যা! রাত্রে সে একটা ছোরা নিয়ে আনন্দবর্মার শোওয়ার ঘরে ঢুকল। উদ্দেশ্য তাকে ছোরা মেরে হত্যা করা। সেইসময়, না জানি কেন পাহারাদাররা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। ঘরে ঢুকে আনন্দবর্মার বুকে ছোরা মারতে যেতেই সে উঠে জ্যোতিষীর হাত ধরে ফেলল।

আনন্দবর্মা বিস্ময়ে বলে উঠল, 'আজ সন্ধ্যায় পাথর মাথায় ফেলে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা তুমিই তাহলে করেছিলে। আমি বুঝেছিলাম, কিছু একটা ঘটবে আমার জীবনে। তাই আজ রাত্রে পাহারাদারকে বলেছিলাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার মতো অভিনয় করতে। পাহারাদার কাঠ হয়ে পড়েছিল। তুমি ভাবলে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

জ্যোতিষী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, গত কুড়ি বছরের ঘটনা সংক্ষেপে আনন্দবর্মাকে বলল। শুনে আনন্দবর্মা হো হো করে হেসে উঠল, 'এ তো আনন্দের কথা। তোমার গণনার মতোই তো সব কিছু ফলেছে। আমার জীবনে দুটো ফাঁড়া ছিল। দুটোই তো ফলে গেল। আর তোমার ছেলে যে এই দেশেরই রাজা হবে সেটা তো আর তোমার গণনায় ছিল না। অন্য দেশেও তো হতে পারে।'

আনন্দবর্মা যা অনুমান করেছিল তাই হল। সুন্দরসেন দেশে দেশে ঘোরার সময় সে এক রাজাকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। রাজা প্রাণে বেঁচে সুন্দরসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। সেই রাজা ছিল বৃদ্ধ। তার কোনো ছেলে ছিল না। খবরটা চন্দনপুরের রাজার কাছেও পৌঁছাল। হঠাৎ রাজা হওয়ার ফলেই সুন্দরসেন ছ-মাসের মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারেনি। বাপকে যে কথা দিয়েছিল তা রাখতে পারেনি। এত বড়ো ঘটনার পরেও আনন্দবর্মা জ্যোতিষীর উপর কোনো প্রতিশোধ নেয়নি। তাকে তার ছেলের কাছেও পাঠিয়ে দেয়নি। বরং নিজের কাছেই জ্যোতিষীকে রেখে দিল। কিন্তু জ্যোতিষী সে দেশে

থাকতে আর চাইল না। আনন্দবর্মার সামনে সে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারত না। তাই একদিন স্বেচ্ছায় সে সপরিবারে ছেলে যে দেশের রাজা হয়েছে সেই দেশে চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, যে জ্যোতিষী দু-দু-বার তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করল সেই জ্যোতিষীকে আনন্দবর্মা ক্ষমা করল কেন? লোকে যে বলে বিধাতার লিখন মানুষের মাধ্যমেই ফলবতী হয় তাহলে জ্যোতিষীর চেষ্টা বিফল হল কেন? জ্যোতিষী এত চেষ্টা করেও যখন পারল না, বিধাতার ইচ্ছা অনুযায়ী আনন্দবর্মা যখন বেঁচেই গেল তখন আমাদের বুঝতে হবে মানুষের চেষ্টা বৃথা। তাই না? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই কথার জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আনন্দবর্মা বুঝেছিল যে জ্যোতিষীর গণনা সঠিক। তাই জ্যোতিষীকে তার কাছেই থাকতে বলল। জ্যোতিষী মনে মনে আনন্দবর্মাকে স্নেহ করত। একদিন সে যা করল তা তার মতিভ্রমের ফল। তারপর যখন ধরা পড়ল, আনন্দবর্মা যখন ক্ষমা করল তখন সে মনে মনে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। তাই সে একদিন আর থাকতে না পেরে স্বেচ্ছায় সপরিবারে মাথা নীচু করে নিজের ছেলের রাজত্বে চলে গেল।

রাজার এভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গেল সেই গাছে।

৩৬. নরক থেকে ফেরা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছে উঠে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, 'রাজা শব নিয়ে স্বর্গে যাওয়ার কথা শুনেছি। কিন্তু শব নিয়ে নরকে যাওয়ার কথা কি কখনো কানে গেছে? আমি শুনেছি। আমি সেই কাহিনি শোনাতে চাই। শুনলে তোমার পথ হাঁটার পরিশ্রম লাঘব হবে।' এই কথা বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল

হেমন্ত দেশে এক বিধবা ছিল। তার কুসুমাবতী নামে এক কন্যা ছিল। কন্যাটি যখন শিশু তখনই তার বাবা মারা যায়। ওদের বিষয়সম্পত্তি কিছু ছিল না। ফলে বিধবাকে ভিক্ষে করে বাঁচার চেষ্টা করতে হয়। বিধবা কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যায়নি। কোনো একটি লোকের ঘাড়ে চাপেনি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে যা পেত তাই খেয়ে মেয়েকে বাঁচাত এবং নিজেও বাঁচত। মেয়ে যখন বড়ো হল তখন বিধবা বুড়ি হল। বাড়ি বাড়ি ঘোরার ক্ষমতা তার রইল না। মার এই অবস্থা দেখে কুসুমাবতী বলল, 'মা, আমার ছোটোবেলা থেকেই অনেক কষ্ট করছ। আমি এখন বড়ো হয়েছি। আমার শরীরে খাটার মতো শক্তি আছে। তুমি আর এইভাবে ঘোরাঘুরি করো না। তার চেয়ে এক কাজ কর আমাকে কোনো বাড়িতে থেকে কাজ করার ব্যবস্থা করে দাও। সারাদিন আমি ওদের বাড়িতে থাকব। কাজ করব, খাব। এখন থেকে তোমার খাওয়ার পরার ভার আমার।'

মেয়ের এই কথায় বিধবা রাজি হল। ওরা কাজের জন্য বাড়ি বাড়ি খোঁজ করল। শেষে অনেক বড়োলোকের বাড়িতে খোঁজ করেও কাজ পেল না। ঘুরতে ঘুরতে অন্য গ্রামে চলে গেল। রাত হয়ে গেল। এক বড়ো বাড়ি দেখে বাড়ির বড়ো গিন্নিকে ডেকে বলল, 'মা, অনেক রাত হয়ে গেছে। আমরা মেয়েমানুষ। এই রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারছি না। রাতটা আপনার দাওয়ায় কাটিয়ে দিতে চাই। দয়া করে থাকতে দিন।'

বাড়ির বড়ো গিন্নি বুড়ি এবং মেয়ের কথায় শুধু যে রাজি হল তাই নয় ওদের পেট ভরে খেতেও দিল। তারপর ভালো জায়গায় ওদের ঘুমোতে দিল।

পরের দিন কুসুমাবতী ওই বাড়ির বড়ো গিন্নিকে বলল, 'মা, আপনার বাড়িতে যদি কাজের লোকের দরকার থাকে তবে আমাকে রাখতে পারেন। আমি আপনার সমস্ত কাজ করতে পারব। যখন যে কাজ বলবেন করব। টাকাপয়সা কিছু চাই না। আপনার বাড়িতে আমি এবং মা শুধু দু-বেলা দু-মুঠো খেতে চাই।'

'এ বাড়িতে কাজের কি অভাব আছে মা। তোমার মতো ভালো মেয়ে আমিও খুঁজছিলাম। আজ থেকে তুমি এবং তোমার মা এখানেই থেকে যাবে।' বলল বড়ো গিন্নি।

ওদের বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি ঘর ছিল। ওই ঘরেই মা আর মেয়েকে থাকতে দিল। মেয়ে সারাদিন ওই বাড়ির কাজ করত। মাঝে একবার আসত মাকে খাবার দিতে। মেয়ে যত বার আসত তত বারই মাকে জিজ্ঞেস করত, 'কেমন আছ মা?' মা খুব খুশি হত।

এদিকে ওই বাড়ির বড়ো গিন্নি কুসুমাবতীর কাজে খুব সন্তুষ্ট ছিল। ওরা, বিশেষ করে বড়ো গিন্নি কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির সব কথা কুসুমাবতীকে বলত।

এভাবে দু-মাস কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় কুসুমাবতী যখন জল আনছিল তখন তাকে এক বলিষ্ঠ যুবক সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো এ পাড়ার মেয়ে নও। তুমি কাদের জন্য জল নিয়ে যাচ্ছ?'

'ঠিকই বলেছেন। আমি এ পাড়ার মেয়ে নই। ওই বাড়ির জল নিয়ে যাচ্ছি। তবে আপনিও বোধ হয় এ পাড়ার লোক নন। তাই না?' কুসুমাবতী বলল।

'মাঝে কিছুদিন আমি এখানে ছিলাম না। আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। একটি বছর গোপনে থাকতে হবে। তা না হলে আমার কপালে নরকবাস আছে। আর এই একটি বছর কেটে গেলে, আমি সারাজীবন আর চারজনের মতো বাঁচতে পারব। তবে গোপনে থাকতে হলেও অন্তত একজনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে বাঁচতে পারব না। তাই এই একটি বছর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই।' ওই যুবক বলল।

'আপনার খবর গোপন রাখব। কিন্তু আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব ভেবে পাচ্ছি না।' কুসুমাবতী বলল।

'ওই বাড়ির যিনি বড়ো গিন্নি উনিই আমার মা। আমি যেদিন থেকে গা-ঢাকা দিয়ে আছি সেদিন থেকেই উনি আমার ঘরে তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছেন। তুমি ওই ঘর খুলতে বলবে। আর যদি খুলতে না চায়, তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখাবে। বুঝেছ? এবার যাই। আবার দেখা হবে।' বলে যুবক চলে গেল।

কুসুমাবতী বাড়িতে ঢুকে বড়ো গিন্নিকে বলল, 'আচ্ছা মা, এই ঘরটা তো খালি খালি পড়ে আছে। আমার আসার পর থেকেই দেখছি এই ঘর ব্যবহার হচ্ছে না। এটাকে খুলে দিন। এই ঘরে আমি ঘুমাব। রাত্রে ভালো ঘুম হলে দিনে বেশি করে কাজ করতে পারব।'

বড়ো গিন্নির খুব রাগ হল। সে বলল, 'তোর সাহস তো কম নয়। ওই ঘর আমার ছেলের। ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকে ওই ঘর আমি বন্ধ রেখেছি। ওর মৃতদেহ বাইরে আনার পর থেকে আমি ওই ঘরে আর কাউকে ঢুকতে দিইনি। কারণ সৎকারের আগে মৃতদেহ হাওয়া হয়ে গেছে। নিশ্চয় ভূতপ্রেতের কাজ। তাই সেদিন থেকে ঘর বন্ধ রেখেছি।'

'ওই ঘরে না ঘুমোতে দিলে আপনার বাড়িতে কাজ করব না।' কুসুমাবতী বলল।

তার কথা শুনে গিন্নি একটু নরম হয়ে বলল, 'একদিন না একদিন ওই ঘর খুলতেই হবে। তবে তোর শোওয়ার জন্য এই ঘর ছাড়ার ইচ্ছে করছে না।' পরে চাবি এনে কুসুমাবতীর হাতে দিল।

কুসুমাবতী ঘরের তালা খুলে, দরজা, জানলা, দেয়াল সব ঝাড়পোঁছ করে ঘরটাকে পরিষ্কার করল।

ওই ঘরে খাট ছিল, বিছানা ছিল। সেই রাত্রে কুসুমাবতী ওই ঘরে ঘুমাল। মাঝ রাতে দরজা ঠেলে ওই যুবক ঘরে ঢুকল। দু-জনের মধ্যে কথা হল। সে তাকে জানাল তার দেহ হাওয়া হয়ে যাওয়ার কাহিনি। কুসুমাবতী বুঝল, যুবকটির মারা যাওয়ার কথা, যা শুনেছে তা সত্য নয়। অন্য কোনো কারণ ছিল। পিশাচরা ওর দেহটাকে মৃতদেহের মতো করে ফেলেছিল। ওকে এখন নরকে পিশাচদের সেবা করতে হয়। এক ঘণ্টা করে ছুটি পায়। ওই এক ঘণ্টা সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। আত্মীয় ছাড়া যেকোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারে।

সেই রাত্রে যুবকটি কুসুমাবতীর সঙ্গে গল্প করে এক ঘণ্টা কাটিয়ে চলে গেল।

তারপর থেকে প্রত্যেক দিন রাত্রে যুবকটি আসত। কুসুমাবতীর সঙ্গে গল্প করে আবার পিশাচদের সঙ্গে ফিরে যেত। ক্রমশ ওদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

কিছুদিন পরে কুসুমাবতী বুঝল যে সে মা হবে। ওই বাড়ির গিন্নিও লক্ষ করল যে কুসুমাবতী মা হতে চলেছে। কিন্তু কুসুমাবতীর স্বামী যে কে তা জানার কৌতূহল তার মনে জাগল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না।

এর মধ্যে একদিন কুসুমাবতী কাজে এল না। বেরুলই না। বড়ো গিন্নি ঘরের কাছে গিয়ে কান খাড়া করে শুনল। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে কুসুমাবতী। দরজাটা একটু ঠেলে দেখল, কুসুমাবতী একটি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। আর তার চেয়ে অবাক হল তার সামনে বসে রয়েছে তারই ছেলে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে আর সেখানে বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে দ্রুতগতিতে চলে গেল।

কিছুদিন পরে কুসুমাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাজ করতে লাগল। তখন বাড়ির একজন এসে বলল, 'মার হুকুম তোমার ঘরে এই বড়ো বাক্সটা রাখতে হবে। এই বাক্সে নাকি অনেক সোনা-রূপা আছে।'

কুসুমাবতী তাতে রাজি হল। সন্ধ্যের আগেই ওই বাক্স কুসুমাবতীর ঘরে ঢুকল। সেই বাক্সের ভেতরে বড়ো গিন্নি বসেছিল। ফুটো দিয়ে সে সব লক্ষ করতে লাগল।

মাঝরাত্রে তার ছেলে এল। আর থাকতে না পেরে বাক্সর ঢাকনা খুলে বড়ো গিন্নি বেরিয়ে এসে বলল, 'বাবা এসেছিস!' বলে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল।

ছেলে খুশি হওয়ার পরিবর্তে বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি আমার কী যে সর্বনাশ করলে মা! আর একটি মাস কেটে গেলে সারাজীবন আমি তোমার কাছে থাকতে পারতাম। এই যে তুমি আমাকে দেখে ফেললে এর ফলে আমাকে আরও সাত বছর নরকে কাজ করতে হবে।'

'তোকে যেতে দেবে কে? প্রাণ থাকতে আর আমি তোকে যেতে দেব না। এখন থেকে তোকে সবসময় চোখে চোখে রাখব।' তার মা বলল।

'পিশাচদের তুমি ঠেকাতে পারবে কি মা? কেউ পারে না। ওরা যা করতে চাইবে তা করবেই। তুমি ওদের কোনো বাধা দিতে পারবে না।' ছেলে বলল।

তার মা ঘরের বাইরে দাঁড়াল। উদ্দেশ্য পিশাচদের ঘরে ঢুকতে দেবে না। কিছুক্ষণ পরে ছেলের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু শুনতে পেল না। তখন ঘরে ঢুকে দেখল ছেলে নেই।

ওকে পিশাচরা নিয়ে যাওয়ার সময় কুসুমাবতী বলল, 'আমার মাকে আর আমার কোলের এই বাচ্চাটিকে দেখাশোনার ভার নিলে তোমার পরিবর্তে আমি নরকে কাজ করতে পারি।'

'আমি শপথ করছি, আমি সেই দায়িত্ব নেব।' বলল কুসুমাবতীর স্বামী।

পিশাচদের বলে-কয়ে রাজি করাল, যাতে ওরা তার পরিবর্তে কুসুমাবতীকে নিয়ে যায়। কুসুমাবতী কোলের ছেলেকে আদর করে পিশাচদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। পিশাচরা সানন্দে কুসুমাবতীকে নিয়ে গেল। কুসুমাবতীর এই ত্যাগের ফলে নিজের ছেলেকে ফিরে পাওয়ায় বড়ো গিন্নি খুব খুশি হল।

নরকে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কুসুমাবতী বুঝল, নরকযন্ত্রণা কী জিনিস! তবু সে মনে মনে খুশি যে তার স্বামীকে সাত বছরের নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পেরেছে। এই কথা ভাবতে ভাবতে সে দিনের পর দিন

নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে লাগল।

সাত বছর পরে সে নরক থেকে মুক্তি পেল। পিশাচরা তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিল। স্বামীর বাড়িতে এসে দেখল অনেক লোকজন বাড়িতে ভিড় করে আছে। সানাই বাজছে। জানতে পারল তার স্বামী সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করার ব্যবস্থা করছে। সে আরও জানতে পারল তার মা কিছুদিন আগে মারা গেছে। সে দূর থেকে লক্ষ করল, তার স্বামী এবং শাশুড়ি ও তার সাত বছরের ছেলে লোকজনকে নানা রকমের উপহার দিচ্ছে। এসব দেখে কুসুমাবতীর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। সে ভিড় ঠেলে স্বামী ও শাশুড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছেলের তো প্রশ্নই ওঠে না। স্বামী বা শাশুড়ি কেউই কুসুমাবতীকে একেবারেই চিনতে পারল না।

রাগে, ক্ষোভে, অপমানে ও দুঃখে কুসুমাবতী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, স্বামীর পরিবর্তে কুসুমাবতী নরকে গেল কেন? স্বামীর প্রতি ভালোবাসার জন্য? নাকি সে ভেবেছিল ওইভাবে যাওয়াই স্ত্রীর কর্তব্য। যে স্ত্রী এত বড়ো একটা ত্যাগ স্বীকার করল সেই স্ত্রীই বা বিয়েতে বাধা দিল না কেন? অন্য মেয়েকে তার স্বামী বিয়ে করছে দেখেও সরে গেল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'
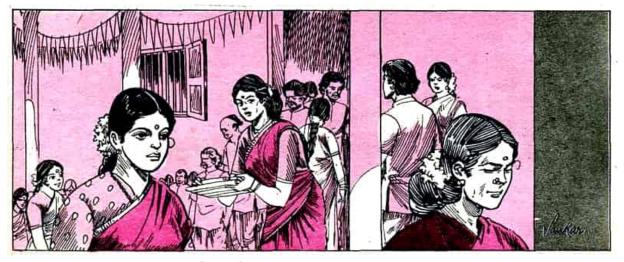
বিক্রমাদিত্য বললেন, 'কুসুমাবতী আজীবন কষ্ট পেয়েছে। তার পক্ষে কোনো কষ্টই আর কষ্ট নয়। সে চিরকাল অন্যকে সুখ দিতে চেয়েছে। স্বামীর প্রতি দয়াবশতই সে নরকে গেছে স্বামীর কষ্ট তার অসহ্য। মা যাতে ছেলেকে আবার নিজের কাছে ফিরে পায় তারজন্যও সে স্বামীর পরিবর্তে নরকে গেছে। অন্যদিকে কুসুমাবতীকে তার স্বামী নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। কুসুমাবতীর মনে একটা ভয় ছিল কোলের ছেলে ও বুড়ি মায়ের ব্যাপারে। কিন্তু মা যখন মারা গেল, ছেলে যখন বড়ো হয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্বামী যখন সাত বছর পূর্ণ হতে-না-হতেই বিয়ে করতে বসেছে তখন তার আর সেখানে থাকতে ইচ্ছে করল না। তাই চলে গেল।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গেল।

৩৭. চোখের ফাঁড়া

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছে উঠে শবদেহ নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা এই জগতে যে যতই শক্তিমান হোক না কেন ফাঁদে পড়ার অবকাশ থেকেই যায়। প্রমাণ স্বরূপ আমি বিষ্ণুশাস্ত্রীর কাহিনি শোনাচ্ছি। শুনলে পথ চলার পরিশ্রম কমে যাবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশে চন্দ্রবর্মা নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার বয়স ছিল অল্প। বলতে গেলে যুবক ছিলেন। বয়স কম হলে কী হবে, দেশ শাসনের কাজে তিনি ছিলেন খুব দক্ষ। তবে তাঁর একটা মস্তবড়ো দুর্বলতা ছিল। সেটি হল ভবিষ্যৎ গণনা। কোনো জ্যোতিষী এলেই সব কাজ ফেলে ঠিকুজি এনে দেখতে বলতেন।

একবার বিষ্ণুশাস্ত্রী নামে এক জ্যোতিষী তাঁর কাছে এল। চন্দ্রবর্মা তাকে আদর আপ্যায়ন করে ডেকে বসিয়ে যথারীতি ঠিকুজি এনে দেখালেন।

বিষ্ণুশাস্ত্রী অনেকক্ষণ ঠিকুজি দেখে বলল, 'রাজা, সত্যিকারের জ্যোতিষীর সব কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত। আজ থেকে ঠিক আঠারো বছর পরে এই দেশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। বেশি দিন সে অবস্থা থাকবে না। খুব জোর এক বছর। কিন্তু তার দু-বছরের মধ্যে আপনার দুটো চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। গণনা করে যা বুঝেছি তাই জানিয়েছি। এরজন্য অপরাধ নেবেন না।'

'এর থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? যদি থাকে অনুগ্রহ করে বলুন।' রাজা বললেন।

বিষ্ণুশাস্ত্রী অনেকক্ষণ হিসেব করে বলল, 'মহারাজ, উপায় যে নেই তা নয়। আছে। তবে আপনি অন্য কাউকে সে-কথা জানাতে পারবেন না। সেটি হল বিচিত্র আকারের এক ওঝা ঠিক সময়ে আসতে পারে। তাকে ধরতে পারলে, তার মন্ত্রশক্তিবলে আপনার দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকবে। এর বেশি আমি আর কোনো উপায় বলতে পারছি না।'

তারপর বিষ্ণুশাস্ত্রীকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন।

আঠারো বছর হয়ে এল। বিষ্ণুশাস্ত্রীর কথামতোই দেশে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিল। চারদিকে অভাব অনটন আর হাহাকার। তবে রাজা যেহেতু আগে থেকেই জানতেন সেইহেতু সমস্ত ব্যবস্থা আগেভাগেই করে রেখেছিলেন। তাই বহু প্রজাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। পরের বছর ঠিক সময়ে বৃষ্টি হল। ফসল হল। আকাল দূর হল। রাজা যে আগে থেকে ব্যবস্থা করে বহু প্রজাকে বাঁচাতে পেরেছিলেন তারজন্য রাজার প্রতি প্রজাদের শ্রদ্ধা বেড়েছিল।

ফসল বেশি হওয়ায় প্রজারা আনন্দ করল, উৎসব করল। কিন্তু রাজার মনে দুশ্চিন্তা ঢুকল। বিষ্ণুশাস্ত্রীর কথামতো আকাল হয়েছে। চোখও নিশ্চয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে! তারপর থেকে রাজা সেই বিচিত্র রূপধারী ওঝার অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগলেন।

ঠিক এমন সময় রাজা চন্দ্রবর্মা একই ধরনের খবর দু-জন রাজার কাছ থেকে পেলেন। কলিঙ্গ রাজা এবং কাশ্মীর রাজা। ওই দু-জন রাজারই নাকি মৃত্যুর ফাঁড়া ছিল। দু-জনেই এক বিচিত্র রূপধারী ওঝার চেষ্টায় বেঁচে গেল। ওঝা নাকি ওই দুই রাজাকে কঙ্কন পরিয়ে চলে গেছে। ফলে এখন ওরা ভালো আছে। তাদের জীবনে আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।

কলিঙ্গরাজের চিঠিতে আরও ছিল

ওঝার নাম বরুণশাস্ত্রী। রাজপ্রাসাদেই থেকে যেতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু উনি থাকতে রাজি হননি। এমনকী কোন দেশে কোথায় যে উনি থাকেন তাও জানাতে চাইলেন না। তবে গোপনে খবর নিয়ে জানতে পেরেছি বরুণশাস্ত্রী আপনার দেশের দিকেই গেছেন।

এই চিঠি পাওয়ার পর থেকে চন্দ্রবর্মা সেই তান্ত্রিকের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন কাটাতে লাগলেন।

তাঁর অপেক্ষা বৃথা যায়নি। সাত দিনের মধ্যেই তিনি সেই তান্ত্রিকের দেখা পেলেন। লোকটাকে দেখতে সত্যিই অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। বয়স নাকি মাত্র পঁচিশ বছর। তবে শরীরটা বিরাটকায়। রং কালো। চোখ ট্যারা। দাঁত বড়ো বড়ো।

চন্দ্রবর্মা অধীর আগ্রহে ওই তান্ত্রিককে স্বাগত জানালেন। তিনি নিজের ঠিকুজি তাকে দেখালেন। তান্ত্রিক ঠিকুজি দেখে বলল, 'মহারাজ, আপনাকে অবিলম্বে সূর্য উপাসনা করতে হবে। জপতপে মন দিতে হবে। তা না হলে আপনার চোখের আলো নিকিয়ে যাবে। আপনি কালমাত্র বিলম্ব করবেন না।'

বরুণশাস্ত্রীর নির্দেশমতো রাজা চন্দ্রবর্মা প্রত্যেকটি কাজ করে যেতে লাগলেন। উপাসনা, জপতপ সব চলল। শেষে একদিন বরুণশাস্ত্রী বলল, 'মহারাজ, আর আপনার ভয় নেই। এখন আমাকে বিদায় দিন।'

চন্দ্রবর্মা প্রচুর পরিমাণে উপহার দিয়ে বরুণশাস্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বাবা কোথায় থাকেন? কী করেন?'

'বাবা কিছুই করেন না। কারণ তিনি ইহজগতে আর নেই। আমার বাচ্চা বয়সেই তিনি মারা গেছেন।' বলল বরুণশাস্ত্রী।

'তাই নাকি? আপনার মতো মহাত্মা পুরুষের পিতা যে কত বড়ো মহাপুরুষ ছিলেন তা সহজেই কল্পনা করতে পারি। আপনি এক কাজ করুন ওনার মৃত্যুদিনে এবার আপনি এখানেই ঘটা করে ওই দিবস পালন করুন। তাঁর মৃত্যুদিবস পালনের পর আমি আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করে বিদায় দেব।'

বরুণশাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ বলল, 'আমার বাবার মৃত্যুদিবস আগামী পরশু। সেইজন্যই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাইছি।'

'তাই যদি হয় তাহলে ফিরে যাওয়ার দরকার কি? থেকেই যান না। পরশুদিন বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে আপনার বাবাকে স্মরণ করা যাবে! ভালো কথা, আপনিও আপনার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে আসতে বলবেন।' রাজা চন্দ্রবর্মা বললেন।

দিনের দিন বরুণশাস্ত্রীর কেউ এল না। তা নিয়ে চন্দ্রবর্মা কোনো প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত করেননি। তবে চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুশাস্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে বললেন, 'আপনি কত বছর আগে আমার চোখের ক্ষতি হওয়ার

কথা বলেছিলেন। আপনার কথামতো আমি সেই অদ্ভুত তান্ত্রিকের দর্শন পেয়েছি। ইনিই সেই তান্ত্রিক। নাম বরুণশাস্ত্রী। আজকেই এঁর বাবার মৃত্যুদিবস। তাঁর আত্মার শান্তির জন্য বরুণশাস্ত্রীকে তার বাবার মৃত্যুদিবস পালন করতে বলেছি। এই উপলক্ষে আপনার মতো দূরদর্শী জ্যোতিষীকে যদি পুরস্কৃত না করি তাহলে অপরাধ হবে। আপনাকে সেই উদ্দেশ্যেই ডাকা।'

রাজা চন্দ্রবর্মা লক্ষ করলেন, বিষ্ণুশাস্ত্রীর মুখ যেন রক্তশূন্য হয়ে আসছিল। নির্বিকার ভাবে বিষ্ণুশাস্ত্রী দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে রাজা লক্ষ করলেন, সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। পরে যখন বরুণশাস্ত্রী তার বাবার উদ্দেশ্যে সকলের সামনে পিণ্ডদান করতে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে বিষ্ণুশাস্ত্রীর মুখ দিয়ে হঠাৎ সোচ্চারে বেরিয়ে গেল, 'থামাও!'

চন্দ্রবর্মা তৎক্ষণাৎ সমস্ত কাজ থামিয়ে অনুচরদের বললেন, 'এই কে আছ, এই বরুণশাস্ত্রীকে এক মাসের জন্য কারাগারে ফেলে রাখ। আর এই জ্যোতিষী বিষ্ণুশাস্ত্রী যেন কোনোদিন আর জ্যোতিষীগিরি করতে না পারে। এই মুহূর্তে লোক পাঠিয়ে চারদিকে ঘোষণা করে দাও। কেউ যেন এই জ্যোতিষীর কথা আর বিশ্বাস না করে। বিভিন্ন দেশে আমাদের বন্ধু রাজাদের কাছেও খবরটা পাঠিয়ে দেবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় রাজা চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুশাস্ত্রীকে এক হাজার মুদ্রা দিয়ে বিদায় দিলেন। ফেরা পথে বিষ্ণুশাস্ত্রী মনে মনে চন্দ্রবর্মার সূক্ষ্মবুদ্ধি ও দয়ালু মনের জন্য তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ, বিষ্ণুশাস্ত্রী থামাও বলে চিৎকার করে উঠল কেন? চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুশাস্ত্রীর জ্যোতিষীর খেতাব কেড়ে নিলেন কেন? যে বরুণশাস্ত্রী তাঁর চোখ দুটো রক্ষা করল সেই বরুণশাস্ত্রীকে কারাগারে পাঠালেন কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তবে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বরুণশাস্ত্রী যে বিষ্ণুশাস্ত্রীর ছেলে তা সহজেই চন্দ্রবর্মার কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু তা সঠিক প্রমাণ পাওয়ার জন্য তিনি মৃত্যুদিবস পালন করতে বরুণশাস্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর সন্দেহের সূত্রপাত হয় কলিঙ্গ ও কাশ্মীর রাজাদের চিঠি পড়ে। তাঁর চোখের ব্যাপার ওরা জানলেন কী করে? নিশ্চয় বরুণশাস্ত্রী ওদের কাছে গল্প করেছে। আবার বরুণশাস্ত্রী ঠিকুজি না দেখে চোখের ব্যাপার জানল কী করে? নিশ্চয়ই বাপের কাছে শুনেছিল? তা ছাড়া অত বড়ো শক্তিমান তান্ত্রিক হলে রাজার এককথায় থেকে যেত না। তাই বলে বিষ্ণুশাস্ত্রী যে জ্যোতিষী হিসাবে অপদার্থ ছিল তা নয়। দুর্ভিক্ষের ব্যাপার তাহলে জানা যেত না। তবে বিষ্ণুশাস্ত্রী বুঝেছিল যে তার ছেলে একটি অপদার্থ হবে। তাই তাকে তুলে ধরার জন্য সে সব রকমের চেষ্টাই করে ছিল। এত বড়ো অপরাধ করা সত্ত্বেও কিছুটা সত্যবাদী জ্যোতিষী হিসেবে রাজার কাছ থেকে এক হাজারটি মুদ্রা উপহার পেয়েছিল। চন্দ্রবর্মা ছেলেকে কম শাস্তি দেওয়ায় বিষ্ণুশাস্ত্রী মনে মনে খুশি হয়েছিল।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩৮. কে বড়ো দাতা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন নীরবে।

সেইসময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে পরিশ্রম করছ তার ফলে তোমার যে কি পরিমাণ পুণ্য হবে তা কেউ বলতে পারে না। পাপ-পুণ্যের ওজন হয় না। মাপা যায় না। কোনটা বেশি কোনটা কম জানা যায় না। একটি কাহিনি বললে আমার কথা যে ঠিক তা বুঝতে পারবে। তোমার পথ চলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।'

বেতাল কাহিনি শুরু করল

অনেকদিন আগে এক গ্রামে শ্রীপতি নামে এক বৈশ্য ছিল। সেই গ্রামেই রামনাথ নামে এক চাষি ছিল। দু-জনেই ধনী। সজ্জন। শ্রীপতি দানধর্ম করত। দানী লোক হিসাবে তার নামডাক ছিল।

একদিন এক যুবক পথ চলতে চলতে রাস্তার উপরে প্রচণ্ড রোদে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। শ্রীপতি গিয়ে তাকে তুলে এনে ছায়ায় বসাল। চোখে-মুখে জলের ছিটে দিল। চেষ্টা করতে লাগল যাতে সে জ্ঞান ফিরে পায়। জ্ঞান হওয়ার পর তার কাছ থেকে সব কথা জানতে পারল।

শ্রীপতি বুঝতে পারল যে যুবকটি ভিখারি। দু-তিন দিন খেতে পায়নি। জ্ঞান হারানোর কারণ শুধু প্রচণ্ড রোদ নয়, খিদেও ছিল। শ্রীপতি তাকে পেট ভরে খাওয়াল। ঘুমানোর জন্য তাকে একটা মাদুর দিল। যুবক সেই রাত্রে শ্রীপতির বাড়ির বারান্দায় ঘুমাল। পরের দিন সকালে পথ ধরল।

কিন্তু পরের দিন, সারাদিন ঘুরেও খাবার জোগাড় করতে পারল না। সেই রাত্রেও সে শ্রীপতির বাড়িতে এল। খাবার চেয়ে খেল এবং ঘুমাল।

রামনাথ পরের দিন সকালে যুবকটিকে দেখে শ্রীপতিকে জিজ্ঞেস করল, 'দু-দিন ধরে খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, কে এই যুবকটি? এর সম্পর্কে কিছু জেনেছ? ওর কী হয়েছে যে ভিক্ষে করছে?'
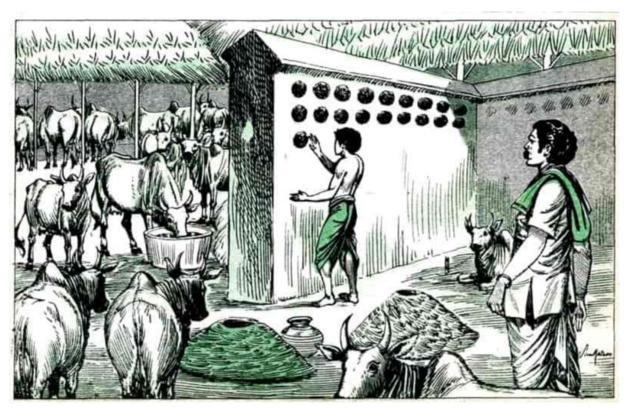
রামনাথ যুবকটিকে জিজ্ঞেস করল। 'ওহে তোমার তো বয়স কম। বুড়ো হয়ে যাওনি। হাত, পা, চোখ, কান, মুখ সবই আছে। ভিক্ষে করছ কেন?'

জবাবে যুবক বলল, 'আমি বাপ-মায়ের এক ছেলে। ফলে বাবা-মার কাছ থেকে ছেলেবেলায় খুব আদর পেয়েছি। লেখাপড়া করতে চাইনি। বাবা-মা আমার লেখাপড়ার জন্য চাপও দেননি। দু-দিন আগে পর্যন্ত বাবা-মা ছিলেন। কিন্তু আজ আমার কেউ নেই। ওঁরা মারা গেছেন। ওঁদের ছায়ায় ছায়ায় এত বড়ো হয়েছি। ওঁদের মারা যাওয়ার পর, আমি লক্ষ করেছি, কিছুই পারি না।'

রামনাথ বলল, 'তোমার এভাবে ভিক্ষে করার তো দরকার নেই। খুব বেশি পরিশ্রমও তোমাকে করতে হবে না। তোমার মতো অনেক ছেলে আমার কাছে কাজ করে। আমার অনেক গোরু আছে। ঘুঁটে কীভাবে বানাতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। তুমি ঘুঁটে বানাবে বিক্রি করবে।' বলে রামনাথ তাকে নিজের গোশালে নিয়ে গেল। কীভাবে ঘুঁটে বানাতে হয় হাতেনাতে দেখিয়ে দিল। ঘুঁটে শুকিয়ে গেলে কীভাবে তুলে বিক্রি করতে নিয়ে যেতে হয় তাও দেখিয়ে দিল। কারা কেনে, কত দামে বিক্রি করতে হয় সব জানিয়ে দিল।

যুবকটি কিছুদিনের মধ্যেই গুনতে শিখে গেল। ঘুঁটে গুনে শহরে নিয়ে যেত বিক্রি করতে। কথা অনুযায়ী অর্ধেক পয়সা রামনাথকে দিত। বাকি অর্ধেক পয়সা দিয়ে সে পেট চালাত।

এইভাবে দিন চলছিল কিন্তু কয়েক মাস পরে সেখানে বৃষ্টির অভাবে আকাল দেখা দিল। সে দেশের রাজা পণ্ডিত ও জ্যোতিষীদের ডেকে কীভাবে কী করলে বৃষ্টি হবে তা জানতে চাইল। পণ্ডিতরা জানাল, 'আপনার রাজত্বের কোনো দানী পুণ্যবান তার পুণ্যের অর্ধেক যদি ত্যাগ করতে পারে তাহলে বৃষ্টি হবে।'

কে যে বড়ো দানশীল তা জানার জন্য খোঁজ পড়ে গেল। সবাই খোঁজাখুঁজি করতে লাগল সেই দানশীল ব্যক্তিকে। অনেকে নিজেকে দানশীল বলে রাজার কাছে হাজির হল। নিজেদের অর্জিত পুণ্যের অর্ধেকটা দান করতে রাজি হল। পুণ্যদান যজ্ঞে নিজেদের অর্ধেক পুণ্যও দান করল। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। যা ছিল তাই রইল। কিন্তু রাজা হাল ছাড়েননি।

এইভাবে যজ্ঞ অনেকদিন চলতে লাগল। শেষে রাজা কারা কারা দান করে শুনে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। শ্রীপতি ও রামনাথকে একদিন যেতে হল। প্রথমে শ্রীপতি তার পুণ্যের অর্ধেক দান করল। পরে রামনাথ তার পুণ্যের অর্ধেক দান করল। রামনাথের দান করার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হল। মাঠে মাঠে ফসল ভরে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, শ্রীপতি আজীবন দানধর্ম করেছে। সবাই জানে তার পুণ্য অনেক বেশি। কিন্তু সবাই অবাক হল, পুণ্যযজ্ঞে অর্ধেক পুণ্য দান করার পর বৃষ্টি হল না। অথচ রামনাথ তার অর্ধেক পুণ্য দান করার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হল। শাস্ত্রে আছে অন্নদান শ্রেষ্ঠদান। তাহলে এখানে কী হল? রাজা আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শ্রীপতি অন্নদান করত। তাতে যে বেলার খিদে সেই বেলাতেই মিটত। কিন্তু রামনাথ যা করেছিল তাতে সারাজীবনের খিদে মিটত। ওদের নিজেদের খাবারের জন্য অন্যের কাছে হাত পাতার দরকার হত না। সেইজন্যেই রামনাথের অর্জিত পুণ্য শ্রীপতির অর্জিত পুণ্যের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাই রামনাথের পুণ্য দান করার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হল।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে আবার গাছে গিয়ে উঠল।

৩৯. রূপ লাগি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে গেলেন। গাছে উঠে শবদেহ নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, এত পরিশ্রম করে শেষপর্যন্ত হয়তো তুমি জয়ী হবে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে চন্দ্রের মতো তুমিও না শেষে সেই জয়ের মালা পরতে না চাও। চন্দ্রের কাহিনি শুনলে তোমার ভালো লাগবে। পথের শ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে সত্রাজিত নামে এক যক্ষরাজ ছিল। তার ছিল এক মেয়ে। নাম তেজবতী। তেজবতী ছিল খুব সুন্দর। সত্রাজিতের দুই দিকে দু-জন যক্ষকুমার সবসময় সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকত। তাদের মধ্যে একজনের নাম রুদ্র। অন্যজনের নাম চন্দ্র।

রুদ্রের প্রতি সত্রাজিতের একটু বেশি স্নেহ ভালোবাসা যেন ছিল। আবার রুদ্র যে সত্রাজিতকে বেশি করে সেবা করত তার মূলে ছিল তেজবতী। রুদ্র তাকে খুব ভালোবাসত। রুদ্রের রূপ তেমন সুন্দর ছিল না। তাকে পরাক্রমশালীও বলা যায় না। অপরপক্ষে চন্দ্রের বেলায় এই কথা খাটে না। চন্দ্র ছিল খুব সুন্দর। শক্তিও তার ছিল প্রবল। তাই চন্দ্রের রূপে তেজবতী মুগ্ধ ছিল। তেজবতীর সৌন্দর্যে চন্দ্রও মুগ্ধ ছিল। চন্দ্র জানত যে তেজবতীকে রুদ্র ভালোবাসে। সে ভালোবাসলেও তেজবতী যে তাকে ভালোবাসে তার প্রমাণ সে পায়নি। চন্দ্র বুঝেছিল, রুদ্র তেজবতীকে পাবে না। তার প্রতি চন্দ্রের সহানুভূতি জেগেছিল।

সত্রাজিত মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে লাগল। জানতে পেরে রুদ্র মনে মনে মরে যাচ্ছিল। শেষে একদিন সাহসে বুক বেঁধে রুদ্র সত্রাজিতকে তার মনের কথা জানিয়ে দিল। শুনে সত্রাজিত রাগ করেনি। বরং মেয়েকে পরামর্শ দিয়েছিল রুদ্রকে বিয়ে করতে।

রুদ্রকে দেখতে তেমন ভালো ছিল না। অথচ এ-কথা বাপের মুখের উপর বলার সাহসও তার ছিল না। অনেকক্ষণ ভেবে তেজবতী বাপকে বলল, 'বাবা, যে বিয়ে করতে চায় তাকে একটু পরীক্ষা করব। তোমার মত আছে?'

'কী পরীক্ষা করবি?' সত্রাজিতের প্রশ্ন।

'গন্ধর্ব বনে একটি প্রস্রবণ আছে। সেখানে অনেক সুবর্ণকমল রয়েছে। সেই সুবর্ণকমলের রস খেলে শুধু যে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় তাই নয়, রূপও খোলে। স্বর্গবাসীর মতো সুন্দর রূপ হয়। তবে সেখানে গন্ধর্বদের কড়া পাহারা আছে। তাদের পরাজিত করে সে যদি সেই সুবর্ণকমল আনে তবেই তাকে আমি বিয়ে করব। শুধু রুদ্র নয়, যে আনবে তাকেই বিয়ে করব।' তেজবতী বলল।

সত্রাজিত আর দুই সেবক, রুদ্র ও চন্দ্রকে এই কথা জানাল। শুনে দু-জনেই গন্ধর্ব বনের দিকে রওনা হল। চন্দ্রের ছিল প্রচণ্ড সাহস। শক্তিও ছিল তার খুব। অত্যন্ত দুর্গম পথ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সে চলে গেল গন্ধর্ব বনে। সুবর্ণকমল সে দেখতে পেল। জলে নেমে কমলে হাত দিতেই পিছন দিক দিয়ে একটি সিংহ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আশেপাশে একজন গন্ধর্ব লুকিয়ে বসেছিল। চন্দ্রকে দেখে সে সিংহরূপ ধারণ করে চন্দ্রের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্জন করতে লাগল। চন্দ্র ভয় পেল না। সে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পেরেছিল যে এটা আসল সিংহ নয়। তাই ঝটপট সিংহের গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে কাবু করে ফেলল। পরমুহূর্তে গন্ধর্ব নিজের রূপ ধারণ করল।

তখন চন্দ্র সব কথা জানাল। শুনে গন্ধর্ব তার হাতে একটি সুবর্ণকমল ছিঁড়ে দিল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে আর না এগিয়ে চন্দ্র একটি গুহায় রাত্রি কাটাবে ঠিক করে নিল।

গভীর রাত্রে চন্দ্র সিংহের গর্জন শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি গুহা থেকে বেরিয়ে চারদিকে সে ছোটাছুটি করতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখতে পেল রুদ্র ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে গোঙাচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ চন্দ্র রুদ্রকে নিয়ে গুহায় গেল। তার কাছে যে সুবর্ণকমল ছিল সেটি ছিঁড়ে তার রস বের করে রুদ্রের যেখানে যেখানে ঘা ছিল সেখানে সেখানে লাগাল। দেখতে দেখতে রুদ্র অল্পক্ষণের মধ্যেই সেরে উঠল। তার রূপও বদলে গেল। সে অনেক সুন্দর রূপ পেল। রুদ্র এরজন্য চন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল। গন্ধর্ব বন থেকে পরে চন্দ্র ও রুদ্র সত্রাজিতের কাছে ফিরে এল। ওদের মধ্যে কেউ স্বর্ণকমল আনল না।

শেষে তেজবতী রুদ্রকেই বিয়ে করল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, তেজবতী সুন্দরের পূজারি ছিল। রুদ্রকে, সুবর্ণকমলের রস লাগানোর পর অনেক সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাই, রুদ্রকে তেজবতী বিয়ে করে স্বাভাবিক কাজই করেছে। কিন্তু অবাক লাগে, চন্দ্র ওই সুবর্ণকমল আনতে গেল কেন? তাহলে কি তেজবতী কৌশল করে চন্দ্রকেও পাঠাতে বলল? তেজবতীর অনুরোধেই কি রাজা রুদ্র ও চন্দ্রকে গন্ধর্ব বনে পাঠিয়েছিল? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'সত্রাজিতের মেয়ে তেজবতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল রুদ্র, চন্দ্র নয়। ওদের দু-জনের মধ্যে একজনকে বিয়ে করার কথা বললে তেজবতী চন্দ্রকেই বেছে নিত। কিন্তু তা যখন হল না তখন তাকে কৌশল করতে হয়েছিল। কারণ তেজবতী দু-জনেরই ক্ষমতা জানত। সে নিশ্চিত ছিল যে চন্দ্র জয়ী হবে। রুদ্র পরাজিত হবে। তবে ইচ্ছে ছিল, সুবর্ণকমলের রসের সাহায্যে চন্দ্রকে আরও সুন্দর করে তুলে তাকে সে বিয়ে করবে। কিন্তু তেজবতীর সমস্ত ইচ্ছা মাটিতে মিশে গেল। এবং এরজন্য চন্দ্রই দায়ী। সত্রাজিতের নির্দেশমতো চন্দ্র প্রতিযোগিতায় নামল, তেজবতীকে পাওয়ার জন্য নয়। কারণ প্রথম থেকেই রুদ্রের প্রতি তার করুণা জেগেছিল। রুদ্রের ভালো হোক সে তাই চাইত। সে জানত যে রুদ্র তেজবতীকে ভালোবাসে। তাই সে আর সেখানে অপেক্ষা না করে সোজা সত্রাজিতের কাছে ফিরে এল।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল আবার শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪০. ক্ষত্রিয়ের ধর্ম

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছে উঠে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর শবেস্থিত বেতাল বলল, 'মহারাজ, তুমি যে চেষ্টা করছ এই চেষ্টা যে সফল হবেই এমন কথা মনে রেখো না। বিফলও হতে পার। তবে বিফল হয়েও অনেক সময় সফল হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কাহিনি বলছি। আমার ওই কাহিনি শুনলে বুঝতে পারবে যে আমার কথা কত সঠিক। আমি কণকপুরের মানিকের কাহিনি শোনাচ্ছি।'

প্রাচীন কালে মণিপুরের রাজা ছিল সিংহভূপাল। তার ছিল এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। নাম মন্দারবলী। শুধু যে সুন্দরী ছিল তাই নয় তার জ্ঞানও ছিল অসীম। বহু বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল তর্কাতীত। বিয়ের বয়স হলে রাজা সিংহভূপাল মেয়ের বিয়ের তোড়জোড় শুরু করে দিল। উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান শুরু হল।

অনেক রাজকুমারকে পরীক্ষা করে দেখা গেল। কিন্তু কোনো রাজকুমারকেই মন্দারবলীর উপযুক্ত স্বামী হিসাবে যোগ্য মনে হল না। খুঁজে খুঁজে শেষে কণকপুরের রাজকুমার মানিককেই উপযুক্ত এবং যোগ্য পাত্র মনে হল।

তবে মানিককে বাছাই করার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা ছিল। দেশ হিসাবে কণকপুর বড়ো ছিল না। ছোট্ট দেশ। মানিক ভবিষ্যতে রাজা হলে একটি ছোট্ট দেশের রাজা হবে। ছোটো একটি দেশের রাজার কাছে মেয়েকে দেওয়ার প্রস্তাব করতে খুব একটা ইচ্ছা করল না। আবার মানিকের মতো অত ভালো পাত্র পাওয়াও দুষ্কর ছিল। কি করা যায় তা রাজা ভেবে পাচ্ছিল না।

রাজার সমস্যার কথা শুনে মন্ত্রী একটি উপায় বলল। সেটি হল, সিংহভূপাল মানিকের দেশ আক্রমণ করবে, জোর করে তাদের দেশ দখল করে নেবে। তারপর দুই দেশের মধ্যে সন্ধি হবে। সন্ধির শর্ত হিসাবে মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ থাকবে এবং মানিকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে।

মন্ত্রীর পরামর্শমতো রাজা সিংহভূপাল সেনাদের প্রস্তুত হতে বলল। কণকপুর আক্রমণ করতে বলল। কণকপুরের রাজা হতবাক হল। ঘটনাক্রমে মানিকই কণকপুরের রাজা হয়েছিল মাত্র কিছুদিন আগে। মণিপুরের রাজার সঙ্গে যে তার দেশের কোনো শত্রুতা ছিল তা সে জানত না। হঠাৎ কেন যে মণিপুরের রাজা আক্রমণ করল তা সে ভেবেই পেল না। পালটা আক্রমণ করা উচিত কি না সে বিষয়ে মানিক মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করল। মন্ত্রীরা বলল, 'যুদ্ধের আমাদের কোনো প্রস্তুতি নেই। এখন যুদ্ধ করতে যাওয়ার অর্থ আমাদের বহু সেনাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। আমাদের দেশের মানুষ মারা যাবে। আমাদের অনেক অর্থও নষ্ট হবে। অতএব অবিলম্বে সন্ধি করাই ভালো।'

মন্ত্রীদের পরামর্শমতো মানিক সিংহভূপালের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল। রাজা সিংহভূপাল তৎক্ষণাৎ সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি হল। সন্ধির সময় মানিককে দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হল রাজা সিংহভূপাল। মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ সন্ধির শর্ত হিসাবে রাখতে চাইল। শুনে রাজা মানিকের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক লাগল। তবু দেশের স্বার্থে, প্রজাদের জীবনরক্ষার্থে রাজা মানিক সিংহভূপালের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হল।

সিংহভূপাল খুব খুশি। যা করব ভেবেছিল করতে পেরেছে। ফিরে এল নিজের দেশে। এদিকে মন্দারবলীর কানেও সন্ধির শর্তের কথা গেল। সেও যুবরাজ মানিকের কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিল। হঠাৎ তার বাবা মানিকের দেশ আক্রমণ করতে গেলে সে খুব দুঃখ পেয়েছিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবাকে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য সে বলেছিল কিন্তু লক্ষ করল বাবা মানিকের রাজ্য আক্রমণ করতে বদ্ধপরিকর। মেয়ের মনের অবস্থা বুঝতে

পেরে সিংহভূপাল খুব খুশি হল। তবে কেন যে আক্রমণ করতে যাচ্ছে তা খুলে বলল না। অপরপক্ষে আর একটি কারণেও খুশি হল। নিজে যে রাজকুমারকে যোগ্য পাত্র হিসাবে মনে মনে বাছাই করেছে তার প্রতি মন্দারবলীর দুর্বলতা আছে দেখে। যুদ্ধ শেষ করে ফিরে এসে সন্ধির শর্ত মেয়ে মন্দারবলীকে রাজা জানাল।

সন্ধির শর্তের কথা শুনে মন্দারবলীর গালে হাত পড়ল। এদিকে রাজা মেয়েকে শুধু জানিয়ে দিয়ে তার বিয়ের তোড়জোড় করতে লাগল। এমন সময় মেয়ে মানিক রাজাকে বিয়ে করতে রাজি হল না। তার বাবা কত করে বোঝাল কিন্তু কিছুতেই মন্দারবলীকে রাজি করানো গেল না। তখন বাধ্য হয়ে সিংহভূপাল বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবার খবর রাজা মানিককে জানিয়ে দিল। রাজা ভেবে পেল না মন্দারবলীর বিয়ে কার সঙ্গে হবে।

বিয়ে ভেঙে যাওয়ার খবর পেয়ে রাজা মানিক ভীষণ রেগে গেল। তার কাছে এই খবরটা আরও অপমানজনক লাগল। ক্ষমতা থাকলে সিংহভূপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু সে জানে হঠাৎ একবার সিংহভূপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায় কিন্তু জয়ী হওয়া যাবে না। তার সৈন্যশক্তি অত্যন্ত কম। কিন্তু মনে কিছুতেই রাজা মানিক শান্তি পাচ্ছিল না। তাই সে তার ক্ষুদ্র ক্ষমতা নিয়েই ওই সিংহভূপালের দেশ আক্রমণ করল। এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে সিংহভূপাল প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু পরে পালটা আক্রমণ করে রাজা মানিককে বন্দি করল। তবে সিংহভূপাল রাজা মানিকের সাহস দেখে অবাক হল। রাজা মানিক এবং তার সেনাদের যুদ্ধকৌশল ও সাহস দেখে সিংহভূপাল তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ হল।

রাজা মানিককে পরাজিত ও বন্দি করে সিংহভূপালের কোনো আনন্দ হল না। এখন তার ভাবনা হল রাজা মানিকের রাজ্যটি কি সে নিয়ে নেবে। নাকি তাকে ছেড়ে দেবে। তখন মন্দারবলী বাবা সিংহভূপালকে বলল, 'বাবা, এখন আমি রাজা মানিককে বিয়ে করতে রাজি আছি।' শুনে রাজা সিংহভূপাল খুব খুশি হল। তৎক্ষণাৎ সে ঘটা করে মন্দারবলীর বিয়ে রাজা মানিকের সঙ্গে দিল। এতদিনে সিংহভূপালের ঘাড় থেকে যেন একটা বোঝা নামল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, বাবা সিংহভূপাল যুদ্ধ করে মানিককে বন্দি করার পর প্রথমে মন্দারবলী তাকে বিয়ে করতে রাজি হল না কেন? আবার পরে সেই রাজা মানিক সিংহভূপালের দেশ

আক্রমণ করে বন্দি হলে মন্দারবলী এগিয়ে এসে তাকেই বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করল কেন? দু-দিন আগে যে মেয়ে গররাজি হয়েছিল যাকে বিয়ে করতে তাকেই দু-দিন পরে বিয়ে করতে রাজি হল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বিক্রমাদিত্য বেতালের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'মন্দারবলী সুশিক্ষিতা। সে বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই বহু বিষয়েই গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিল। মানিকের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। তবে সে জানত না যে রাজা মানিকের দুর্বলতা তার প্রতি আছে কি না। তার অজানা ছিল মানিক তাকে ভালোবাসে কি না। সেইজন্যই সে বিয়ের ব্যাপারে আগে থেকেই কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না। তবে বাবা রাজা মানিকের রাজ্য আক্রমণ করবে শুনে দুঃখ পেয়েছিল। পরাজিত ও বন্দি রাজা মানিককে বিয়ে করার ইচ্ছে করল না মন্দারবলীর। আরও একটি কারণে তার এই অনিচ্ছা ছিল। বিয়ের শর্তে মুক্তি পাওয়া। এতে রাজা মানিকের সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা। তাই অপমানিত ও সম্মানহীন রাজা মানিককে বিয়ে করতে সে রাজি হল না। তবে সেই রাজা মানিক যখন তাদের দেশ আক্রমণ করল তখন তার মন থেকে দুটো সন্দেহ দূর হয়ে গেল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল মানিক তাদের দেশ জয় করার জন্য আক্রমণ করেনি করেছে তাকে পাওয়ার জন্য। আর পরাজিত হলে বন্দি হতেই হবে। রাজা মানিক ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। যুগ যুগ ধরে, বহু পুরুষ ধরে, সাহসে বুক বেঁধে ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে এসেছে। জয়-পরাজয় নিয়ে অত মাথা ঘামানো তার ধর্ম নয়। সেইজন্যই মন্দারবলী বন্দি মানিক রাজাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গিয়ে সেই গাছে ঝুলে পড়ল।

৪১. পরমাসুন্দরী

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করছ সেই কাজের জন্য কে কি বলেছে জানি না। বিশেষ করে যারা তোমার হিতাকাঙ্খী তাদের কথা তুমি শুনেছ কি না জানি না। তাদের কথা না শুনে তুমি হয়তো তোমার শুভাকাঙ্খীদের হারাচ্ছ। এই প্রসঙ্গে তোমাকে আমি প্রদীপ নামে এক রাজকুমারের কাহিনি বলছি। এই কাহিনি শুনলে হয়তো তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বেতাল তার কাহিনি শুরু করল

সুবর্ণগিরি দেশের যুবরাজের নাম ছিল প্রদীপ। তার সৌন্দর্যবোধ ছিল অপরিসীম। কারুকার্য ও কলার প্রতি টান ছিল গভীর। তার কাছে প্রমোদ নামে এক শিল্পী ছিল। সেকালের শিল্পীরা যে ধরনের ছবি আঁকত প্রমোদ সেই ধরনের ছবি আঁকত না। তার ছবি ছিল বাস্তবধর্মী। তার ছবির বিষয়বস্তুর আধার ছিল জীবন থেকে নেয়া। প্রমোদের সঙ্গে প্রদীপের বন্ধুত্ব ছিল।

একবার প্রদীপ প্রমোদকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কল্পনার ভিত্তিতে ছবি আঁক না কেন? তোমার অসুবিধা কোথায়?'

'আমি যা চোখে দেখি না তা আঁকতে পারি না।' বলল প্রমোদ।

তারপর প্রমোদ পাহাড়ের কাছে গিয়ে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখল সেই দৃশ্য আঁকল। সেইসব ছবিগুলো যুবরাজ প্রদীপকে দেখাত। প্রদীপ ভাবত তার বন্ধু প্রমোদ কিছুটা কল্পনাবিলাসী হয়তো হয়েছে। একবার সে একটা ছবি দেখে বলল, 'এই ছবি দেখে মনে হচ্ছে এই ধরনের দৃশ্য তুমি কখনো দেখনি।'

সেই ছবিতে একটা পাহাড়ের শিখর থেকে একটি গাছ গজিয়ে নীচের দিকে বাড়ছিল। গাছের মাথা পাহাড়ের নীচের দিকে বাড়া অসম্ভব। প্রমোদ প্রদীপকে সোজা সেই অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে সেই দৃশ্য দেখাল। সেই গাছে ঝুলে কয়েকটি বাঁদর নদীর জল খাচ্ছিল।

আরও কিছুদিন পরে প্রদীপের বিয়ের চিন্তা জাগল। উপযুক্ত কন্যা খোঁজা অত সহজ নয় তাই প্রদীপ প্রমোদকেই তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করল। বিভিন্ন দেশের রাজকুমারীদের প্রমোদ দেখতে লাগল। প্রত্যেকটি রাজকুমারীর ছবি এঁকে প্রমোদ প্রদীপকে পাঠাত। ফেরাপথে প্রমোদ একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

সেদিন সে যখন বনপথে তখনই রাত্রি নেমে গেল। জ্যোৎস্না রাত হওয়ায় প্রমোদ সেখানে থেমে না গিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। পূর্ণ চন্দ্রের রাত্রে তার হাঁটতে ভালোই লাগছিল। সে পথের পাশ থেকে গান শুনতে পেল। শুধু গান নয় সে শুনতে পেল নূপুরধ্বনি। নাচের মিষ্টি আওয়াজ।

প্রমোদ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে কান খাড়া করে সেই রিনিঝিনি ধ্বনি শুনতে লাগল। যেদিক থেকে শব্দ ভেসে আসছিল সেইদিকে এগিয়ে এল। অপূর্ব সে দৃশ্য। একটি মেয়ে নাচছিল। সেই নাচ দেখতে দেখতে প্রমোদ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। প্রমোদ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই নাচ দেখতে দেখতে কখন যে নৃত্যশিল্পীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তা সে নিজেই টের পেল না। নাচতে নাচতে সেই শিল্পী একসময় প্রমোদের গায়ে ঢলে পড়ল। হঠাৎ মহিলা বলল, 'ক্ষমা করবেন, ক্লান্ত হয়ে এদিকে পড়ে গেছি।'

'তাতে কী হয়েছে। আমি ভাবছি, তোমার মতো সুন্দরী নৃত্য পটিয়সী এখানে এভাবে পড়ে আছে কেন? কী তোমার অভাব, কী তোমার ইচ্ছা? এখানে একা এভাবে কেন পড়ে আছ?'

সে হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'একা থাকতে আমার ভয় করে না। যে গভীর অরণ্য দেখে আপনি ভয় পাচ্ছেন তা আমার কাছে মোটেই ভয়ের কিছু নয়। আসুন, আমাদের ঘরে নিয়ে যাই।' বলে প্রমোদকে

নিয়ে এগিয়ে গেল। প্রমোদ কৌতূহলী হয়ে সেই নটীর সঙ্গে গেল। তার বাড়ির চারদিকে ছিল উদ্যান। সেই উদ্যানে ছিল বিচিত্র সব গাছ। শেয়ালগুলো ডাকছিল। সেই গাছ দেখে এবং শেয়ালের ডাক শুনে প্রমোদের গা ছমছম করতে লাগল।

নটী যে ঘরে ছিল সেখানে আর কেউ ছিল না। তাকে একটি আসনে বসতে দিয়ে কয়েকটি ফল সাজিয়ে এনে খেতে দিল। তারপর নটী তাকে নিয়ে গেল অন্য এক ঘরে। সেই ঘরে ফুলের বিছানায় তাকে ঘুমোতে বলল।

ঘুমের ঘোরে সে পাখির স্বপ্ন দেখল। পাখির মিষ্টি ডাক কলরবে রূপান্তরিত হল এবং সেই কলরবেই প্রমোদের ঘুম ভেঙে গেল। প্রমোদ চোখ কচলে দেখল পাখি নেই, সুন্দরী নটীও নেই। চারদিকে ছড়িয়ে আছে কঙ্কাল। ভাঙা হাঁড়ির টুকরো। প্রমোদ পরিষ্কার বুঝতে পারল যে সেটা শ্মশান।

ভয়ে প্রমোদের গা হিম হয়ে গেল। সে যা দেখেছে তা স্বপ্ন না বাস্তব কিছুই প্রথমে বুঝতে পারল না। পরে তার মনে হল সুন্দরী নটী পিশাচিনী হতে পারে। কিন্তু সেই সুন্দরীর রূপ তার চোখের পাতায় লেগে রইল।

প্রমোদের আঁকা ছবিগুলো প্রদীপ গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল। কিন্তু সেই ছবিগুলোর একটিও প্রদীপের পছন্দ হল না। সে প্রমোদকে বলল, 'রাজকুমারীদের রূপ যে এত নিকৃষ্ট ধরনেরও হতে পারে তা আমি আগে ভাবিনি। আমার কল্পনায় ছিল যে রাজকুমারীরা আরও অনেক বেশি সুন্দরী। আজ তোমার ছবি দেখে হতাশ হয়েছি। আমার কল্পনার সঙ্গে তোমার ছবির কোনো মিল খুঁজে পাইনি।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রদীপ প্রমোদকে বলল, 'মনমেজাজ ভালো নেই। তোমার মনের মতো একটা ভালো ছবি এঁকে দেখাও তো।'

প্রমোদ ছবি আঁকল। একটি মেয়ের ছবি। সেই ছবির জন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকে তাকাতে হল না। কীভাবে যেন তুলির ডগায় সেই মেয়ের ছবি এসে গেল। পটে আঁকা হয়ে গেল।

আশ্চর্য যে সুন্দরী নটীকে সে অরণ্যে দেখেছিল কোনো অজানা কারণে তারই ছবি আঁকা হয়ে গেল। কারণ তার চোখের পাতায় সেই নটীর ছবি এঁটেছিল, আঁকার আগে শিল্পীর মনে সেই সুন্দরী নটীর ছবি বহু বার আঁকা হয়ে গেছে।

সেই ছবি দেখে প্রদীপ অবাক হয়ে গেল। তার আগে যত রাজকুমারীদের ছবি সে দেখেছিল তাদের প্রত্যেকটির চেয়ে সেই ছবি ছিল সুন্দর। আনন্দে সে প্রমোদকে বলল, 'এমন সুন্দর রূপবতী থাকতে তুমি আজেবাজে রাজকুমারীদের ছবি এঁকে দেখালে কেন? এটা নিশ্চয় কোনো রাজকুমারীর ছবি? নিশ্চয় এটা লুকিয়ে রেখেছিলে? কেন রেখেছিলে?'

'এই ধরনের সুন্দরী বাস্তব জগতে কিন্তু কেউ নেই। এটা আমার কল্পনার ছবি।' প্রমোদ বলল।

'মিথ্যা কথা বল না। যা তুমি দেখ না তা তুমি আঁক না। আমি তোমাকে ভালোভাবেই চিনি, জানি।' বলল যুবরাজ।

'যা বাস্তব নয় এমন অনেক দৃশ্যও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।' হাসতে হাসতে প্রমোদ বলল।

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ যে এই ধরনের মেয়ে কোনো-না-কোনো সময়ে তোমার চোখে পড়েছিল? কিন্তু এখন তুমি সেই মেয়েকে দেখতে পাচ্ছ না। এই তো?' প্রদীপ বলল।

'সততার খাতিরে তোমার কথা স্বীকার করতেই হয়।' প্রমোদ বলল।

'তাহলে আমাকেও দেখাও। কে সে? কোথায় থাকে? আমি তাকেই বিয়ে করব।' যুবরাজ বলল।

'যুবরাজ প্রদীপকুমার, অত ব্যস্ত হয়ো না। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবেই বলছি, এই সুন্দরী নটীকে বিয়ে করা অসম্ভব। কারণ এই মেয়ে মানবী নয়। আমি যেখানে দেখেছিলাম সেখানেই যে এই সুন্দরীকে দেখতে পাব এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাকে দেখা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, তার সম্পর্কে তোমাকে বলেই বা কী লাভ। সেইজন্যেই আমি বলিনি।' প্রমোদ বলল।

'সে যেই হোক, সে পিশাচ হোক, রাক্ষসী হোক, আমি তাকেই বিয়ে করব। তুমি যেখানে তাকে দেখেছিলে সেখানেই আমাকে নিয়ে যাও। আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। এই মুহূর্তে চল।' প্রদীপ বলল।

নিরুপায় হয়ে প্রমোদকে রাজি হতে হল। দু-জনে মিলে ঘোড়ায় চড়ে সেই অরণ্যের দিকে রওনা হল। সে রাত্রেও জ্যোৎস্না ছিল। প্রমোদ যেখানে সেই নটীকে দেখেছিল সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে দু-জনে অপেক্ষা করতে লাগল। মাঝরাত্রে ওরা শুনতে পেল সুমধুর গান ও নূপুরের রিনিঝিনি। অদূরে দাঁড়িয়ে প্রদীপ ও প্রমোদ নটীর গান শুনল ও নাচ দেখল। বেশিক্ষণ প্রদীপ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। প্রদীপ ছুটে গেল সেই নটীর কাছে। নাচতে নাচতে হঠাৎ একসময় নটী প্রদীপের উপর ঢলে পড়ল। পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রদীপের কাছে ক্ষমা চাইল। প্রদীপ অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুন্দরী, তোমার জন্যই আমি এসেছি। তোমাকে দেখে আমি ধন্য হয়েছি। তোমাকে আমি গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।' বলতে বলতে যুবরাজ দু-হাত বাড়িয়ে নটীর হাত ধরে ফেলল।

সুন্দরী নটী খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার যদি ইচ্ছা জাগে বিয়ে করার করুন।'

তারপর নটী তাকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল।

'কী দরকার? আমার অনেক বড়ো বড়ো ভবন আছে। তোমার বাড়িতে গিয়ে এখন সময় নষ্ট করার কী দরকার? তুমিই বরং আমার সঙ্গে এসো।' প্রদীপ এই কথা বলে প্রমোদের দিকে এগোতে লাগল। নটীও প্রদীপের পাশাপাশি হেঁটে প্রমোদের কাছে এল।

প্রমোদ বলল, 'যুবরাজ প্রদীপকুমার, তুমি কাকে সঙ্গে নিয়ে চললে? মনে রেখো এ মানবী নয়, রাক্ষসী। তোমার ভালোর জন্যই, তোমার হিতাকাঙ্খী হিসাবেই তোমাকে বলছি, ওকে সঙ্গে নিও না। ওকে এখানেই ছেড়ে দাও।'

প্রদীপ তার কথার গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'কি আজেবাজে কথা বলছ? এই সুন্দরী নটীকে কি এখানে ছেড়ে যাওয়ার জন্যই এসেছি। কতকাল পরে আমি মনের মতো এক বউ পেলাম। একে দেখে তোমার নিশ্চয় মতিভ্রম হয়েছে। তোমার মাথায় এখন বুদ্ধি বলতে কিচ্ছু নেই।'

প্রমোদ যখন দেখল যে যুবরাজ প্রদীপকে ফেরানোর কোনো উপায় নেই তখন সে চরম কথা বলল, 'তুমি যদি তোমার প্রতিজ্ঞায় অটল থাক, তাহলে আমাকে এই মুহূর্তে এখানেই ছেড়ে দাও।'

'তোমার যা ইচ্ছা তুমি কর। আমার যা ইচ্ছা আমাকে করতে দাও। মনে রেখ, শুধু তুমি কেন, সমস্ত জগৎ সংসারও যদি আমাকে এর জন্য ছাড়তে হয় আমি ছাড়ব। কিন্তু এই সুন্দরী নটীকে ছাড়ব না।' প্রদীপ বলল।

'তাহলে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।' বলে প্রমোদ ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

ওর চলে যাওয়ার পর প্রদীপ রাতটা সেখানেই কাটাল নটীকে নিয়ে। সকালে প্রদীপ দেখল যে তার কোলে পড়ে রয়েছে কঙ্কাল। সেই কঙ্কাল দেখে প্রদীপের অসহ্য লাগল। সে ওই কঙ্কাল ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর নিজের ঘোড়ায় উঠে দেশের দিকে রওনা হল। পেছন দিক থেকে কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। কিন্তু যুবরাজ প্রদীপকুমার পেছনের দিকে ফিরে তাকাল না। তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, প্রমোদ আর যুবরাজ প্রদীপের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তবু প্রমোদ চলে গেল কেন? সুন্দরীকে প্রদীপ বিয়ে করতে যাচ্ছে দেখে কি তার মনে ঈর্ষা জেগেছিল? নাকি, যুবরাজ তার কথা শোনেনি বলে অভিমানে চলে গেল? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'প্রমোদের মনে ঈর্ষার কোনো প্রশ্নই ছিল না। তা যদি থাকত তাহলে সে ওই অরণ্যে যুবরাজকে নিয়ে যেত না। অন্য অরণ্যে নিয়ে যেত। প্রদীপ তার কথা শোনেনি বলেও সে অভিমানে চলে যায়নি। প্রমোদ গোড়া থেকেই নটীকে সন্দেহ করেছিল। সে অবাস্তব চিত্র এঁকেছে বটে কিন্তু সে মনে-প্রাণে জানত যে সেটা অবাস্তব। যুবরাজ সত্যি যদি সুন্দরী নটীকে আনত তাহলে শেষপর্যন্ত প্রমোদকেই দায়ী হতে হত। তাই এই দায়িত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই প্রমোদ চলে গিয়েছিল।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

৪২. অযোগ্য ছেলে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তোমাকে ভক্তি করে এমন লোক অনেক থাকতে পারে। কিন্তু রাজভক্তি কখন যে কীভাবে কার মনে জাগে তা বোঝা যায় না। আবার সেই রাজভক্তি কখন যে ঝট করে চলে যায় তাও আগে থেকে বলা শক্ত। একটি কাহিনি বললে আমি যা বলতে চাই তা আরও পরিষ্কার হবে। আমি স্বর্ণসিংহের কাহিনি শোনাচ্ছি। বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে জয়পুরের রাজা ছিল নাগবর্মা। যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে দেশের শাসন করত। প্রজারাও তার শাসনকালে সুখে ছিল। প্রজারা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করত। ফসল পেত।

রাজার একটা দুঃখ ছিল। বিয়ের অনেক বছর পরেও রাজার কোনো ছেলে-মেয়ে হয়নি। এরজন্য প্রজারাও দুঃখ পাচ্ছিল। কারণ তাদের ইচ্ছা, রাজার ছেলে হোক এবং সে ছেলে এই রাজার মতো যোগ্য রাজা হোক।

যত ভালো রাজাই হোক সব প্রজা যে সমান হবে এমন কথা বলা যায় না।

সন্তান কামনা করে নাগবর্মা পুজোপাঠ শুরু করে দিল। রাজার মন পুজোপাঠে পড়ে থাকত। ফলে দেশের শাসনকার্য দেখাশোনা করত মন্ত্রীরা। এই সুযোগে রাজার বিরুদ্ধে যারা ছিল তারা আরও কাছাকাছি এল। গোপনে পরামর্শ চলল। ওদের নেতা ছিল রজত সিংহ।

রজত সিংহ সাধারণ প্রজা ছিল না। সে ছিল নাগবর্মার সেনাপতি। সে সবসময় অপেক্ষা করছিল রাজার মৃত্যুর জন্য। সিংহাসনের দিকে তার নজর ছিল।

পাশাপাশি মন্ত্রী ধর্মদত্ত অন্য পরিকল্পনা করছিল। রাজার যদি সন্তান না হয়, রাজা যদি মারা যায় কীভাবে কী করা হবে তা চিন্তা করছিল।

রাজা যখন পুজোপাঠে মেতেছিল তখন ধর্মদত্ত শক্ত হাতে হাল ধরল। সেনাপতি রজত সিংহ কখন কী করে তা চটপট জেনে নেওয়ার জন্য লোক লাগিয়েছিল। মন্ত্রী ধর্মদত্ত অবশ্য এও ভেবেছিল যে রাজার মৃত্যুর পর বিদেশি কোনো রাজা দখল করার চেয়ে সেনাপতির রাজা হওয়া অনেক ভালো।

কিন্তু সেনাপতির ইচ্ছা, মন্ত্রীর হিসেবনিকেশ সব ওলটপালট হয়ে গেল। কোনো কিছুরই দরকার হল না। কারণ নাগবর্মার ছেলে হল।

প্রধানমন্ত্রী ধর্মদত্তও আগের মতো সতর্কতার সঙ্গে দেশ শাসনের কাজ করত না। আগে একদিকে দেশের শাসনকাজ দেখত আর অন্যদিকে দেখত রাজার জীবন। এখন আর সে ভাবনা নেই। এখন ধর্মদত্তের মনে ঢুকল অন্য চিন্তা। কীভাবে উত্তরাধিকারীকে বড়ো করা যায়।

ছেলে জন্মানোর কয়েক বছর পরে মন্ত্রী ধর্মদত্ত রাজা নাগবর্মাকে সেনাপতির গতিবিধি, পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাল। এই প্রথম মন্ত্রী সেনাপতির বিরুদ্ধে জানাল।

রাজা নাগবর্মা ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'এত কিছু জানা সত্ত্বেও তাকে এখনও বন্দি করা হয়নি। এই ধরনের দেশদ্রোহী সেনাপতিকে বন্দি করা হোক।'

'সেনাপতিকে ঝট করে প্রকাশ্যে বন্দি করা উচিত হবে বলে মনে হচ্ছে না মহারাজ। সেনাপতি বহু বছর ধরে ওই সিংহাসনের দিকে নজর রেখে তার পরিকল্পনার জাল বিস্তার করে চলেছে। শুনে আপনি হয়তো ক্ষিপ্ত হবেন কিন্তু এটা সত্য ঘটনা যে সেনাপতি রজত সিংহ যেকোনো মুহূর্তে আপনার সিংহাসন দখল করে

নিতে পারে। তলে তলে সে অনেক আগে থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছে। এখন আমাদের সিংহাসন রক্ষাই একমাত্র কাজ নয়, এই শিশুর প্রাণরক্ষা করা তার চেয়ে বড়ো কাজ।'

'যা শুনছি সব অদ্ভুত ঠেকছে। কী ব্যাপার? তলে তলে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে অথচ আমি কিছু জানি না!' রাজা নাগবর্মা বলল। তারপর ধর্মদত্ত নিজের পরিকল্পনা রাজাকে বলল। রাজা মন্ত্রীর সব কথা শুনে রাজি হল।

ধর্মদত্ত যা ভেবেছিল তাই হল। রাজার ছেলে হওয়ার পর ধর্মদত্ত বুঝেছিল রজত সিংহ এবার রাজার ছেলের প্রাণনাশের চেষ্টা করবে। রজত সিংহও সেইরকম পরিকল্পনাই করছিল। কিন্তু তার সে গুড়েও বালি পড়ল। হঠাৎ একদিন রাজার ছেলে উধাও হয়ে গেল। এই খবর রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশবাসী দুঃখে ভেঙে পড়ল।

এদিকে রজত সিংহ যখন দেখল যে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে তখন এমন ভাব করতে লাগল যেন ওই ধরনের চিন্তা তার মনে কোনোদিন ছিল না। একদিন রাজার কাছে এসে সে বলল, 'মহারাজ, আপনি অত ভাববেন না। আপনার ছেলেকে, আমাদের যুবরাজকে যে কে লুকিয়ে রেখেছে তা আমি জানি। তাকে আমি কঠোর শাস্তি দেব।'

রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে সেই দেশদ্রোহী? আমার বিরুদ্ধে কে এই ধরনের পাপ কাজ করছে?'

'মহারাজ, যে আপনার নুন খাচ্ছে সেই করছে।' সেনাপতি বলল।

'কে সে?' রাজা বলল।

'আপনার সবচেয়ে বিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী, ধর্মদত্ত। যেহেতু তার নাম ধর্মদত্ত সেইহেতু তার অধর্মের কাজগুলো নজরে পড়ে না।' বলল সেনাপতি রজত সিংহ।

নাগবর্মা আর কোনো কথা বলল না।

রাজা কোনো কথা বলুক আর না বলুক সেনাপতি নিজের কর্তব্যে অটল। চারদিকে লোক পাঠাল, যুবরাজকে খুঁজে আনার জন্য। কিছুদিন পরে ওরা ফিরে এল। কোনো ফল হল না।

সেনাপতি রজত সিংহ দেখল, আর যুবরাজের ফিরে আসার কোনো আশঙ্কা নেই। যে মন্ত্রী তার পথের কাঁটা ছিল তারও পাত্তা নেই। এই অবস্থায় সহজেই সিংহাসন দখল করা যায়। হঠাৎ এক দিন সে রাজাকে বন্দি করে সিংহাসন দখল করল।

রাজা হয়ে রজত সিংহ শাসনকাজের অনেক অদলবদল করল। যাদের রজত সিংহ দু-চোখে দেখতে পারত না তাদের সরিয়ে দিল। নিজের পছন্দসই লোককে বিভিন্ন রাজপদে বসাল। আত্মীয়স্বজন মনের মতো কাজ করে যত ইচ্ছা রোজগার করতে লাগল। ফলে প্রজাদের জীবন বিপন্ন হল। ওদের জীবনে দুঃখের ছায়া নেমে এল। কিছু প্রজা মারা গেল। কিছু প্রজা ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে রইল। বাকি প্রজা বিদেশে পালিয়ে গেল।

না জানি কেন ধর্মদত্তের ছেলে স্বর্ণসিংহ কিন্তু রজত সিংহের সুনজরে ছিল। অনেক আগে থেকেই রজত সিংহের প্রতিটি কাজ স্বর্ণসিংহ সমর্থন করত। রজত সিংহ বলতে স্বর্ণসিংহ অজ্ঞান। এ ছাড়া যোগ্যতার দিক থেকেও স্বর্ণসিংহ তার বাপকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই রজত সিংহ স্বর্ণসিংহকে নিজের সেনাপতির পদে নিয়োগ করল।

সিংহাসনে বসেও রজত সিংহ ধর্মদত্তের কথা ভাবত। কারণ সে জানত যে ধর্মদত্ত তাকে ঘৃণা করে। সে কীভাবে কী করতে চায় তা ধর্মদত্ত টের পায়। যদি ধর্মদত্ত বেঁচে থাকে তাহলে একদিন না একদিন তাকে বিপদে পড়তেই হবে। আবার এমনও হতে পারে যে ধর্মদত্ত যুবরাজকে নিয়েই পালিয়েছে। তাই যতদিন না এই দু-জনকে শেষ করা যাচ্ছে ততদিন শান্তিতে সিংহাসনে বসে থাকা যাবে না। ওদের মেরে ফেললে রজত সিংহ শান্তিতে রাজ্যশাসন করতে পারে। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে হবে রাজা।

একদিন রজত সিংহ সেনাপতি স্বর্ণসিংহকে বলল, 'দেখ স্বর্ণসিংহ, আমার বড়ো ইচ্ছা যে আমার মৃত্যুর পর তোমাকে রাজা করি। তবে তার আগে আমার মেয়েকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। আর এই বিয়ের আগে তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। কাজটি জরুরি। এবং প্রকৃত রাজভক্ত ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে পারে না। তোমার মধ্যে আমি সেই রাজভক্তি দেখেছি। আর দেখেছি বলেই বলছি। তুমি যেকোনোভাবে তোমার বাবা আর যুবরাজকে ধরে এনে দাও। তারপরেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

স্বর্ণসিংহ হেসে বলল, 'মহারাজ, আপনার নির্দেশই যথেষ্ট। তারজন্য আমার নিজের কোনো সুখ আমি চাই না।'

তারপর স্বর্ণসিংহ কিছু লোক নিয়ে যুবরাজ ও বাবার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। স্বর্ণসিংহের খোঁজা ব্যর্থ হয়নি। বাবার খোঁজ পেল সে। অরণ্যের মাঝে দুই পাহাড়ের মধ্যিখানে ওরা ছিল। যুবরাজ অস্ত্রচালনা শিখছিল। কয়েক জন অরণ্যবাসীও ছিল ওদের সঙ্গে।

কয়েক জন অরণ্যবাসী জয়পুরে এসে গোপনে প্রচার করল যে যুবরাজ বেঁচে আছে। ওরা জানাল যে ওরা কোনো এক সাধুর কাছে শুনেছে। ওদের প্রচারের পরে, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল কিছু কিছু প্রজা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

গোপন পথে ওরা ধর্মদত্ত যেখানে ছিল সেখানে এসে হাজির হচ্ছিল।

স্বর্ণসিংহ এসে দেখল রাজার ছেলে বড়ো হয়েছে। তার বাবার নেতৃত্বে বিরাট সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছে।

ধর্মদত্ত ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, 'দেশের সবাই ভালো আছে?'

'কিন্তু আমি তো বাবা ভালো-মন্দ জানাতে আসিনি। আমি এসেছি...' স্বর্ণসিংহ কথা শেষ করতে পারল না।

ধর্মদত্ত বলল, 'আমি জানি তুমি কেন এসেছ। তুমি এসেছ আমাকে এবং যুবরাজকে বন্দি করে নিয়ে যেতে। কিন্তু তার আগে জেনে রাখ যে তুমি আর তোমার লোকজন ইতিমধ্যেই এখানে বন্দি হয়ে গেছ।'

বাবার কথা শুনে স্বর্ণসিংহ ভীষণ রেগে গেল। চিৎকার করে তার লোকজনদের বলল, 'এঁকে তোমরা বন্দি কর।'

পরমুহূর্তে অরণ্যবাসী স্বর্ণসিংহকে আঘাত করল। স্বর্ণসিংহ মূর্ছা গেল।

ধর্মদত্ত ছেলের চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। জ্ঞান হওয়ার পর স্বর্ণসিংহ বাপের কাছ ক্ষমা চাইল। পরে বাবাকে বলল, 'বাবা আমি আর ফিরে যাব না। তোমার কাছেই থাকব।'

ধর্মদত্ত বলল, 'তোমার এখানে থাকার কোনো দরকার নেই। তোমাকে যে স্নেহ করে তার কপালে অনেক দুঃখ আছে। কিছুদিনের মধ্যে তাকে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হবে। যাও, রজত সিংহকে খবর দাও যে দেশবাসী তাকে শেষ করবে।'

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, রাজভক্ত স্বর্ণসিংহের ভক্তি অরণ্যবাসীর এক আঘাতে উবে গেল কী করে? সে কি সত্যি বদলে গিয়েছিল? নাকি সেটা তার অভিনয় ছিল? সে থাকতে চাইলেও বাপ হয়ে ধর্মদত্ত তাকে রাখল না কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'স্বর্ণসিংহের মধ্যে সত্যিকারের রাজভক্তি ছিল এমন কোনো প্রমাণ আমি পাইনি। ওর বাবা যখন ছিল না, ওর আত্মীয়স্বজন যখন খারাপ অবস্থায় পড়ে গেল তখন সে রজত সিংহের সুনজরে আসার চেষ্টা করেছিল। খালি হাতে ফিরে গেলে রজত সিংহ যে তাকে কঠোর শাস্তি দেবে এ ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই সে বাবার কাছে থেকে যেতে চাইল। অপরপক্ষে ধর্মদত্ত ছেলের এই দুর্বল ভূমিকা পছন্দ করেনি। গোপনে যে বাহিনী গঠিত হয়েছে, তা নষ্ট হয়ে যেত।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪৩. বিরূপাক্ষের অবস্থা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, অবস্থার যতই পরিবর্তন হোক না কেন তুমি কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা ছেড়ো না। কারণ তপস্যার সিদ্ধিলাভের মুখে তা ছেড়ে ওঠায় বিরূপাক্ষের যে কী মারাত্মক অবস্থা হয়েছিল তা কল্পনা করা যায় না। বিরূপাক্ষের কাহিনি আগাগোড়া শুনলে তোমার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হবে। শুধু তাই নয়, আমার কাহিনি শুনলে তোমার এই পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল

বিরূপাক্ষ ছিল কাশীর যুবক। তার আপনজন বলতে কেউ ছিল না। বাচ্চা বয়স থেকেই সে অনাথ ছিল। যৌবনে পা দেবার মুখে তার মনে ক্রমশ বৈরাগ্যের ভাব জাগল।

তার এই ভাব জাগার পর সে আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকতে পারল না, চলে গেল হিমালয়ে তপস্যা করতে।

টানা দু-বছর তপস্যা করার পর এক তাপস তার কাছে এসে তাকে বলল, 'বিরূপাক্ষ, তুমি কি মুক্তির জন্য তপস্যা করছ? যদি তাই করে থাক তবে মনে রেখো তপস্যা করতে বসার আগে, মোক্ষলাভ চাইতে বসার আগে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা দরকার। চোখ কান বুজে বসে পড়লে, মোক্ষলাভ চাওয়ার আগে, যে জ্ঞান দরকার সেই জ্ঞান তোমার হবে কোত্থেকে? জ্ঞানলাভের জন্য দেশভ্রমণ দরকার। তাই তোমার উচিত এখন দেশভ্রমণ করা।' বলে ওই তাপস অন্তর্হিত হল। বিরূপাক্ষ চারদিকে তাকিয়ে দেখল। কাউকে দেখা গেল না। তার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

তখন বিরূপাক্ষ বুঝল তাকে কোনো সিদ্ধপুরুষ উপদেশ দিয়ে গেছে।

তৎক্ষণাৎ বিরূপাক্ষ উঠে পড়ল। দেশভ্রমণ করতে সে বেরিয়ে পড়ল। বহুদিন ধরে, বহু দেশ ঘুরে, বহু জ্ঞানী মানুষের সাহচর্য সে লাভ করল। ঘুরতে ঘুরতে সে পৌঁছাল অবন্তীনগরে। নগরে ঢুকেই সে সুন্দর এক উদ্যান দেখতে পেল। ক্লান্ত বিরূপাক্ষ গাছের নীচে কিছুক্ষণ বসল। পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙার পর বিরূপাক্ষ দেখতে পেল তার চারদিকে দাসীরা রয়েছে। ওদের হাতে ফুল, ফল, চন্দন ইত্যাদি। ওরা তাকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যেতে চাইল। ওদের অনুরোধ শুনে বিরূপাক্ষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের রাজকুমারী আমাকে ডাকছে কেন?'

ওরা বিরূপাক্ষকে বলল

'আমাদের রাজকুমারী খুব ভালো চিত্রশিল্পী। এই উদ্যান তারই মনের মতো তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্যানে পায়চারি করার সময় তিনি আপনাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তার ইচ্ছা হয়েছে আপনার ছবি আঁকার। তাই তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আপনার ঘুম ভাঙার পর তাঁর কাছে নিয়ে যেতে। আমরা আপনাকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যেতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে চলুন।'

সামনে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর দাসীরা এমনভাবে বলল যেন না গেলে ওরা বিরূপাক্ষকে তুলে নিয়ে যাবে।

বিরূপাক্ষ ওদের সঙ্গে রাজকুমারীর কাছে গেল। রাজকুমারী ছিল অসাধারণ রূপবতী। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিরূপাক্ষ তার কাছে নিজের পরিচয় জানাল।

পরে বিরূপাক্ষের ছবি আঁকল রাজকুমারী। ছবি আঁকতে অনুমতি দেওয়ায় বিরূপাক্ষকে সেই রাত্রে অতিথি হিসাবে থাকার জন্য রাজকুমারী অনুরোধ করল। বিরূপাক্ষ ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। সে মনের মতো আহার খেয়ে হংস খাটের নরম বিছানায় ঘুমোল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল। বিরূপাক্ষের যখন

গভীর ঘুম তখন স্বপ্নে দেখা দিল সেই তাপস, যে হিমালয়ে বিরূপাক্ষকে উপদেশ দিয়েছিল। তাপস বলল, 'বিরূপাক্ষ, তোমার জীবনের এখন এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ। তোমার ভাগ্য খুলে গেছে। তবে এখনি তোমাকে একটা কথা বলি, এই রাজকুমারীর মতো এত ভালো অর্ধাঙ্গিনী তুমি আর জীবনে পাবে না।'

'তার মানে? আপনি কী বলছেন?' বিরূপাক্ষ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'পাগল কোথাকার! তুমি বুঝতে পারছ না রাজকুমারী তোমাকে কত ভালোবাসে। সে তো কালকেই তার বাবাকে মনের কথা জানাবে। তার বাবা রাজি হয়ে গেলেই আর কোনো বাধা থাকবে না। তাকে দেখে তুমিও তো মুগ্ধ হয়েছ।' বলে তাপস অদৃশ্য হল। তার অদৃশ্য হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।

বিরূপাক্ষ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। বুঝল সেটা স্বপ্ন। কিন্তু তাপসের কথা তার কানে তখনও বাজছিল। সেই গভীর রাত্রে সে বেরিয়ে পড়ল পথে। তাড়াতাড়ি হেঁটে এগিয়ে গেল সে নিজের পথে।

ভোরে সে পৌঁছাল ছোট্ট গ্রামে। গ্রামে ঢোকার মুখেই সে দেখতে পেল এক কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ে ঘরের সামনে ছিল এক গাছ। ওই ঘরে ছিল এক বুড়ি। বিরূপাক্ষ ওই কুঁড়ে ঘরের কাছে গিয়ে বুড়িকে জল চাইল মুখ ধোওয়ার জন্য।

বুড়ি তৎক্ষণাৎ হেঁকে বলল, 'সত্যবতী কে জানি এসেছে। তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল দিয়ে যাও।'

এক যুবতী এক ঘটি জল নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে এসে বাইরে রেখে আবার দেয়াল ধরে ধরে চলে গেল।

বিরূপাক্ষ বুড়িকে বলল, 'দিদিমা, এ কি আপনার নাতনি? তার হাঁটা ওরকম কেন? একটু যেন কম দেখে?'

'সত্যবতী জন্ম থেকেই অন্ধ বাবা। তার মা-বাবা নেই। সংসারে আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই। আমি মরে গেলে ওর অবস্থা যে কী হবে তা কে জানে!' বলে বুড়ি চোখের জল মুছতে লাগল।

বিরূপাক্ষের মন কেঁদে উঠল। সেই অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই থেকে যাওয়া ঠিক করল সে।

সেই রাত্রে বিরূপাক্ষ স্বপ্ন দেখল সেই তাপসকে। বিরূপাক্ষ তাকে বলল, 'হে তাপস, আমি ঠিক করেছি অন্ধ সত্যবতীকে বিয়ে করব। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

তৎক্ষণাৎ তাপস 'তথাস্তু' বলে অদৃশ্য হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, আমার কয়েকটি প্রশ্ন মনে জেগেছে। বিরূপাক্ষ তপস্যায় বসেছিল। তাকে তপস্যা থেকে তুলে তাপস দেশভ্রমণে পাঠাল কেন? যে তাপস নিজে বিরূপাক্ষকে উপদেশ দিয়েছিল রাজকুমারীকে বিয়ে করতে। সেই আবার এক অন্ধ অনাথ মেয়েকে বিরূপাক্ষ বিয়ে করতে চাইলে আশীর্বাদ করল কেন? বিরূপাক্ষই বা রাজকুমারীকে বিয়ে করতে রাজি হল না কেন? রাতারাতি পালাল কেন? আবার অন্ধ মেয়েকেই বা বিয়ে করল কেন? আমার এই প্রশ্নগুলোর জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তবে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'তপস্যা করার সময় বিরূপাক্ষের মনে কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কোনো কিছুর যদি আকাঙ্ক্ষা না থাকে তবেই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। তাপস ছিল বিরূপাক্ষেরই আকাঙ্ক্ষার বাইরের রূপ। আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় মোক্ষলাভের অনুকূল হয়। নাও হতে পারে। রাজকুমারীকে বিয়ে করলে বিরূপাক্ষের মোক্ষলাভ হয়তো কোনোদিনই হত না। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ বিরূপাক্ষের মনে তেমন কোনো লোভ বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সত্যবতীকে বিয়ে করে সে সাংসারিক কাজকর্মের কিছু অভিজ্ঞতাও লাভ করবে। লোভ যদি না থাকে, মোহের জালে যদি বাঁধা না পড়ে, যে কোনোদিন বিরূপাক্ষের মতো মানুষ আবার তপস্যায় বসতে পারে মোক্ষলাভ করতে পারে। তাপস এই আশা পোষণ করেই আশীর্বাদ করল।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গেল সেই গাছে।

৪৪. গীতার কথা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতোই শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল তাঁকে বলল, 'রাজা, তোমার মতো মহান ব্যক্তির এই ধরনের ক্ষুদ্র কাজ করা উচিত নয়। ক্ষুদ্র কাজ করলে মানুষের পতন হয়। রঘুর কথা বললে তুমি বুঝতে পারবে আমার কথা কতখানি সত্য। রঘুর কাহিনি শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রমও কমবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে রঙ্গ নগরীর কাছে এক ঘন বন ছিল। ওই বনকে অরণ্যও বলা চলে। সেখানে এক নামকরা ডাকাত থাকত। সপরিবারে সদলবলে সে ওই অরণ্যে দীর্ঘকাল ছিল। তার মারা যাওয়ার পর তার ছেলে রঘু বাপের কাজ কাঁধে তুলে নিল। সেও চুরি-ডাকাতি করত। বাচ্চা বয়স থেকেই বাপের কাছে চুরি বিদ্যা শিখেছিল। তাই বাপ মারা যাওয়ার পর চুরি-ডাকাতি করতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। বাচ্চা বয়সে বাপের সঙ্গে রঙ্গ নগরীর উৎসব ও মেলা দেখতে যেত।

একবার সে রঙ্গ নগরীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে গীতাপাঠ হচ্ছিল। সেখানে যা শুনল, যা বুঝল তাতে তার ধারণা হল যে জগতে যা কিছু ঘটছে তা ভগবানের ইচ্ছেতেই ঘটছে। মানুষকে ভগবান যেভাবে চালাতে চান সেইভাবেই চালান। ভগবানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে মোক্ষলাভ হয়।

বাপের মারা যাওয়ার পর তাকেই চুরি-ডাকাতির নেতৃত্ব করতে হল। নতুন উৎসাহে অনেক জায়গায় চুরি-ডাকাতি করে সে অল্পদিনের মধ্যেই অনেক টাকাপয়সা করে ফেলেছিল। রঘু নিজে করলেও সে ভাবছে না যে সে নিজে করছে। নিজের ইচ্ছায় করছে। নিজের তা করার ক্ষমতা আছে। নিজে তা করতে পারে। সবসময় মনে-প্রাণে সে ভাবছে ভগবান করিয়ে নিচ্ছে। সে মাধ্যম মাত্র। তার ধারণা ছিল ভগবান তাকে দিয়ে চুরি-ডাকাতিও করিয়ে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে রাজার সেনারা ওই অরণ্যে হানা দিয়ে চোর-ডাকাতদের আক্রমণ করে তাদের বন্দি করত। কেউ হঠাৎ ধরা পড়ত, কেউ পালিয়ে বাঁচত। রাজার সেনারা আসছে শুনে রঘুও ঘোড়ায় চড়ে পালাল।
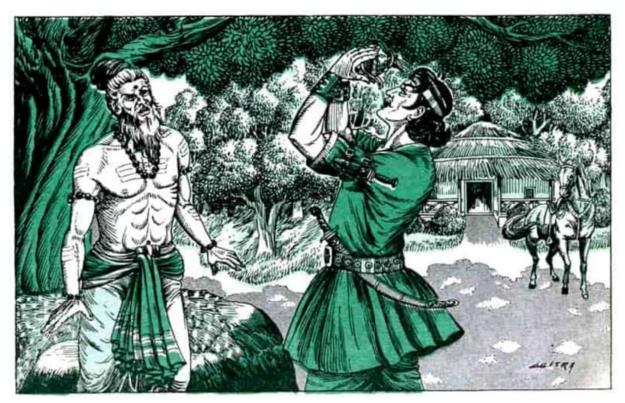
অনেক দূর যাওয়ার পর রঘুর তৃষ্ণা পেল। চারদিক তাকিয়ে, ছোটাছুটি করে সে একটি গাছের নীচে এক মুনিকে তপস্যা করতে দেখল। অনেকক্ষণ সামনে দাঁড়ালেও মুনি তার দিকে তাকাল না। তার পাশেই ছিল কুমণ্ডুলু। রঘু দেখল তাতে জল নেই।

রঘুর মেজাজ গরম হয়ে গেল। কারণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা মানুষকে অকেজো করে দেয়।

তখন রঘু মুনির গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'জল কোথায়? একটু জল চাই। ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে।' মুনি চোখ খুলে অগ্নিদৃষ্টিতে রঘুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুর্খ পাষণ্ড কোথাকার! দিলে তো আমার তপস্যা ভঙ্গ করে! তুমি এই মুহূর্তে পাথর হয়ে যাও।'

তখন রঘু বলল, 'পাথর করবেন পরে, আগে জল দিন তো! তেষ্টা মেটাই।'

মুনি অবাক হয়ে গেল। কারণ তার অভিশাপ রঘুর লাগেনি। তখন মুনি ভাবল, 'এ হয়তো আমার চেয়ে শক্তিশালী কেউ।' এ-কথা ভেবে মুনি মন্ত্রবলে কমণ্ডুলুতে জল আনিয়ে রঘুকে দিল। রঘু ওই জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে সে চলে গেল।

রঘুর এক ছেলে ছিল। ছেলে বড়ো হলে রঘু অনেক টাকা খরচ করে তার বিয়ে দিল। গুপ্তচরদের কাছ থেকে খবর পেয়ে রাজা অরণ্যের যে অঞ্চলে রঘু ছিল, যেখানে বিয়ে হচ্ছিল, সেখানে অনেক সৈনিক পাঠাল। মাঝরাত্রে রাজার অসংখ্য সৈনিক এসে অরণ্যের ওই অঞ্চল ঘিরে ফেলে রঘুর ছেলে, ছেলের বউ সহ তার দলের সবাইকে বন্দি করল। একা রঘু পালাতে পারল।

রাজা রঘু ধরা পড়েনি দেখে খুব রেগে গেল। সে তার লোকদের চারদিকে ঘোষণা করে দিতে বলল, 'এক সপ্তাহের মধ্যে রঘু ধরা না পড়লে রঘুর ছেলে, ছেলের বউ সহ তার দলের সবাইকে একসঙ্গে মেরে ফেলা হবে।'

এদিকে রঘুর দলের সবাই ধরা পড়ায় রাজার ঘোষণা কানে যায়নি। এই ঘটনার পরে, এক সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পর, মুখে মুখে খবরটা তার কাছে পৌঁছোতেই সে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে সোজা রাজপ্রাসাদে এসে হাজির হল। এসেই দেখতে পেল ছেলে এবং ছেলের বউয়ের মুণ্ডু রাজপ্রাসাদের গেটের সামনে

ঝুলছে। এই দৃশ্য দেখে তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। রেগে গিয়ে সে বলল, 'পাষণ্ড রাজা, দুটো নিরপরাধীকে মেরে ফেলল?' মুখ দিয়ে এই কথা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে রঘু সেখানেই পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, যে রঘু মুনির অভিশাপে পাথর হল না সেই রঘু বিনা অভিশাপে পাথর হয়ে গেল কী করে? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মুনির অভিশাপে রঘুর কিছু না হবার কারণ ভগবানের প্রতি তার গভীর দৃঢ় বিশ্বাস। রঘু ভাবত জগতে যা কিছু ঘটছে ভগবানের নির্দেশেই ঘটছে। কিন্তু যে মুহূর্তে নিজের ছেলের এবং ছেলের বউয়ের কাটা মুণ্ডু দেখল, সেই মুহূর্তে তার ভগবানের নির্দেশের কথা মনে ছিল না। সে মনে করল, ওটা রাজাই করেছে। ফলে সে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। মুনির অভিশাপের ফল যেন এতদিনে ফলল।

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

৪৫. প্রস্তাব

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের নীচে। গাছ থেকে শবদেহ নামিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতোই শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি কোন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে এত পরিশ্রম করছ আমি তা জানি না। তবে লক্ষ্যে পৌঁছে গেলেই যে মনের আশা মিটে যাবে, এমন নাও হতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে চন্দ্রবর্মার কাহিনি বলছি। শুনতে ভালোই লাগবে। পথ চলার পরিশ্রমও লাঘব হতে পারে।'

তারপর বেতাল কাহিনি শুরু করল

চন্দ্রবর্মা ছিল এক ক্ষত্রিয় যুবক। সৌন্দর্যই তার কাছে প্রধান বিচার্য ছিল। সুন্দর জিনিস দেখতে সে ভালোবাসত। প্রকৃতির সুন্দর রূপ দেখতে তার খুব ভালো লাগত। সুন্দর মানুষকে দেখে তার মন আনন্দে ভরে যেত।

সে বড়ো হল। মা-বাবা তার বিয়ের কথা ভাবল। কিন্তু চন্দ্রবর্মা, মা-বাবাকে সবিনয়ে বলল, 'আমার বিয়ের জন্য তোমরা তড়িঘড়ি করো না। আমি নিজেই খোঁজ করে ভালো মেয়ে পেলে বলব।'

একদিন সে বনপথে গেল। বনের সৌন্দর্য, গাছপালা, ফুল, ফল দেখে সে খুব খুশি হল। সেখানে ছিল একটি পুকুর। পুকুর ভরতি ছিল পদ্মফুল। পুকুরের ধারে একটি সুন্দর ঘোড়া চরছিল। আর লোভ সামলাতে পারল না। চন্দ্রবর্মা তাড়াতাড়ি গিয়ে ওই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। পরমুহূর্তে তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটতে লাগল। গভীর বনে সে ঢুকে গেল। পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে ঘোড়াটা গভীর অরণ্যে চন্দ্রবর্মাকে ফেলে কোথায় চলে গেল। চন্দ্রবর্মা মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। ধারে-কাছে কেউ ছিল না।

চন্দ্রবর্মার যখন জ্ঞান হল তখন সকাল। সমস্ত পরিবেশ তার কাছে নতুন লাগল। কাছেই একটি ঝরনা বইছিল এবং আরও অবাক কাণ্ড, নারীকণ্ঠে গান শোনা যাচ্ছিল।

গান শুনতে শুনতে চন্দ্রবর্মা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। শেষে দেখতে পেল ফুলে ভরা সুন্দর এক উদ্যানে, সাদা পোশাক পরে বেণি দোলাতে দোলাতে একটি সুন্দরী মেয়ে ফুল তুলছে আর গান গাইছে।

এক-পা এক-পা করে চন্দ্রবর্মা সেই উদ্যানের কাছে পৌঁছে গেল। যুবতীর গান শেষ হতেই চন্দ্রবর্মা হাততালি দিতে দিতে বলল, 'অপূর্ব, অপূর্ব।'

চমকে উঠে যুবতী বলল, 'কী অপূর্ব? কীসের অপূর্ব?'

'তোমার গান অপূর্ব। তোমার সুন্দর রূপ অপূর্ব।' আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চন্দ্রবর্মা বলল।

চন্দ্রবর্মার কথা শুনে যুবতী একটু হেসে বলল, 'আমাকে দেখেই আপনি এত অবাক হচ্ছেন, ওই পাহাড়ের কোলে যিনি আছেন তাঁকে দেখলে তো আপনি মূর্ছা যাবেন।' বলে সে একটি পর্ণকুটিরে ঢুকে গেল।

চন্দ্রবর্মা যুবতীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করল কিন্তু তার মন পড়ে রইল সেই পাহাড়ের কোলে। তার মনে বার বার প্রশ্ন জাগল, 'কে আছে ওই পাহাড়ের কোলে? আমাকে যেতেই হবে। কোথায় সে?' আপন মনে বলতে বলতে সে ওই পাহাড়ের দিকে হাঁটতে লাগল।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছোতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখানেও ছিল মনোরম একটি সুন্দর উদ্যান। উদ্যানের মাঝে সুন্দর পর্ণকুটির। সেই কুটিরে যেন এক অপ্সরা আলো জ্বালছিল।

চন্দ্রবর্মা এক পা এক পা করে কুটিরের কাছে গিয়ে অপ্সরির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যখন আছ, আলোর কী দরকার? তোমার মতো সুন্দরী তরুণী আমি জীবনে দেখিনি।'

তরুণী চন্দ্রবর্মাকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করল। খেতে দিল। ঘুমানোর জন্য ভালো বিছানা দিল। শেষে ওই তরুণী বলল, 'আমাকে দেখে আপনি এত ভালো ভালো কথা বললেন, আমার রূপ দেখে আপনি এত মুগ্ধ হলেন, আমি ভেবে পাচ্ছি না পাহাড়ের উপরে যে অপূর্ব সুন্দরী আছে তাকে দেখে আপনার অবস্থা কী হবে! অনেক রাত হল। এখন ঘুমোন।' বলে ওই সুন্দরী তরুণী অন্য ঘরে চলে গেল।

এই কথা শোনার পর চন্দ্রবর্মার চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। তার মনে হল, যতক্ষণ না ওই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ওই অপরূপা সুন্দরীকে দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ আমার শান্তি হবে না। নিঃশব্দে দরজা খুলে চন্দ্রবর্মা গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়ল। একে পাহাড় তার উপর বনজঙ্গল। ঘন অন্ধকার। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে, কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে রক্তাক্ত হয়ে চন্দ্রবর্মা পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল। পাহাড়ের চূড়ায় যখন উঠল তখন দিগন্তে সূর্য উঠছে।

সেই পাহাড়ের চূড়ায় ছিল এক অপূর্ব সুন্দর উদ্যান। ফুলে, ফলে ভরে ছিল সেই উদ্যান। উদ্যানের মাঝে ছিল একটি ভবন। যে ঝরনাকে সে ফাঁকে ফাঁকে দেখে এসেছে সেই ঝরনার উৎস ছিল সেই ভবন। সেই উৎসে জলের ফোয়ারায় স্নান করছিল সেই অপরূপা সুন্দরী।

চন্দ্রবর্মা অপলক দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখল। সে তার কাছে গেল।

অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবর্মা সেই অপরূপাকে বলল, 'এতদিন আমি স্ত্রী হিসেবে যার স্বপ্ন দেখেছি তুমিই সেই। স্বর্গ, মর্ত, পাতালে তোমার মতো সুন্দরী আর নেই। আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।'

'তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।' এই কথা বলে ওই অপরূপা চলে গেল।

চন্দ্রবর্মা হতাশ হয়ে পাহাড় থেকে নেমে, সেখানে আগে যে সুন্দরীকে দেখেছিল তাকে খুঁজল। কিন্তু তার দেখা পেল না। প্রথমে যে সুন্দরীকে দেখতে পেয়েছিল তার খোঁজে কত ঘোরাঘুরি করল, তাকেও পেল না। শেষে চন্দ্রবর্মা বাড়ি ফিরে এল। পরে বাবা-মা যে মেয়েকে পছন্দ করল সেই মেয়েকেই চন্দ্রবর্মা বিয়ে করল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'মহারাজ, তিন-তিনটি সুন্দরীকে দেখার পর চন্দ্রবর্মার মন থেকে সুন্দরী দেখার ইচ্ছা লোপ পেল কেন? প্রথম ও দ্বিতীয় সুন্দরী চন্দ্রবর্মাকে আমন্ত্রণ করে খাওয়াল আর তৃতীয় সুন্দরী চলে যেতে বলল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব তোমার জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'সুন্দরী দেখা নয়, সুন্দরের প্রতি তার টান, তার আগ্রহ আগে যেমন ছিল, পরেও সেটা তেমনি ছিল, লোপ পায়নি। তৃতীয় সুন্দরীর কাছে সে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু ওই সুন্দরী চন্দ্রবর্মাকে বিয়ে করতে চায়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় সুন্দরীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব চন্দ্রবর্মা করেনি। শুধু তাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিল; চন্দ্রবর্মা ঠেকে শিখল যে সে যে সুন্দরীকে বিয়ে করতে চাইবে সেই সুন্দরী তাকে বিয়ে করতে নাও চাইতে পারে। তার এই বোধ জাগার পর সে বাড়ি ফিরে এল। তার মেয়ে খোঁজার শখ মিটে গেল। শেষে সে বাবা-মার পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করল।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪৬. সাক্ষী

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সেইসময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, সুবুদ্ধি অনেক সময় বিনা কারণে হঠাৎ ভ্রষ্ট হয়। ঠিক সেইরকম দুর্বুদ্ধিও বিনাকারণে পরিবর্তিত হয়ে সুবুদ্ধিতে পরিণত হতে পারে। আমার কথা পরিষ্কারভাবে বোঝানোর জন্য আমি প্রসূনের কাহিনি বলছি। এই কাহিনি শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বেতাল কাহিনি শুরু করল

কোশাম্বি নগরে ধনী পরিবারে প্রসূনের জন্ম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে ব্যবসায়ে মার খেল। চারদিকেই তার ধারদেনা হয়ে গেল। এমন অবস্থায় সে পড়ে গেল যে ছেলে-মেয়ে বউকে খাওয়াতেও পারছিল না। সেই নগরে দীপক নামে আর এক ব্যাবসাদার ছিল। প্রসূনের এই অবস্থা দেখে সে দুঃখ পেল। তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সে তাকে খাতা লেখার চাকরি দিল।

এইভাবে দিন চলছিল। কিছুদিন পরে দীপকের বাড়িতে চুরি হল। দীপক তার এক চাকরকে সন্দেহ করল। চাকরকে সে খুব মারল। সে ভেবেছিল বেশি মারলে চাকর নিশ্চয় মৃত্যুভয়ে সব স্বীকার করবে। কিন্তু চাকর দোষ স্বীকার করছিল না। শেষে মার খেতে খেতে সে মরে গেল। হঠাৎ চাকরটাকে এভাবে মরে যেতে দেখে সে তার মৃত্যুর জন্য তার অন্য এক চাকর মৈনাকের উপর দোষ চাপিয়ে দিল। এসব কিছুই ঘটল প্রসূনের চোখের সামনে।

যথারীতি রাজার লোক এসে দীপকের চাকরকে হত্যার অপরাধে তৎক্ষণাৎ ধরে নিয়ে গেল। মৈনাক শাস্তি পাওয়ার মুখে বলল, 'চাকরটি যে ঠিক কীভাবে মরেছে তা প্রসূন দেখেছে। আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষি। প্রসূন যদি বলে আমি দোষী, তাহলে আমি যেকোনো শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।'

খবরটা জানতে পেরে দীপক বুঝল, এখন সব কিছুই নির্ভর করছে প্রসূনের সাক্ষ্যদানের উপর। তাই সে প্রসূনকে বলল, 'তুমি কিন্তু মৈনাককেই দোষী বলে বিচারকের কাছে বলবে। মৈনাক শাস্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে প্রচুর টাকা দেব। তুমি ওই টাকা দিয়ে বিরাট ব্যাবসা শুরু করে দিতে পারবে।' প্রসূন মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল।

প্রসূন রাজি হলেও তার উপর দীপকের ঠিক বিশ্বাস হল না। সে তার অন্য এক চাকরকে প্রসূনের বাড়িতে পাঠাল তাকে পরীক্ষা করার জন্য। সেই চাকরটা প্রসূনের বাড়িতে গিয়ে তাকে বলল, 'আপনি কত বড়োলোকের ছেলে সামান্য ক-টা টাকার লোভে আপনি মৈনাকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন? আপনি এত বড়ো পাপ কাজ করবেন? রাজা তাকে ফাঁসি দিলে তার কাচ্চাবাচ্চা বউ পথে বসবে।'

'দেখ কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য অতশত আমার দেখার দরকার নেই। আমার মালিক যা করতে বলবে তা করাই আমার ধর্ম। তা ছাড়া দুটি কথা মালিকের ইচ্ছামতো বলতে পারলে আমার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে।' প্রসূন বলল।

চাকর ফিরে গেল। প্রসূনের সঙ্গে যে কথাগুলো হয়েছিল সেই কথা দীপককে জানাল। শুনে সে খুব খুশি হল।

পরের দিন রাত্রে দীপক গেল প্রসূনের বাড়ির দিকে। উদ্দেশ্য প্রসূনের মনের অবস্থা ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা। দরজার কাছে দাঁড়াইতেই তার মনে হল কোনো এক মহিলা কথা বলছে।

ভেতরে মৈনাকের বউ প্রসূনকে বলছিল, 'আমার স্বামীকে একমাত্র আপনি বাঁচাতে পারেন।'

'আমাকে ক্ষমা করতে হবে। আমি এখন দীপকের চাকর। মালিকের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই চাকরের কর্তব্য।' প্রসূন বলল।

মৈনাকের বউ ভীষণ রেগে গেল। প্রসূনকে গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল। পরক্ষণেই দীপক ঘরে ঢুকে প্রসূনকে সানন্দে জড়িয়ে ধরল। মনে মনে দীপক নিশ্চিত যে প্রসূন মৈনাকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

পরের দিন রাজার লোক প্রসূনকে নিয়ে গেল বিচারকের কাছে। মৈনাক আবার রাজার সামনে বলল, 'প্রভু চাকরের মৃত্যুর ব্যাপারে যা যা ঘটেছে তা প্রসূনের চোখের সামনেই ঘটেছে। প্রসূন যদি বলে যে চাকরটাকে আমিই হত্যা করেছি তাহলে আমি মাথা পেতে শাস্তি নেব।'

রাজার নির্দেশে প্রসূন সাক্ষী দিতে দাঁড়িয়ে বলল, মহামান্য রাজা, চাকরের মৃত্যুর জন্য দায়ী একমাত্র দীপক। এই মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে মৈনাকের কোনো সম্পর্ক নেই।'

অগত্যা দীপককে নিজের দোষ স্বীকার করতে হল। পরক্ষণেই তার মৃত্যুদণ্ড হল এবং মৈনাক মুক্তি পেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, প্রসূন গোড়ার দিকে মিথ্যা কথা বলব বলে কেন ঘোষণা করেছিল? আগে তার কথা শুনে মনে হচ্ছিল সে প্রভুভক্ত। এই ভক্তির পেছনে কি দীপকের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার লোভ ছিল? আবার বিনা কারণে হঠাৎ রাজার সামনে সত্য ঘটনা সে কেন বলল? দীপকই বা তৎক্ষণাৎ মেনে নিল কেন? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও, তাহলে তোমার মাথা চৌচির হয়ে যাবে।'

বিক্রমাদিত্য এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'প্রসূনের মনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সে সত্যবাদী বলেই দীপক বার বার তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করছিল। প্রসূন কী করবে তা আগে জানাতে চাইল না। কারণ জানিয়ে দিলেই দীপকের কানে চলে যেত। তখন দীপক নানাভাবে চেষ্টা করবে নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত করার। সে মনের কথা প্রকাশ করেনি। সে মৈনাকের স্ত্রীর কাছেও প্রকাশ করল না। তার আশঙ্কা ছিল মৈনাকের স্ত্রী কোনো কিছু গোপন রাখতে পারবে না। দীপকের তৎক্ষণাৎ অপরাধ মেনে নেওয়ার কারণ একটাই। সে সবচেয়ে বেশি যে চাকরের উপর নির্ভর করেছিল সেই যখন সত্য কথা প্রকাশ করে ফেলল তখন অন্যের উপর নির্ভর করা নিষ্প্রয়োজন ভাবল। তাই সে মেনে নিল।'

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল।

৪৭. পাত্র বাছাই

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে এসে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সেইসময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'মহারাজ, তুমি হয়তো কোনো আশা পূরণ করার জন্য এত পরিশ্রম করছ কিন্তু মনে রেখো অনেক সময় আশা পূরণ হওয়ার পরিবর্তে অনেক বিপদ-আপদ দেখা দেয়। আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে সুবর্ণকুমারীর বিবাহের ঘটনা বলব। এই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথ চলার পরিশ্রমও কমে যাবে।' তারপর বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে চন্দ্রগিরির রাজা ছিল রবিবর্মা। সন্তান বলতে তার ছিল মাত্র একটি কন্যা। তার নাম সুবর্ণকুমার। রবিবর্মা মেয়েটিকে ঠিক মেয়ের মতো ঘরকুনো করে না রেখে ছেলের মতো বেড়ে উঠতে সাহায্য করল। দেখতে দেখতে সুবর্ণকুমার নানা ধরনের অস্ত্র চালনায় পোক্ত হয়ে গেল। সহজে কেউ তাকে হারিয়ে দিতে পারত না। গোটা চন্দ্রগিরি দেশে এমন কেউ ছিল না যে তাকে অস্ত্রচালনায় পরাজিত করতে পারে। অতি অল্পবয়স থেকেই সুবর্ণকুমারী বাপের সঙ্গে যুদ্ধে যেত। ফলে তার সাহস ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে এমন হল যে সে যুদ্ধ করতে এসেছে শুনে শত্রুপক্ষের বড়ো বড়ো যোদ্ধারাও ভয়ে কাঁপত। শুধু যোদ্ধা হিসেবেই নয়, সুন্দরী হিসেবেও সুবর্ণকুমারীর নাম হয়েছিল।

সুবর্ণকুমারী বড়ো হল। তার বিয়ের বয়স হল। রাজা রবিবর্মা বুঝলেন রাজকুমারীর সঙ্গে দুর্বল কোনো কুমারের বিয়ে হলে ভালো হবে না। অস্ত্রচালনায় যে সুবর্ণকুমারীকে পরাজিত করতে পারবে তার সঙ্গেই বিয়ে হওয়া উচিত। এই কথা তিনি ঘোষণাও করে দিলেন।

এই ধরনের একটা কিছু যে ঘটবে তা বহু রাজকুমার আগে থেকেই ভেবে নিয়েছিল। কিছু কিছু রাজকুমার আগে থেকেই সুবর্ণকুমারীকে বিয়ে করার জন্য মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। শুধু রূপবতী সুবর্ণকুমারীকে পাওয়াই নয়, ভবিষ্যতে সুবর্ণকুমারীর স্বামীই হবে চন্দ্রগিরির রাজা।

রাজা ঘোষণা করে দিলেন, অমুক দিনে প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগী এল না তবে অসংখ্য দর্শক এল।

এদিকে রাজকুমারী প্রস্তুত ছিল। প্রত্যেকের মুখে এক প্রশ্ন, 'কী হল? এত বড়ো প্রতিযোগিতায় কেউ এল না।'

অনেকক্ষণ পরে দর্শকদের ভেতর থেকে একজন শিকারি এগিয়ে এসে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আমি রাজকুমারীর সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে রাজি আছি।'

শিকারির ছদ্মবেশে যে এসেছিল সে ছিল এক রাজকুমার। নাম সুধীর। প্রসন্নদেশের যুবরাজ সে।

সুবর্ণকুমারী সদম্ভে তাকে বলল, 'আমি যখন যে ধরনের অস্ত্র চালনা করব তখন আপনাকেও সে ধরনের অস্ত্র চালনা করতে হবে।' বলে রাজকুমারী আকাশের দিকে দুটো তির নিক্ষেপ করল। কিছুক্ষণ পরে একটি তিরকে আর একটি তির বিদ্ধ করে দুটোই একসঙ্গে মাটিতে পড়ল। দর্শক অবাক।

তারপর সুবর্ণকুমারী নিজের তির-ধনুক সুধীরের হাতে দিল। সে একটার পর একটা তিনটে তির আকাশের দিকে ছুড়ল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একটার গায়ে আর একটা বিদ্ধ হয়ে তিনটে তির একসঙ্গে মাটিতে পড়ল। দর্শকরা আরও অবাক হয়ে গেল।

তারপর শুরু হল তরবারির যুদ্ধ। সুবর্ণকুমারীর দুই হাতে দুটো তরবারি। সুধীরেরও দু-হাতে দুটি তরবারি। দু-জনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সুধীর সুবর্ণকুমারীর দু-হাতের দুটো তরবারিই উড়িয়ে দিল। তারপর নিজের তরবারি মাটিতে পুতে দাঁড়িয়ে রইল।

জয় যে সুধীরের হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রইল না। রাজা খুব খুশি হয়ে ঘোষণা করার মতো সুধীরকে বলল, 'আমার ঘোষণা অনুযায়ী তোমার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে হবে। আমার মৃত্যুর পর তুমিই হবে এ দেশের রাজা।'

সুধীর জবাবে রাজা রবিবর্মাকে বলল, 'আমি বিয়ে করার উদ্দেশ্যে আসিনি। আপনার মেয়েকে পরাজিত করতে এসেছি। পরাজিত রাজকুমারীকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।' বলে সে হাতির পিঠে চেপে চলে গেল। রাজা রবিবর্মা হতাশ হল।

কিছুদিন পরে প্রসন্নদেশের রাজকুমার সুধীর সুবর্ণকুমারীকে বিয়ে করার প্রস্তাব রবিবর্মার কাছে পাঠাল।
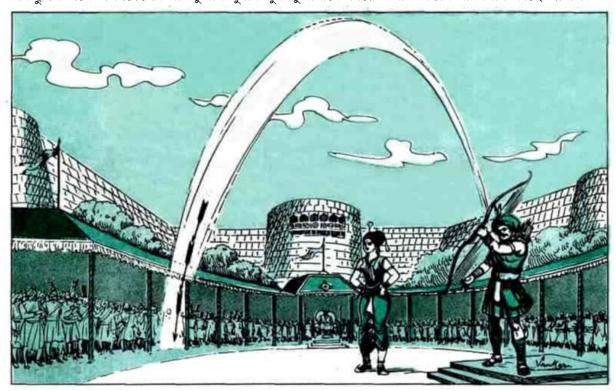
বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'রাজা কাহিনি শোনালাম, এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। সুধীর রাজকুমার হিসেবে না এসে শিকারির ছদ্মবেশে এল কেন? ওর মনে কি পরাজিত হওয়ার ভয় ছিল? নাকি জয়ী হলে রাজকুমারী এক শিকারিকে বিয়ে করতে রাজি হবে কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখা উদ্দেশ্য ছিল? রাজকুমারীর রূপ কি সুধীরের পছন্দ হয়নি? তাই যদি হয় কিছুদিন পরে সুধীর সুবর্ণকুমারীকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠাল কেন? অন্য রাজকুমাররা সুবর্ণকুমারীকে বিয়ে করতে রাজি হল না কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও, তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'এসব কিছুর জন্য দায়ী রবিবর্মার ঘোষণা। এই পদ্ধতিতে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে ভুল, বিবেকহীনের কাজ তা সুধীর শিকারির ছদ্মবেশে এসে প্রমাণ করে দিল। রাজকুমাররা আসেনি বলেই সুধীর ছদ্মবেশে এল। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যখন মেয়ের বিয়ে হল না, তখন রাজা বিভিন্ন রাজকুমারদের ডেকে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু রাজকুমাররা এল না। কারণ তাদের ধারণা ধর্মত রাজকুমারী শিকারির স্ত্রী হয়ে গেছে। যে মুহূর্তে রাজা রাজকুমারদের ডেকে পাঠালেন সেই মুহূর্তে সেও সুবর্ণকুমারীকে বিয়ে করবে ঠিক করে নিল।'

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্যের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে গেল সেই গাছে।

৪৮. সাধুর দণ্ড

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে আগের মতো এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, ভুলেও তুমি দুষ্টকে সাহায্য করো না। চোরকে সাহায্য করতে গিয়ে সাধু নিজের প্রাণ হারিয়েছিল। আমি তার কাহিনি বলছি। শুনলে পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে কোনো এক রাজার দেশে হঠাৎ এক সাধু এসেছিল। দেশের এক প্রান্তে ছিল এক মন্দির। সাধু সেই মন্দিরে থাকতে লাগল। প্রজারা সাধুর কাছে যেত। সুখ-দুঃখের কথা বলত। সাধু তাদের নানা ধরনের উপদেশ দিত, সমস্যার সমাধান করত। তার কথামতো চলে অনেকে সুফল পেয়েছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিন এক চোর অন্ধকারে এসে সাধুকে বলল, 'প্রভু, আজ রাত্রে আমি একটা কাজ করব ভেবেছি। ঠিক কোন মুহূর্তে বেরুলে সেই কাজে সফল হব তা দয়া করে জানান। সফল হলে আমি তার অর্ধেক আপনাকে দেব।' বলে চোর সাধুকে প্রণাম করল।

সাধু কিছুক্ষণ ভেবে শুভমুহূর্ত জানিয়ে দিল। চোর ঠিক সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এক ধনীর বাড়িতে চুরি করতে গেল এবং কোনোরকম বাধা না পেয়ে চুরি করে ফিরে এল।

পরের দিন সকালে চোর সাধুর কাছে গিয়ে বলল, 'প্রভু, আপনি যে মুহূর্তে বেরোতে বলেছিলেন সেই মুহূর্তে বেরিয়ে সফল হয়েছি। আপনাকে যে ভাগ দেব বলেছিলাম এই নিন সেই ভাগ।' বলে চোর সাধুকে কিছু অর্থ দিয়ে দিল। সাধু সেই অর্থ গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দিল।

কিছুদিন পরে চোর আবার এল ওই সাধুর কাছে। আগের মতোই শুভমুহূর্ত জানতে চাইল। সাধু তাকে শুভমুহূর্ত বলল। রাত্রে সে সোজা চলে গেল রাজার কোষাগার থেকে চুরি করতে। যত মোহর বইতে পারল তত মোহর মাথায় করে বাড়ি ফিরল। যথারীতি অর্ধেক মোহর সাধুকে এনে দিল।
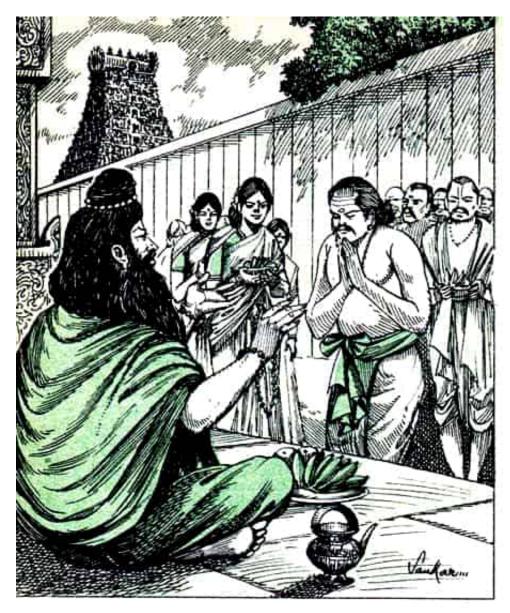
সাধু চোরের কাছ থেকে মোহরগুলো নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। রাজার কোষাগারে চুরি হয়েছে — এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজার লোক চোর ধরার জন্য কড়া নজর রেখেছিল। ওরা গরিবদের হাতে রাজার মোহর দেখে ধরল। কোথায় পেল, কার কাছ থেকে পেল ইত্যাদি প্রশ্ন করে ওদের কাছ থেকে জানতে পারল যে সাধু দিয়েছে।

রাজার লোক এই খবর রাজাকে বলল। রাজা সাধুকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, 'তুমি ভিখিরিদের মধ্যে মোহর বণ্টন করেছ?'
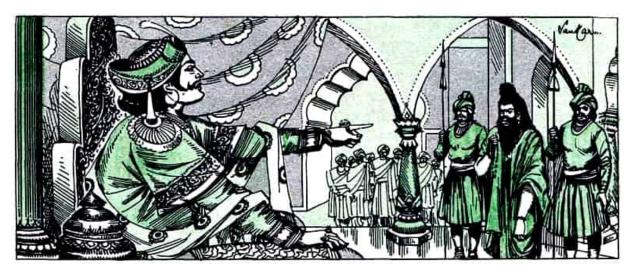
'করেছি।' সাধু বলল।

'কোথায় পেলে?' রাজা বলল।

সাধু নীরব রইল। রাজা রেগে গিয়ে বলল, 'সাধুর বেশ ধরে চুরি করছ?'

এই কথার জবাবেও সাধু নীরব রইল। রাজা আরও রেগে গিয়ে বলল, 'এই কে আছিস, এক্ষুনি এর গর্দান দিয়ে নে।'

রাজার লোক সাধুকে বধ করল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, একটা সাধুকে এভাবে মেরে ফেলা কি ওই রাজার উচিত হয়েছিল? রাজা যে প্রশ্ন করেছিল তার জবাব না দিয়ে সাধু নীরব রইল কেন? সাধু কি জানতে পেরেছিল যে সে চুরির ভাগ নিয়েছিল? নাকি চোরকে বাঁচানোর জন্য সে নীরব রইল? অত বড়ো সাধু যখন, তখন সে নিশ্চয় জানতে পেরেছিল যে তার মৃত্যু আসন্ন। আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য জবাবে বললেন, 'রাজার বিচার আর সাধুর বিচার এক হয় না। তাদের বিচারের ধারা আলাদা। মানুষকে সাহায্য করাই সাধুর ধর্ম। মানুষের সমস্যাগুলো ধর্মের পথে চলার ফলে হয়েছে না অধর্মের পথে চলার ফলে হয়েছে তাও বিচার সে করে না। সমাধান করাকেই সে নিজের কাজ মনে করে। তাই সে সহজেই গরিব ও ভিখিরিদের মধ্যে মোহরগুলো বণ্টন করতে পেরেছে। চোরকে ধরিয়ে দেওয়া সে নিজের কাজ মনে করে না। পৃথিবীর কোনো কিছুর প্রতি সাধুর আসক্তি নেই। তাই সাধুর মৃত্যুভয়ও নেই। আবার রাজার বিচারে চুরি করা অপরাধ। রাজার কোষাগারের মোহর বণ্টন করা আরও বড়ো অপরাধ।'

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে গেল সেই গাছে।

৪৯. মণির ফল

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যখন সফল হবে তখন হয়তো দেখা যাবে তোমার সেই সাফল্যের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে একটি কাহিনি শোনাব। বিজয়বর্মা নামে এক রাজার কাহিনি। শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে কলিঙ্গ দেশের রাজা ছিল বিজয়বর্মা। অল্পবয়সে সে সিংহাসনে বসার কিছুকাল পরে সুনন্দিনী নামে এক রাজকুমারীকে বিয়ে করল।

বিয়ের কিছুদিন পরে সুনন্দিনীর অসুখ করে। অসুখটা যে মানসিক রোগ নয় সে ব্যাপারেও বৈদ্যরা নিশ্চিত ছিল। অবশেষে রাজবৈদ্য জানাল যে একমাত্র নাগমণি ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ দিয়ে তার অসুখ সারানো যাবে না। মানুষের চোখে না পড়া একটি নাগ বিন্ধ্যারণ্যে আছে। তার মাথার মণি জোগাড় করতে পারলে সুনন্দিনীর অসুখ সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবে।

বিজয়বর্মা এই কথা শোনার পর শাসনভার মন্ত্রীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে খোঁজ করতে লাগল। কিছুদিন খোঁজ করার পর একদিন গভীর রাত্রে দেখতে পেল সেই নাগ। নাগের মাথায় মণি জ্বলজ্বল করছিল।

সেই সাপকে না মেরে ফেললে তো মণি পাওয়া যাবে না। তাই ওই সাপকে মারার উদ্দেশ্যে বিজয়বর্মা কাছের একটি গাছে উঠল। গাছের ডালে বসে ধনুকে তির চড়িয়ে সাপটিকে মারার উদ্যোগ নিল। কিন্তু তিরটি ছোঁড়ার মুখে তার মনে প্রশ্ন জাগল, এই তিরে যদি সাপটা বিদ্ধ না হয় তাহলে তো সে অরণ্যে লুকিয়ে পড়বে। অথবা ধারেকাছে আড়ালে অপেক্ষা করে তার গাছ থেকে নাবার সঙ্গেসঙ্গে তাকে ছোবল মারবে। সাপ যদি ফণা মেলে তাহলেই তির ছুড়ে তাকে গলাবিদ্ধ করা যাবে। কিন্তু ওই বিকট সাপ রেগে না গেলে তো ফণা মেলবে না।

এই কথা ভেবে বিজয়বর্মা সাপের অতি কাছের একটি ডালে তির মারল। সঙ্গেসঙ্গে সাপ ফণা মেলে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ বিজয়বর্মা ওই মেলা ফণাতে তির মারল।

সেই তিরে বিদ্ধ হয়ে ওই সাপ মারা গেল। বিজয়বর্মা গাছ থেকে নেমে সাপের মাথা থেকে মণি তুলে নিল। সেই সাপের মণি নিয়ে অরণ্যপথে যাওয়ার সময় ভোর বেলায় মানুষের কোলাহল শুনতে পেল। বিজয়বর্মা ভাবল, এই অরণ্যে মানুষ আসবে কোথা থেকে? যারা আসছে তারা চোর অথবা ডাকাত।

কিছুক্ষণ পরে ওই বনের অধিবাসীরা এসে বিজয়বর্মাকে ঘিরে ফেলল। ওদের কথাবার্তা শুনে বিজয়বর্মা বুঝল ওরা তাকে ওদের দেবীর সামনে বলি দেবে। ওদের হাত থেকে কীভাবে নিজেকে মুক্ত করা যায় তা সে ভাবতে লাগল।

ওই বনের অধিবাসীরা শিকারি ছিল। ওদের নেতার একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি সুন্দরী। বিজয়বর্মাকে দেখেই মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে যায়। সে তার বাবাকে বলে, 'বাবা, ওকে আমি বিয়ে করব। আর বিয়ে যদি না দাও, ওকে যদি বলি দিতে চাও তাহলে আমাকেও বলি দাও।'

'সে কী মা? বাইরের লোককে, বিশেষ করে নগরবাসীকে, আমরা হাতের মুঠোয় পেলেই তো বলি দিয়ে থাকি। তবে একটা উপায় আছে, আমি ওই যুবকের সঙ্গে লড়াই করব। ও যদি জিতে যায় ওকে বীর হিসাবে ছেড়ে দিতে পারি। তারপর যদি সম্ভব হয় তুমি ওকে বিয়ে করবে।' বলল শিকারিদের নায়ক তার মেয়ে চিত্রলেখাকে।

তারপর শুরু হল বিজয়বর্মা ও চিত্রলেখার বাবার মধ্যে লড়াই। অনেকক্ষণ ধরে ওদের লড়াই চলল। শেষপর্যন্ত বিজয়বর্মা জিতে গেল।

তারপর বিজয়বর্মার সামনে হাজির হল চিত্রলেখা। চিত্রলেখাকে দেখে বিজয়বর্মা চোখ ফেরাতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই নিজের পরিচয় দিল এবং তার সঙ্গে চিত্রলেখাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তার বাবার কাছে অনুরোধ করল। প্রসঙ্গত তাকে কেন ওই অরণ্যে আসতে হয়েছিল এবং তাকে যে নাগমণি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে তাও জানাল।

সব কথা শুনে চিত্রলেখার বাবা বলল, 'আমরা বহুকাল ধরে ওই নাগমণি খুঁজছি, ওই নাগমণি আমাকে দিয়ে তুমি চিত্রলেখাকে নিয়ে যেতে পার।'

বাপের কথায় সায় দিয়ে চিত্রলেখাও বলল, 'সত্যি আমার বাবা অনেককাল থেকে ওই নাগমণি খুঁজছেন। তাঁকে ওটা দিয়ে দিলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।' কিছুক্ষণ ভেবে বিজয়বর্মা বলল, 'চিত্রলেখা আমি তো নাগমণি দিতে পারব না। তুমি যদি নাগমণির পরিবর্তে আমাকে বিয়ে করতে চাও তাহলে সে বিয়েতে আমি রাজি নই। চললাম।' বলে বিজয়বর্মা সেই মুহূর্তে এগিয়ে যেতে লাগল।

তৎক্ষণাৎ চিত্রলেখার বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, 'দাঁড়াও নাগমণি আমার দরকার নেই। নাগমণি আমাকে দিলে তুমি চিত্রলেখাকে পেতে না। তুমি একে নিয়ে যাও।'

বিজয়বর্মা নাগমণি ও চিত্রলেখাকে নিয়ে নিজের দেশের দিকে পাড়ি দিল। তারপর নাগমণি প্রয়োগ করার ফলে সুনন্দিনীর অসুখ সেরে গেল। দুই স্ত্রীকে নিয়ে বিজয়বর্মা দিন কাটাতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'বিজয়বর্মা ওই মণি দিতে চাইল না কেন? চিত্রলেখার চেয়ে সুনন্দিনীকে কি বিজয়বর্মা বেশি ভালোবেসেছিল। মণি না পেলে মেয়েকে ছাড়ব না বলেছিল চিত্রলেখার বাবা। পরে মণি না পেয়েও ছাড়ল কেন? মণি দিলে চিত্রলেখাকে পেত না কেন? আমার এই প্রশ্নগুলোর সমাধান জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বিজয়বর্মা মণি পাওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে। চিত্রলেখার পরিবর্তে সে ওই মণি হারাতে চায়নি। মণি খোঁজার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। রাজা বিজয়বর্মা কখনোই সেই উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যাননি। চিত্রলেখাকে তার ভালো লেগেছিল। কিন্তু সুনন্দিনীকে সারিয়ে তোলার কথা সে ভুলে যায়নি। এটাই হয়তো চিত্রলেখার বাবা পরীক্ষা করেছিল। আজ দ্বিতীয় স্ত্রীকে পেয়ে যদি প্রথম বউকে অবহেলা করে, কাল তৃতীয়কে পেয়ে দ্বিতীয়কে অবহেলা করতে পারে। সেইজন্যই বিজয়বর্মা মণি দিলে সে মেয়েকে তার সঙ্গে পাঠাত না।'

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছের কাছে।

৫০. প্রতিশোধ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি এই শব বহনের কাজ কোনো চাকরকে দিয়ে না করিয়ে নিজেই যে করছ তারজন্য আমি তোমাকে প্রশংসা করি। কারণ যত বিশ্বাসী চাকরই হোক না কেন, অনেক সময় চাকরও রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রমাণ স্বরূপ বিষ্ণুগুপ্তের কাহিনি বলব।' বেতাল কাহিনি শুরু করল

প্রাচীন কালে পঞ্চাল দেশে গুণসিংহ নামে রাজা ছিল। সে নিষ্ঠুর শাসক ছিল।

গুণসিংহ মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াত। শুনতে পেল ধনগুপ্ত ঘুষ খায়।

পরিকল্পনা অনুসারে গুণসিংহ এবং তার মন্ত্রী ছদ্মবেশে ধনগুপ্তের কাছে গেল। ওদের দু-জনের মধ্যে বিরাট বিরোধ আছে বলে জানাল। ঘটনা শুনে মনে হল বিচারের রায় মন্ত্রীর দিকেই যাবে। অর্থাৎ মন্ত্রী নিরপরাধ, দোষী রাজা। ধনগুপ্ত সব কথা শুনে পরের দিন বিচারের রায় জানাবে বলে দিল। সেদিন রাত্রে রাজা গোপনে ধনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করল। রাজা তাকে বলল, 'আমাকে নির্দোষি হিসেবে রায় দেবেন। আপনাকে এক-শোটি মোহর উপহার দেব।' বলে রাজা চলে গেল।

পরের দিন যথারীতি রাজা ও মন্ত্রী ছদ্মবেশে গেল। ধনগুপ্ত মন্ত্রীকে অপরাধী বলে ঘোষণা করল।

এই রায় ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও মন্ত্রী নিজেদের ছদ্মবেশ খুলে ফেলল। রাজার নির্দেশে তার লোক ধনগুপ্তকে বন্দি করে নিয়ে গেল। বিচারে ধনগুপ্তের ফাঁসি হল।

প্রজাদের মতে ধনগুপ্তকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ওরা রাজাকে দোষ দিল। তাদের মতে ছোট্ট অপরাধের জন্য ধনগুপ্তকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

ধনগুপ্তের ছেলের নাম বিষ্ণুগুপ্ত। বিষ্ণুগুপ্ত অনেক লেখাপড়া করেছিল। সেও রাজার এই কাজে তীব্র সমালোচনা করল। তার কথা ছিল, 'যে রাজা সত্যিকারের শাসন করতে পারেন তিনি যদি কঠোরতম শাস্তিও দেন মাথা পেতে নেওয়া যায় কিন্তু দুর্বল শাসক এই ধরনের শাস্তি দিলে মানা যায় না।'

কিছুদিন পরে দেখা গেল বিষ্ণুগুপ্ত রাজার কাছাকাছি পৌঁছাল। গুণসিংহ তার কাজ দেখে মুগ্ধ হত। বিষ্ণুগুপ্ত যেটাকে গোপন রাখতে বলত সেটা সে গোপন রাখত।

আরও কিছুদিন পরে পঞ্চালদেশ আক্রমণ করল অন্য দেশের রাজা। বোঝা গেল পঞ্চালদের পরাজয় ঘটবে।

সেইসময় গুণসিংহ, আর কোনো উপায় না পেয়ে শত্রুকে কৌশলে পরাজিত করার চেষ্টা করল। রাজা বিষ্ণুগুপ্তকে গোপনে বলল, 'শোনো বিষ্ণুগুপ্ত, অঘটন কিছু না ঘটলে পরাজয় এড়ানো যাবে না। তোমার হাতে এক লক্ষ মোহর দিচ্ছি। এই মোহর নিয়ে তুমি গোপনে, রাজার অঙ্গরক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। একমাত্র সেই-ই পারবে রাজাকে মেরে ফেলতে। মেরে ফেললেই তার হাতে এই মোহর দেবে।'

সেই রাত্রে এক লক্ষ মোহর নিয়ে বিষ্ণুগুপ্ত সোজা বাড়ি চলে গেল। এক লক্ষ মোহর বাড়িতে রেখে সে শত্রু শিবিরে গেল। শত্রুপক্ষের রাজার সঙ্গে গোপনে দেখা করল। তাকে হত্যার চক্রান্ত যে চলছে তা জানিয়ে দিল। শত্রু খুব সহজেই গুণসিংহকে পরাজিত করল।

যুদ্ধের চরম মুহূর্তে গুণসিংহ হঠাৎ যেন ভূত দেখল। বিষ্ণুগুপ্ত তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। হত্যা করার পূর্বমুহূর্তে বিষ্ণুগুপ্ত বলল, 'গুণসিংহ, আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছি।'

গুণসিংহের মারা যাওয়ার পর শত্রু-রাজা বিষ্ণুগুপ্তকেই পঞ্চালদেশের রাজা করে দিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা বিষ্ণুগুপ্ত কি প্রথম থেকেই রাজদ্রোহী ছিল, না পরে হল? হত্যা করার আগে সে কি হঠাৎ প্রতিশোধের কথা ভেবেছিল, নাকি গোটা ব্যাপারটাই পরিকল্পিত? হত্যার করার উদ্দেশ্যই যখন ছিল তখন আগে করল না কেন? আগে তো সে রাজার কাছেই থাকত। কেন যে রাজাকে হত্যা করার জন্য বিষ্ণুগুপ্ত এতদিন অপেক্ষা করল আমি তা বুঝতে পারলাম না। রাজা, আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বিষ্ণুগুপ্ত গোড়ায় রাজভক্ত ছিল। তার বাবাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে অন্য যেকোনো শাস্তি দিলে হয়তো সে রাজার বিরুদ্ধে কোনো মনোভাব পোষণ করত না। তারও মতে ঘুষখোরকে শাস্তি দেওয়া উচিত। তবে তার আর একটি মতও ছিল। সে মত হল, যে ঘুষ দেয় সেও অপরাধী। তাই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে গুণসিংহ যখন ঘুষ দিয়ে শত্রুরাজাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল তখন সে মনে মনে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াল। এবং সময় ও সুযোগ পেয়েই সে তাকে হত্যা করল।'

রাজা মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গেল গাছে।

৫১. অবিশ্বাস

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'মহারাজ, তোমার দেখছি ভগবানের উপর ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। তুমি অতিসারণের মতো নাস্তিক নও। যারা নাস্তিক তারা অনেক কিছু হাতের কাছে পেয়েও হারায়। অতিসারণের কাহিনি শুনতে তোমার ভালো লাগবে। পথ চলার পরিশ্রমও কমবে। তার কাহিনি বলছি শোনো।' বেতাল কাহিনি শুরু করল

পাটলিপুত্রে নামকরা ব্যাবসাদারদের মধ্যে অতিসারণ ছিল একজন। তার বাবা-মা ভাই-বোন কেউ ছিল না। নিজে সে অবিবাহিত ছিল। সে ভাগ্য বিশ্বাস করত। কিন্তু ঠাকুরদেবতার উপর তার বিশ্বাস ছিল না। তার ধারণা ছিল ভাগ্যে যা লেখা থাকে তাই হয়। দেবতা কিছুই করতে পারে না। তাই সে কোনোদিন মন্দিরে যেত না। বিপদে-আপদে পড়ে ঠাকুরদেবতার নামে মানত রাখত না। মোটামুটি সৎ, জীবনযাপন করার চেষ্টা করত।

একবার সমস্ত টাকাপয়সা ঢেলে সে জাহাজে করে ফিরছিল। তার জাহাজ যখন মাঝসমুদ্রে তখন ঝড় তুফান ওঠে। প্রত্যেকে জোরে জোরে ঠাকুরদেবতার নাম করছিল। প্রার্থনা করছিল। মানত করছিল। কিন্তু অতিসারণ কিছুই করেনি। তা লক্ষ করে অন্যেরা বলাবলি করল, 'এই নাস্তিকের জন্যই আমাদের প্রার্থনা ভগবানের কানে যাচ্ছে না। একে জাহাজ থেকে বের করে দিলে আমরা বাঁচতে পারব। তারপর ওরা সবাই অতিসারণকে ধরে একটা বড়ো কাঠের সঙ্গে বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিল। ওকে ফেলে দেওয়ার পরে জাহাজ ডুবে গেল; জাহাজের সমস্ত যাত্রী মারা গেল।

অতিসারণ ভাসতে ভাসতে সমুদ্রতীরে উঠল। সেটা একটা দ্বীপ। দ্বীপের নাম মণিদ্বীপ। দ্বীপের অধিবাসীরা ওকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে গেল তাদের রাজার কাছে। সেই রাজার নাম রত্নকেতু।

অতিসারণের কাছে রত্নকেতু যা হয়েছে শুনল। শুনে তাকে পাটলিপুত্রে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে চাইল।

'না মহারাজ, পাটলিপুত্রে আমি আর যেতে চাই না। সেখানে আমার কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। আমি এখানেই থেকে যাহোক কিছু করে কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে চাই।' অতিসারণ বলল।

রাজা অতিসারণকে নিজের কাছেই রাখলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাঝে মধ্যে অতিসারণের সঙ্গে তার কথাবার্তা চলত। ঠাকুরদেবতার উপর রাজার গভীর ভক্তি ছিল। ভগবানের উপর অতিসারণের বিশ্বাস নেই দেখে রাজা অবাক হয়েছিল।

একদিন রাজা অতিসারণকে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর যিনি স্রষ্টা, যাঁর ইচ্ছায় সব কিছু চলছে তাঁর প্রতি তোমার বিশ্বাস এবং ভক্তি নেই?'

জবাবে অতিসারণ বলল, 'রাজা, আমার কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি পাপ করি না, অন্যের অপকার করি না। উপকার করার চেষ্টা করি। আমি কাউকে ভয় করি না। তাই আমার মতো লোকের ভগবানের প্রতি ভক্তি আসবে কোথা থেকে? কোনো কিছুকে ভয় করলে তো ভক্তিভরে ভগবানের কাছে কিছু চাইতে হয়। আমার ভয় নেই। ভগবানকে আমার কীসের জন্য দরকার?'

রাজা কোনো জবাব দিতে পারল না। একদিন রাজা রত্নকেতু রাজসভায় যাচ্ছেন হঠাৎ অতিসারণ রাজাকে পেছন দিক দিয়ে ডেকে বলল, 'মহারাজ একটু দাঁড়ান।'
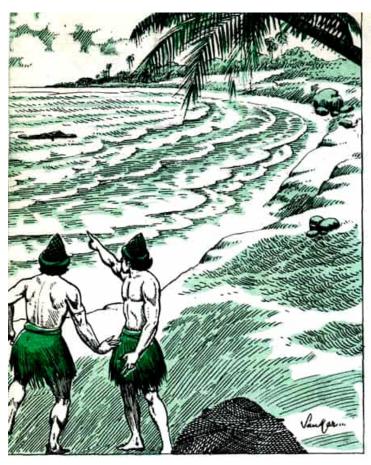
রাজা দাঁড়াল। আর ঠিক সেইসময় রাজসভায় ঢোকার মুখের দরজা ভেঙে পড়ল। ওই ভারী দরজা রাজার উপর পড়ে গেলে রাজা মরে যেত। এই বিরাট বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে রাজা সেদিন প্রত্যেকটি মন্দিরে ঘুরে পুজো দিয়ে এল। আর একদিনের ঘটনা বলছি।

অন্যদিনের মতো সেদিনও রাজা প্রাসাদের কাছের মন্দিরে ঢুকল। অতিসারণ রাজার সঙ্গে ছিল। আর ছিল রাজার অঙ্গরক্ষক। অতিসারণ রাজার সঙ্গে মন্দির পর্যন্ত গেল কিন্তু মন্দিরে ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

রাজা যখন একমনে পুজো করছিল তখন অঙ্গরক্ষক কোনো অজানা কারণে রাজার গলা কাটতে গেল। তা চোখে পড়তেই অতিসারণ ঝট করে একটা ছোরা ওই অঙ্গরক্ষকের দিকে ছুঁড়ল। অঙ্গরক্ষক আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রাজা এসব দেখে অবাক হয়ে গেল। যা ঘটেছে অতিসারণ তা রাজাকে বুঝিয়ে বলল।

রাজা অতিসারণের কথা শুনে আর একবার সাষ্টাঙ্গে দেবতাকে প্রণাম করে তাকে বলল, 'দেখ অতিসারণ, চোখের সামনে দেখলে! এটা দেখেও কি তোমার মনে হয় না যে স্বয়ং দেবতা আমাকে কীভাবে বাঁচিয়েছেন। তাই বলছি এবার থেকে তুমিও ঠাকুরদেবতার প্রতি বিশ্বাস পোষণ কর।'

রাজার কথায় অতিসারণ কোনো কথা বলল না। সেদিন চুপচাপ ছিল। পরের দিন পাটলিপুত্রে যাওয়ার ব্যবস্থা করে চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, অতিসারণের ঠাকুরদেবতার উপর বিশ্বাস ছিল না কেন? রাজা রত্নকেতু অত করে বললেও কেন সে দেবতার ভক্ত হল না? রাজা তাকে কত ভালো রেখেছিল। তবু সে কেন পাটলিপুত্রে ফিরে গেল। আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি সমাধান না দাও তবে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'অতিসারণ নাস্তিক ছিল না। ঠাকুরদেবতার প্রতি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস তার ছিল। তবে ভগবানের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ছিল না। যাদের মনে ঠাকুরদেবতার প্রতি অন্ধবিশ্বাস থাকে তারা কোনো বিপদের ফাঁড়া কেটে গেলে অথবা উপকৃত হলে ঘটা করে পুজো দেয়। কিন্তু যে মানুষের জন্য তাদের বিপদ কেটে যায় অথবা উপকৃত হয় তাকে কৃতজ্ঞতা জানায় না। দু-দু-বার অতিসারণ বিপদের হাত থেকে রাজাকে বাঁচাল। কিন্তু রাজা তাকে একবারও ধন্যবাদ জানাল না। ওই ধরনের অকৃতজ্ঞ রাজার কাছে অতিসারণ আর থাকতে চাইল না। সে পাটলিপুত্রে ফিরে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫২. বন্দি মুক্তি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সেইসময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি রাজা হয়েও ঠিক অন্য রাজাদের মতো হয়ে ওঠোনি। কোনো রাজা তোমার মতো কোনো কিছুকে এতটা আঁকড়ে থাকে না। রাজারা এক-এক সময় এক-একরকম চিন্তা করে। এক-এক সময় এক-একটাকে ধরে আবার অন্য সময়ে ঝট করে তা ছেড়ে দেয়। ওদের কোনো কিছু ধরা বা ছাড়ার পেছনে তেমন কোনো যুক্তিও থাকে না। আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি তোমাকে মহেন্দ্রপুরের রাজার কাহিনি বলছি। শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল

মহেন্দ্রপুরের রাজা ধীরেন্দ্রসিংহ মরার আগে একমাত্র ছেলে মহেন্দ্রকে কাছে ডেকে বলল, 'বাবা, তোমার বোন স্বয়ংপ্রভার বিয়ে দেওয়ার ভার তোমার উপর রইল। বিয়ের পর জামাইকে তুমি অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেবে।' মহেন্দ্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর বীরেন্দ্রসিংহ মারা গেল। সিংহাসনে বসল মহেন্দ্র।

একবার মহেন্দ্র শিকার করতে গেল। নদীর তীরে এক ভিল যুবক ভিল রমণীকে ডাকছিল। সে গাছ থেকে ফুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'যাচ্ছি।'

ভিল যুবক পথের উপর দাঁড়িয়ে রমণীকে ডাকছিল। রাজা মহেন্দ্র পেছন দিক দিয়ে এসে ওই যুবকের গায়ে তরবারি ঠেকিয়ে রাস্তা থেকে সরতে বলল।

ভিল যুবক পেছন ফিরে রেগে গিয়ে রাজার হাত থেকে তরবারি কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর, 'তোমার সাহস তো কম নয়? আমার গায়ে তরবারি ঠেকাচ্ছ। দাঁড়াও এখনই তোমায় শেষ করে ফেলছি।' বলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু-জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হল। একসময় রাজা মহেন্দ্রকে নীচে ফেলে সে তাকে মেরে ফেলতে যেতেই ভিল রমণী সেখানে ছুটে এসে চিৎকার করে উঠল, 'মেরো না, মেরো না! একে রাজার মতো দেখাচ্ছে।'

তখন ভিল যুবক রাজাকে ছেড়ে দিয়ে সদম্ভে দাঁড়িয়ে তাকে বলল, 'এখন বুঝতে পারছ কার গায়ে তরবারি ঠেকিয়েছিলে?'

ঠিক সেইসময় রাজার লোকজন সেখানে পৌঁছে গেল। অপমানের জ্বালা সহ্য করে রাজা মহেন্দ্র ফিরে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজার সেনাবাহিনী ওই অরণ্যে ঢুকে খুঁজে খুঁজে সেই যুবককে ধরে নিয়ে গেল। রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে ওই ভিল যুবককে কারাগারে পুরে দেওয়া হল।

রাজা মহেন্দ্র ঠিক করল ওই ভিল যুবককে রাজদ্রোহী হিসাবে ঘোষণা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। কিন্তু মন্ত্রীরা তা না করার পরামর্শ দিল। তাদের মতে, হঠাৎ এক ভিল যুবককে অরণ্য থেকে তুলে এনে মৃত্যুদণ্ড দিলে লোকের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জাগবে। আবার তাকে প্রকাশ্যে বিচার করলে তারও কিছু বলার অধিকার থাকবে। তখন সে যদি যা যা ঘটেছে তা ভরা রাজসভায় প্রকাশ করে, রাজার গৌরব, মর্যাদা কমে যাবে। লোকের মুখে মুখে নানা কথা ছড়াবে। কিছু না করে শুধু যদি তাকে কারাগারে রেখে দেওয়া হয় তাহলে লোকের মনে তেমন কোনো প্রশ্ন জাগবে না।'

রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করে ভিল যুবককে কারাগারেই রেখে দিল।

কিছুদিন পরে, না জানি বিধাতার মনে কী ছিল, ওই ভিল যুবক রাজার বোন স্বয়ংপ্রভার নজরে পড়ে গেল। তাকে দেখার পরেই স্বয়ংপ্রভার মনে তার প্রতি দরদ জাগল। তাকে তার ভালো লেগে গেল। তারপর

থেকে স্বয়ংপ্রভা গোপনে ভালো ভালো খাবার তার কাছে পাঠাত। সে যাতে কারাগারে ভালোভাবে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা সে করেছিল।

স্বয়ংপ্রভার সঙ্গে ভিল যুবকের প্রত্যেক দিন দেখা হত। ভিল যুবকেরও স্বয়ংপ্রভাকে ভালো লেগেছিল। সে একদিন তাকে বলল, 'তুমি যেমন আমায় ভালোবাস, আমিও তোমায় তেমনি ভালোবাসি। আর আমার এই কারাগারে থাকতে ইচ্ছে করছে না। চল আমরা দু-জনে পালিয়ে যাই। তোমাকে নিয়ে অরণ্যে যেতে চাই। সেখানে মহানন্দে থাকতে পারবে।'

এই কথার জবাবে স্বয়ংপ্রভা কোনো কথা বলল না। তারপর থেকে সে আর কোনোদিন ভিল যুবককে দেখতে এল না। কিছুদিন পরেই ভিল যুবক মুক্তি পেল।

এই কাহিনি শুনিয়ে বেতাল বলল, 'রাজা, যে মহেন্দ্র একদিন প্রতিশোধ নেবার জন্য ভিল যুবককে কারাগারে পুরেছিল, তাকে হত্যা করার কথা ভেবেছিল, তাকে হঠাৎ সে মুক্তি দিল কেন? রাজা মহেন্দ্র কি ভিল যুবকের অপমানের জ্বালা ভুলে গিয়েছিল? আর তার বোন স্বয়ংপ্রভা ওই ধরনের ব্যবহার করল কেন? ভালো খেতে দিল, ভালো থাকতে দিল আবার তার সঙ্গে অরণ্যে পালাতে বললে কথা বন্ধ করে দিল! আসা-যাওয়ার পাট চুকিয়ে দিল। কেন? এই প্রশ্নগুলোর জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাজা মহেন্দ্র যা করলেন তার সঙ্গে তার বোন স্বয়ংপ্রভার কাজের মিল আছে। রাজা ভিল যুবককে অরণ্য থেকে ধরে আনার পেছনে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা নাও থাকতে পারে। হয়তো ইচ্ছাই ছিল না। ওই যুবকের পৌরুষ ও পরাক্রম দেখে স্বয়ং রাজা অবাক হয়েছিলেন। যে ভিল যুবক রাজাকে গ্রাহ্য করে না সেই যুবক ইচ্ছা করলে বহু যুবক নিয়ে বাহিনী গঠন করে অতর্কিতে রাজাকে আক্রমণ করতে পারে। রাজাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারে। সেইজন্যই ভিল যুবককে তিনি কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলেন। আর এই ধরনের কোনো ভয়ের কারণ আছে কি না পরীক্ষা করার জন্যই তার বোন স্বয়ংপ্রভা ভিল যুবককে যাচাই করেছিল। তাকে বিয়ে করলে অর্ধেক রাজত্ব পাওয়ার কথা শুনেও ভিল যুবক রাজি না হয়ে অরণ্যে ফিরে যেতে চাইল। যে ভিল যুবক বিনা পরিশ্রমে পাওয়া অর্ধেক রাজত্ব নিতে চায় না সে কোনোদিন রাজ্য জয় করার জন্য রাজাকে আক্রমণ করবে বলে রাজার মনে হয়নি। তাই রাজা তাকে মুক্তি দিলেন।'

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫৩. সাধুর কৌটো

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে ফিরে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে কোন দিকের পক্ষপাতিত্বের ফলে এত পরিশ্রম করছ আমি তা জানি না। তবে এটুকু জানি সাংসারিক সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে যারা অরণ্যে তপস্যা করে তারাও পক্ষপাতহীন নয়। আমার বক্তব্যের সাক্ষী স্বরূপ একটি কাহিনি শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হতে পারে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল

এক সময় ধনবর্মা ও ধীরবর্মা নামে দুই রাজা পাশাপাশি রাজত্ব করছিল দুই দেশে। দুটো দেশের মাঝখানে একটা অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যে জ্ঞানশেখর নামে এক সাধুর কুটির ছিল। সাধু তপস্যা করত। দু-দেশেরই প্রজা ওই সাধুর কাছে আসত। নিজেদের সমস্যার কথা বলত। শুনে সাধু যে পরামর্শ দিত সেই পরামর্শ অনুসারে ওরা কাজ করত।

সে বছর বর্ষা ভালোভাবে না হওয়ায় আকালের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। দুটো দেশেরই একই অবস্থা। একদিন ধনবর্মা ও ধীরবর্মা সাধুর কাছে পরামর্শ নিতে এল। ওদের বক্তব্য শুনে সাধু জ্ঞানশেখর বলল, 'দেখ বাবা, তোমাদের দু-জনকেই একটা করে কৌটো দিচ্ছি। যখনই তোমরা বিপদে পড়বে কৌটো খুলে দেখবে। তোমাদের সমস্যার সমাধান তোমরা তাতে খুঁজে পাবে। তবে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। খুব ছোটো ছোটো সমস্যার সমাধান এতে খুঁজে পাবে না। এখন আমি কিছুকালের জন্য সমাধিস্থ হব।'

এইভাবে বলে সাধু দুই রাজাকে দুটো কৌটো দিয়ে দিল। রাজারা যে-যার কৌটো নিয়ে নিজের নিজের দেশে ফিরে গেল।

ধনবর্মা আকালের সময় কী করা উচিত সে ব্যাপারে মন্ত্রী ও ব্যাবসাদারদের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো সমাধান যখন খুঁজে পেল না তখন ওই কৌটো খুলল। তাতে যে মূল্যবান অপূর্ব বস্তু ছিল। সেই বস্তু বিদেশে বিক্রি করে বিদেশ থেকে ধান আনিয়ে সে দেশের খাদ্যাভাব মেটাল।

কিন্তু ধীরবর্মা তা করল না। অভাব বা আকালের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সে কয়েকটা কাজ হাতে নিল। সেই কাজ করে ফল না পাওয়া গেলে তখন কৌটো খুলে দেখা যাবে ভাবল। প্রথমেই সে চেষ্টা করল যাতে দেশের ধান দেশের বাইরে কেউ নিয়ে না যায়। ব্যাবসাদারদের কাছে যত ধান ছিল সব ধান রাজা নিয়ে নিল। নিয়ে প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করে দিল। ফলে সে বছর প্রজারা না খেতে পেয়ে মরেনি।

ধীরবর্মার চেয়ে সে বছর ধনবর্মা তার প্রজাদের অনেক ভালো খাইয়েছিল। তাই সে সগর্বে বলল, 'আমার দেশের প্রজা এই বছর সবচেয়ে ভালো খেতে পেয়েছে। আশেপাশের কোনো প্রজা এত খেতে পায়নি। কোনো রাজা প্রজাদের এত ধান খেতে দেয়নি। আগামী বছর আমি প্রজাদের আরও বেশি করে খাওয়াতে চাই আরও ভালো রাখতে চাই। মন্ত্রীগণ, বলুন, কীভাবে তা সম্ভব হবে।' মন্ত্রীরা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'মহারাজ, গত বছরের মতো আপনি সাধু জ্ঞানশেখরের ওই কৌটো খুলুন।'

ধনবর্মা মন্ত্রীদের পরামর্শে সেটা খুলে দেখতে পেল একটি কাগজ তাতে শুধু লেখা আছে, 'জাগো, দেখ।'

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই এক সাধু ধনবর্মার সঙ্গে দেখা করতে এসে তাকে বলল, 'মহারাজ, আমার কাছে একটি যন্ত্র আছে। ওই যন্ত্র দিয়ে ভূগর্ভে কোথায় কত সম্পদ আছে তা জানা যাবে। আমি এই যন্ত্র দিয়ে যেখানে দেখাব সেখানে খুঁড়ে দেখুন সম্পদ পাবেন। এভাবে খুঁড়ে খুঁড়ে আপনি আপনার দেশে অনেক সম্পদ মাটির তলা থেকে তুলতে পারবেন। তবে যত সম্পদ উঠবে তা বিক্রি করে যত পাবেন তার অর্ধেক আমাকে দিতে হবে।' রাজা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। তারপর ওই সাধুর যন্ত্রের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন

জায়গায় খোঁড়া শুরু হয়ে গেল। মাটির তলা থেকে অনেক সোনা, রূপা, তামা, লোহা প্রভৃতি পাওয়া গেল। বিক্রি করে অর্ধেক দাম সাধুকে রাজা দিয়ে দিল।

দেখাদেখি বীরবর্মার মন্ত্রীরা রাজাকে উপদেশ দিল জ্ঞানশেখরের কাছে আনা কৌটোটা খুলতে। কারণ ওই কৌটো খুলে পাশের দেশের রাজা ধনবর্মা নিজের দেশের অনেক উন্নতি করেছে।

কিছুদিন পরে যে সাধু যন্ত্র নিয়ে ধনবর্মার দেশে গিয়েছিল সেই সাধু ধীরবর্মার কাছেও এল। ধনবর্মাকে যেভাবে যা বলেছিল বীরবর্মাকেও তাই বলল। তার কথা শুনে বীরবর্মা বলল, 'দেখুন, আপনি যদি আপনার যন্ত্র বিক্রি করতে চান আমি সানন্দে আপনার যন্ত্র কিনে নিতে পারি। কিন্তু আপনাকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গার মাটি খুঁড়ে, দেশের সমস্ত সম্পদ বের করে আপনাকে তার অর্ধেক দিতে রাজি নই।'

এই ধরনের যন্ত্র আমার কাছে ছাড়া পৃথিবীতে আর কারও কাছে নেই। তাই এটা আমি বিক্রি করতে চাই না। আমার স্বার্থে আপনি রাজি হলেন না; তবে মনে রাখুন, এই যন্ত্র ছাড়া মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বিভিন্ন জায়গার সম্পদ বের করতে আপনার পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে। আপনার দেশ পেছিয়ে যাবে।'
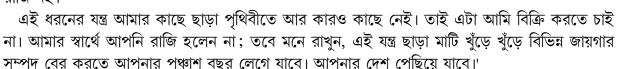
কিছুকাল পরে জ্ঞানশেখর সমাধি থেকে উঠে আশেপাশের কোন দেশের কী অবস্থা জানার জন্য বেরিয়ে পড়ল। বীরবর্মা জ্ঞানশেখরকে জানাল, 'নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে যতটা পেরেছি সমস্যার সমাধান করেছি। আপনার কৌটো আমি এখনও খুলিনি।'

তারপর জ্ঞানশেখর গেল ধনবর্মার কাছে। সে বলল, 'দেখুন, আমি আমার প্রজাদের কত ভালো রেখেছি। যখনই প্রয়োজন বোধ করেছি কৌটো খুলেছি।'

জ্ঞানশেখর ধীরবর্মার কাছ থেকে কৌটোটা ফিরিয়ে নেয়নি। কিন্তু ধনবর্মার কাছ থেকে কৌটোটা ফিরিয়ে নিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'রাজা, জ্ঞানশেখর এক রাজার কাছ থেকে কৌটোটা ফেরত নিল অন্য রাজার কাছ থেকে নিল না। এর কারণ কী? নিশ্চয় ধীরবর্মার প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল। ওই কৌটোর ক্ষমতা কি শেষ হয়ে গিয়েছিল? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'জ্ঞানশেখর কৌটো ফেরত নিল ধনবর্মার কাছ থেকে। কারণ ধনবর্মা সাধুর দুটো কথাই রাখলেন না। তিনি পর পর দু-বার ওই কৌটোটি খুলেছিলেন। যে সমস্যা দেখা দিল তার সমাধান করার উপায় রাজা ভাবেননি। কৌটো খুলে সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ধান কিনে অপচয় করেছিলেন। দ্বিতীয় অপরাধ করেছিলেন মাটির তলার সমস্ত সম্পদ তুলে, শেষ করে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মাটির তলায় কিছুই রাখলেন না। কিন্তু ধীরবর্মা ওই কৌটো বা যন্ত্রের উপর নির্ভর করেননি। বুদ্ধি খাটিয়ে সমাধান করেছেন। তাই সাধু তা রেখে দিল।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে গেল সেই গাছে।

৫৪. নকল সুধীর

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে তিনি যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তোমার আশা পূরণ না হওয়ার কারণ হিসেবে তুমি হয়তো ভাবছ তোমার অলৌকিক শক্তি নেই। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। মৈত্রেয়ের কাহিনি শুনলে আমি যা বলতে চাইছি তা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার এই কাহিনি শুনলে পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করে দিল

উজ্জয়িনী নগরের রাজা ছিলেন সুধীর। তাঁর প্রাসাদে বীরদাস নামে এক নামকরা শিল্পী ছিল। মৈত্রেয় নামে তার এক ভাই ছিল। মৈত্রেয় হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে বহু সিদ্ধপুরুষকে সেবা করে এক অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিল। সেই শক্তি হল শিল্পে প্রাণ সঞ্চার।

মৈত্রেয় তার অলৌকিক শক্তি রাজাকে দেখাতে চাইল। তার দাদাকে দুটো নারীমূর্তি তৈরি করতে বলল। ভরা রাজসভায় সে ওই দুটি নারীমূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করল। তা দেখে রাজা এবং অন্যান্য সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। মহারাজ সুধীর, তারপর মৈত্রেয়কে তাঁর প্রাসাদে থাকতে অনুরোধ করলেন। মৈত্রেয় রাজার অনুরোধে প্রাসাদে থেকে গেলেন। কিছুকালের মধ্যে সুধীর ও মৈত্রেয়র মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। একবার সুধীরের ইচ্ছে করল নিজের বিকল্প রূপ ও আকৃতি দেখার। মনের এই ইচ্ছা রাজা সুধীর মৈত্রেয়ের কাছে প্রকাশ করলেন। মৈত্রেয় তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে রাজি হল।

মৈত্রেয় রাত্রে তার দাদা বীরদাসকে রাজা সুধীরের মূর্তি তৈরি করতে বলল। বীরদাস পাথর দিয়ে সুধীরের মূর্তি তৈরি করল। মধ্যরাত্রে সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নকল সুধীরকে নিয়ে মৈত্রেয় রাজভবনের দিকে গেল।

অন্য দেশের রাজধানীর মতোই উজ্জয়িনীতেও শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ছিল। ওরা অতর্কিতে নকল সুধীরকে আক্রমণ করে, মেরে ফেলে পালিয়ে গেল। সকাল হতে-না-হতেই চারদিকে রাজার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর মুখে মুখে আবার প্রচারিত হল যে আসল রাজার মৃত্যু হয়নি, নকল রাজার হয়েছে। এই খবর শুনে প্রজাদের উদবেগ কমে গেল। কিন্তু দেশে দুষ্ট শক্তিগুলো ব্যাপারটাকে ওইখানেই শেষ করল না। ওরা সম্পূর্ণ উলটো ঘটনা প্রচার করল। ওদের প্রচার ছিল, 'আসল রাজাই মারা গেছে। এখন যে রাজা আছে সেই রাজা মৈত্রেয়ের তৈরি নকল রাজা। রাতারাতি হঠাৎ শত্রুর হাতে রাজা নিহত হওয়ায় মৈত্রেয় তার অলৌকিক ক্ষমতাবলে নকল রাজা তৈরি করল।'

এই প্রচার যারা শুনল তারা সহজে তা অস্বীকার করতে পারল না। কারণ ওরা জানত রাজা সুধীরের সঙ্গে মৈত্রেয়ের সম্পর্ক গভীর ছিল।

শুধু যে প্রজাদের মধ্যেই এই প্রচার ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয়, অন্তঃপুরের দাস-দাসী এমনকী রানির মনেও এই প্রচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সকলেরই মনে সন্দেহ ঢুকেছিল।

স্বভাবতই, এই অবস্থা রাজা সুধীরের মনে ব্যথা দিয়েছিল। কীভাবে যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না। তখন তিনি মৈত্রেয়কে এই সমস্যার সমাধান করতে বললেন। ইতিমধ্যেই মৈত্রেয় এই সমস্যা নিয়ে ভাবছিল। তার সামনে একটিমাত্র উপায় ছিল।

মৈত্রেয় সেদিন রাত্রে তার নিজের চেহারার মতো একটি মূর্তি গড়তে তার দাদাকে বলল। শিল্পী বীরদাস মৈত্রেয়ের মূর্তি তৈরি করল। সেই মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে এক রাত্রে মৈত্রেয় গোপনে রাজার সামনে গিয়ে

হাজির হল। রাজা সুধীর দুই মৈত্রেয়কে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে যে আসল মৈত্রেয় বুঝতে পারছি না।'
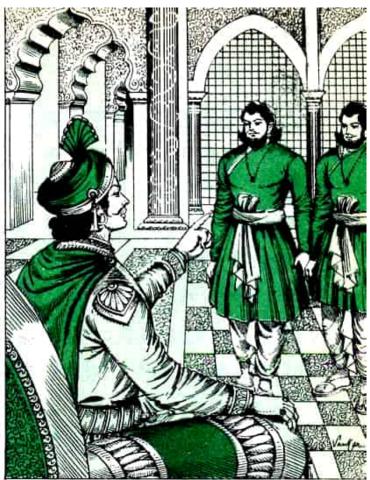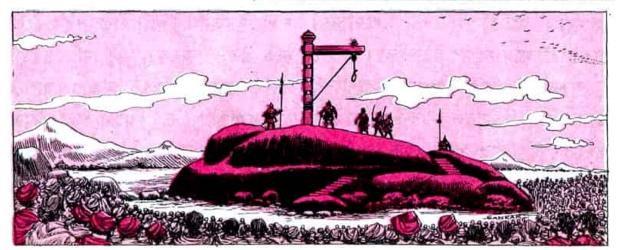
তখন মৈত্রেয় বলল, 'মহারাজ, আমি আসল মৈত্রেয়। আর এটি হল নকল মৈত্রেয়। আপনি কাল প্রকাশ্য রাজসভায় দেশদ্রোহী ঘোষণা করে এই নকল মৈত্রেয়কে মৃত্যুদণ্ড দিন।'

'তারপর তোমার অবস্থা কী হবে?'

'আমি গোপনে হিমালয়ের দিকে পাড়ি দেব মহারাজ।' মৈত্রেয় বলল।

পরের দিন সকালে ভরা রাজসভায় রাজা নকল মৈত্রেয়কে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে আবার বলল, 'রাজা, মৈত্রেয় যে সমাধান বার করল সেটা যে সঠিক সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অত কষ্ট করে যে অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিল সেই অলৌকিক শক্তি পেয়েও বেচারাকে হিমালয়ে ফিরে যেতে হল কেন? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'অলৌকিক শক্তি ব্যবহারিক জীবনে কতটা যে কাজ দেয় তা কেউ বলতে পারে না। আসলে ওইসব শক্তির উপর মানুষের ক্ষমতা থাকে না। যে মৈত্রেয় অত বড়ো অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছিল তার পক্ষে আর চারজনের মতো ঘোরাফেরা করা সম্ভব নয়। সেটা সে টের পেয়েছিল দেরিতে। টের পেয়েই সে আর রাজধানীতে থাকতে পারল না।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫৫. পরিবর্তন

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনেকে প্রতিজ্ঞা করে কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারে না। অনেকে নাগপালের মতো, কারণ থাক বা না থাক, মত বদলে ফেলে। আমি তোমাকে এখন নাগপালের কাহিনি শোনাচ্ছি। শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বেতাল নাগপালের কাহিনি শুরু করল

চন্দ্রাবর্ত নামে এক দেশ ছিল। সেই দেশে দেবশ্রেষ্ঠী নামে এক ব্যাবসাদার ছিল। তার ছিল একটি ভালো জাতের ঘোড়া। ঘোড়ার নাম শ্বেতবদন। ওই ঘোড়াকে চরাতে আর ওই ঘোড়ার গাড়ি চালাতে দেবশ্রেষ্ঠী একটি ছেলেকে রেখেছিল। তার নাম নাগপাল। নাগপাল সবসময় ঘোড়ার সঙ্গেই থাকত। ঘোড়া আর নাগপাল যেন দুই বন্ধু। তা লক্ষ করে মরার আগে দেবশ্রেষ্ঠী ঘোড়াটিকে নাগপালকে গাড়ি সহ দিয়ে দিল। নাগপাল ওই ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে রোজগার করত এবং ঘোড়াটিকে সবসময় ভালো খাবার খাওয়াত।

নাগপালের প্রতিবেশী ছিল এক বুড়ো। সেও ঘোড়ার গাড়ি চালাত। ওই বুড়োকে লোকে 'দাদু' বলত। নাগপাল দাদুর বাড়িতে যেত। দাদুর ছিল এক নাতনি। নাতনির সঙ্গে নাগপালের আলাপ হল। কিছুদিনের মধ্যে দাদুর নাতনি ও নাগপালের মধ্যে বিয়ের কথা উঠল।

শ্বেতবদন ঘোড়াটি যেন বুড়ো হতে চলল। গাড়ি টানতে সে আর পারছিল না। ফলে তাকে বসিয়ে খাওয়াতে হত এবং নাগপালের গাড়ি আর চলত না। তা লক্ষ করে দাদু তাকে বলল, 'দেখ, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, গাড়ি চালাতে আর পারছি না। এখন থেকে তুমি আমার গাড়ি চালাতে পার।' বলে দাদু ভাবল, দু-দিন পরে তো নাগপাল আমার নাতনিকে বিয়ে করবেই। এখন আমার গাড়ি চালাক। তেমন দুর্দিন এলে ও নিশ্চয়ই আমাকে দেখবে।

দাদুর নাতনির নাম সুলোচনা। নাগপালকে গাড়ি দেওয়ায় সুলোচনা খুশি হল। গাড়ি চালিয়ে নাপগাল যা পেত তার অনেকখানি ভাগ সুলোচনার হাতে দিয়ে বলত, 'যতদিন আমাদের বিয়ে না হচ্ছে ততদিন তোমরা এই ভাগ রাখ।'

রোজগারের বেশিরভাগ অর্থ সুলোচনাকে দিয়ে দেওয়ার ফলে বাকি যা থাকত কোনোরকমে তাতে নাগপালের পেট চলত। কিন্তু সে পুরোটা নিজের জন্য খরচ না করে শ্বেতবদন ঘোড়ার জন্যও করত।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর দাদু বিয়ের কথা পাড়লে নাগপাল বলল, 'আমার হাতে তো টাকাপয়সা নেই।'

দাদুর পাশে নাতনি দাঁড়িয়েছিল। নাগপালের কথা শুনে সে বলে উঠল, 'তোমার গাড়িটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ওটাকে বিক্রি করে দিলেই তো পার। আর তোমার ওই শ্বেতবদন ঘোড়াটিকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছ কেন? বিক্রি করলে পঞ্চাশ টাকা পাবে।'

পরের দিন, সাতসকালে উঠে, নাগপাল নিজের গাড়িটাকে বিক্রি করে দিল। তারপর শ্বেতবদন ঘোড়াটি নিয়ে অনেক দূরের গ্রামে সে চলে গেল। সেখানে গাড়ি বিক্রির টাকায় জমি কিনে চাষ-আবাদ করতে লাগল। ওই গ্রামেরই মেয়েকে সে বিয়ে করল। শ্বেতবদন ঘোড়াটিকে সে আজীবন নিজের কাছেই রেখেছিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, নাগপাল সুলোচনাকে কেন ছেড়ে গেল? কেন সে তাকে বিয়ে করল না? সুলোচনার চেয়ে তার কাছে শ্বেতবদন ঘোড়াটাই কি বড়ো হল? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'নাগপাল ও সুলোচনার মধ্যে বাঁধন সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই নাগপালের দুটি বাঁধন ছিল। একটি ছিল শ্বেতবদন ঘোড়ার সঙ্গে আর একটি ছিল ওই গাড়ি এবং ঘোড়া যে দেবশ্রেষ্ঠী দিয়েছিল তার সঙ্গে। সুলোচনার চোখে টাকা বড়ো। অকেজো গাড়ি আর ঘোড়া তার মতে বিক্রি করে ফেলা উচিত। কিন্তু নাগপাল দেবশ্রেষ্ঠীর দেওয়া গাড়ি বিক্রি করতে চায়নি। জমি কিনে চাষ-আবাদ করে সে তার মালিক দেবশ্রেষ্ঠীকে স্মরণ করত। এবং সে আমৃত্যু ঘোড়াটিকেও নিজের কাছেই রেখেছিল।'

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল ফিরে গেল সেই গাছে শবদেহ নিয়ে।

আরও দুটি বই...

চাঁদমামা
সেরা উপন্যাস সমগ্র